জানুয়ারি ২০২৬, সংখ্যা ১৪

সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র

সমাজ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী

সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র

সংখ্যা ১৪, জানুয়ারি ২০২৬

সম্পাদক
নজরুল ইসলাম

সমাজ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী

সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র

সংখ্যা ১৪, জানুয়ারি ২০২৬

সমাজ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী

সম্পাদক

নজরুল ইসলাম

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

দিলওয়ার হোসেন

কপিরাইট

©সমাজ গবেষণা কেন্দ্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলাভবন, কক্ষ নং-৪০৫৭

প্রচ্ছদ

রবীন আহসান

মুদ্রণ

মাটি আর মানুষ

১১০ ফকিরাপুল ঢাকা।

পরিবেশক

মূল্য

৫৫০ টাকা মাত্র

এই সংখ্যা পাওয়ার জন্য যোগাযোগ

দিলওয়ার হোসেন

ফোন নম্বর: ০১৮১৯১৪৪০৯৯

https://www.facebook.com/share/1C9XHShsKs/

পরবর্তী সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য যোগাযোগ

এম এম আকাশ

মুঠোফোন: ০১৭১১৮৪৭৬৫০; ই-মেইল akashmokaddem@gmail.com

সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র

সংখ্যা ১৪, জানুয়ারি ২০২৬

সূচিপত্র

নজরুল ইসলাম	সম্পাদকের কথা	০৫
	প্রবন্ধ	
আনু মুহাম্মদ	ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বজনের বিপদ	০৯
মোস্তাফিজুর রহমান	ট্রাম্প আরোপিত 'পাল্টা-পাল্টি শুল্ক' ও বাংলাদেশ: সম্ভাব্য অভিঘাত ও করণীয়	৪৫
সেলিম রায়হান	বাংলাদেশে নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো কী হওয়া উচিত : রাজনৈতিক অর্থনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিশ্লেষণ	৭৯
নজরুল ইসলাম	বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের বৈদেশিক এবং ও ভারতীয় সংযোগ সম্পর্কে 'নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্যা'র বয়ান – একটি পর্যালোচনা'	১০২
	পুস্তক পর্যালোচনা	
তাজুল ইসলাম	নজরুল ইসলামের *আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয়*	১৭২
	স্মরণ: যতীন সরকার	
এম. এম. আকাশ	যতীন সরকার	২১৫
আহমাদ মাযহার	যতীন সরকার: বুদ্ধিজীবিতা ও সাধারণ মানুষের জীবন	২২১
	স্মরণ: বদরুদ্দীন উমর	
রেহমান সোবহান	বদরুদ্দীন উমর: একজন প্রকৃত গবেষক এবং দায়বদ্ধ সংগ্রামীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	২৪৯
রওনক জাহান	বদরুদ্দীন উমর চিরন্তন দীপশিখা	২৫৭
আনু মুহাম্মদ	উমর ভাইয়ের সাথে	২৬৩
মোরশেদ শফিউল হাসান	বদরুদ্দীন উমর কেন তাঁকে আমাদের মনে রাখতে হবে	২৬৮
কানাই দাশ	বদরুদ্দীন উমর: সনিষ্ঠ গবেষক ও 'বিশুদ্ধবাদী' বিভ্রান্তির মূর্ত প্রতীক	২৭৯
তানভীর আকরাম	বদরুদ্দীন উমর গবেষণায় অবদান এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে কিছু কথা	২৮৫

সমাজের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ
এবং গণমুখী উন্নয়ন ধারার অন্বেষা নিয়ে পুনরুজ্জীবিত

সমাজ গবেষণা কেন্দ্র

সকল উৎসাহীকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে

যোগাযোগ
অধ্যাপক এম এম আকাশ
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলাভবন, কক্ষ ৪০৫৭
মুঠোফোন: ০১৭১১৮৪৭৬৫০; ই-মেইল akashmokaddem@gmail.com

সম্পাদকের কথা

সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রে'র চতুর্দশ সংখ্যা পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত। পুনর্গঠিত 'সমাজ গবেষণা কেন্দ্র' কর্তৃক প্রকাশিত এটাই প্রথম সংখ্যা। এখন থেকে নিয়মিত ষাণ্মাসিক হিসেবে *সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র* প্রকাশিত হবে বলে আমরা আশা করছি। এবারের সংখ্যায় চারটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ এবং একটি বিস্তৃত পুস্তক পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আরও যোগ হয়েছে দুটি স্মরণ অংশ।

প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছেন আনু মুহাম্মদ এবং বিষয় হলো 'ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ও সর্বজনের বিপদ'। অত্যন্ত সময়োপযোগী এই প্রবন্ধ। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে, বলা যেতে পারে, জাতীয়তাবাদী 'ফ্যাসিবাদে'র অবসান ঘটেছে। কিন্তু বিয়োগান্তক হবে যদি ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। আনু মুহাম্মদ তাঁর প্রবন্ধে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিপদের উৎস এবং স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বিশেষত, তিনি ব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়েছেন কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে ব্যবহার করে। পাশাপাশি তিনি দেখান কীভাবে অনেক দেশে, বিশেষত লাতিন আমেরিকায়, খ্রিষ্টান ধর্মের ভিত্তিতে 'মুক্তির ধর্মতত্ত্ব' (*লিবারেশন থিওলজী*)'র উদ্ভব ঘটে এবং তা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বৃটিশ ঔপনিবেশক আমলে সে ধরণের কিছু উদাহরণ এই অঞ্চলে থাকলেও পরবর্তীকালে তার তেমন নজীর দেখা যায় না। বরং, সাম্রাজ্যবাদের সাথে ধর্মীয় মৌলবাদের আঁতাত জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজ করেছে এবং এই আঁতাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আনু মুহাম্মদ সেই সংগ্রামের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'ট্রাম্প আরোপিত পাল্টাপাল্টি শুল্ক ও বাংলাদেশ: সম্ভাব্য অভিঘাত ও করণীয়' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লিখেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। এটির বিষয়বস্তুও খুবই প্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্যান্য দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপকে তার অন্যতম নীতিকৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই কৌশল দ্বারা তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পখাতের পুনরুজ্জীবনে কতটা সফল হবেন তা প্রশ্নবিদ্ধ। তবে বিশ্ববাপী বাণিজ্যের যে ক্ষতিসাধন

করছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ট্রাম্পের এই নীতিকৌশল দ্বারা বাংলাদেশ কীভাবে আক্রান্ত হয়েছে, মোস্তাফিজুর রহমান তার একটি বিশদ বিবরণ-বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাকের বাজারে প্রতিযোগিদেশমূহের আপেক্ষিকে বাংলাদেশের সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি এবং তা মোকাবেলার বিভিন্ন পথ-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি প্রয়োজনীয় আলোচনা ও সুপারিশ উপস্থাপনা করেছেন।

সেলিম রায়হান লিখিত 'বাংলাদেশে নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি কী হওয়া উচিত: রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধটিও বর্তমানের জন্য প্রাসঙ্গিক। যদিও ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সুবিকশিত কোন আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি ছিল না, তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে একটি বৈষম্যহীন অর্থনীতির আকাঙ্ক্ষা তা থেকে স্পষ্টই বেড়িয়ে এসেছিল। এরূপ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কী ধরণের সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন প্রয়োজন তা বিস্তারিতভাবে এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। আগামী নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে তার জন্য এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত সুপারিশসমূহ নিঃসন্দেহে মূল্যবান হবে।

চতুর্থ প্রবন্ধটি আমার নিজের লেখা এবং এটি সমসাময়িক বিষয়ক নয়, বরং ইতিহাস বিষয়ক। তবে অতীতের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রচিত হয়। বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক অতীত যে বর্তমানকেও প্রভাবিত করে চলেছে তা যথেষ্ট দৃশ্যমান। এর একটি উদাহরণ হলো, স্বাধীনতার পর ৫৫ বছর পাড় হলেও এখনো বাংলাদেশের পানি নীতি, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ নীতি, শিক্ষা নীতি, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মৌল নীতিমালা বিদেশী সংস্থা দ্বারা প্রণীত হচ্ছে। সেদিক থেকে বাংলাদেশ এখনো স্বাধীন হতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। 'বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের বৈদেশিক এবং ভারতীয় সংযোগ সম্পর্কে "নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্যা"র বয়ান: একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক এই প্রবন্ধে বৃটিশ শিল্প বিপ্লবে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অতীতের এই শোষণের ইতিহাস বাংলাদেশের বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশী দেশপ্রেমিক এবং স্বাবলম্বীভাবে দেশের সকল নীতি প্রণয়নে উৎসাহিত করবে বলে আমার আশা।

প্রবন্ধসমূহের পর এই সংখ্যায় আছে তাজুল ইসলামের লেখা একটি বিস্তারিত পুস্তক পর্যালোচনা। পুস্তকটি হলো *আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয়* (বাংলা ধরিত্রী ২০২৫)। এক অর্থে এই পুস্তকটি হলো আমার

১৯৮৭ সালে প্রকাশিত *বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা- বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকট ও বিকল্প ধারার প্রশ্ন* (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী) শীর্ষক গ্রন্থটির, বলা যেতে পারে, বর্তমানের ভাষ্য। ঐ গ্রন্থে আমি ধনী-অভিমুখী উন্নয়ন ধারার পরিবর্তে গণ-অভিমুখী উন্নয়ন ধারার প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু উপযোগী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে সে ধারাটি ধারাটি বাস্তবায়িত হয় নি। ফলে ক্রমশ অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠতে থাকে এবং ক্রমশ তা একটি সার্বিক সংকটের রূপ ধারণ করে। সেকারণে সময়োপযোগী করে বৈষম্য-বিরোধী উন্নয়ন ধারাটি পুনঃপ্রস্তাবনার প্রয়োজন অনুভব করি এবং ২০২৩ সাল থেকেই *দশ করণীয়* লেখা শুরু করি। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্রথমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (বিআইডিএস)-এ তা উপস্থাপিতও করি। অর্থাৎ, ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আগেই বৈষম্যকে মূল উপজীব্য করে *দশ করণীয়* লেখা হয়েছিল। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, যথেষ্ট দীর্ঘ এবং ভাবগম্ভীর হওয়ায় বইটি পড়া অনেকের কাছে কিছুটা 'দুঃসাধ্য' বলে প্রতিভাত হতে পারে। তাজুল ইসলামের প্রাঞ্জল, সার্বিক, এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যালোচনাটি এই বাধা কাটিয়ে অনেকের নিকট বইটিকে সহজবোধ্য এবং আগ্রহের করবে বলে আমার আশা।

সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের এবারের সংখ্যার মূল্যবান অংশ হলো যতীন সরকার ও বদরুদ্দীন উমর নিয়ে স্মরণউপজীব্য লেখাসমূহ। তাঁরা ছিলেন বাংলাদেশের বামপন্থী চিন্তার দুই দিকপাল। প্রায় কাছাকাছি সময়ে তাঁদের মৃত্যু বাংলাদেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁদের অবদানের প্রতি আমাদের উচ্চ-স্বীকৃতি এবং স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ হিসেবেই এই স্মরণ অংশদু'টি সংযোজিত হলো। অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলো বেশিরভাগই পূর্বপ্রকাশিত এবং সেগুলো পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য এগুলোর লেখক এবং প্রকশকদের ধন্যবাদ জানাই।

যতীন সরকারের উপর লিখেছেন এম এম আকাশ এবং আহমাদ মাযহার। দুটি লেখাই যতীন সরকারকে জানতে সহায়তা করবে। আহমাদ মাযহার শুধু স্মরণে সীমাবদ্ধ থাকেন নি। তিনি যতীন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে যতীন সরকারের চিন্তাধারার সাথে পাঠককে পরিচিত করেছেন।

বদরুদ্দীন উমরের উপর লিখেছেন রেহমান সোবহান, রওনক জাহান, আনু মুহাম্মদ, মোরশেদ শফিউল হাসান, কানাই দাশ, এবং তানভীর আকরাম। রেহমান সোবহান এক অর্থে বদরুদ্দীন উমরের সহকর্মী ছিলেন; তদুপরি তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। সুতরাং আশ্চর্য্যের নয় যে, তার লেখায় আমরা বদরুদ্দীন উমরের একটি সামগ্রিক পরিচয় পাই। রওনক জাহানও বদরুদ্দীন উমরের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন এবং একই শাস্ত্রের অভিচারী হওয়ায় তাঁর সাথে একটি বহুমাত্রিক সম্পর্কাবদ্ধ ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণে আমরা এর সাক্ষ্য পাই।

আনু মুহাম্মদ বদরুদ্দীন উমরের সহকর্মী ছিলেন। শুধু চিন্তার ক্ষেত্রে নয় সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রামেও তাঁরা সহযোদ্ধা ছিলেন। ফলে তাঁর স্মৃতিচারণটির বিশেষ মূল্য আছে। মোরশেদ শফিউল হাসান বদরুদ্দীন উমরের জীবন ও কর্মের একটি প্রাণবন্ত বিবরণ তুলে ধরেছেন যা পাঠককে আকর্ষণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

এটা মোটেও আশ্চর্য্যের নয় বদরুদ্দীন উমরের দীর্ঘ জীবন, তাঁর সুবিস্তৃত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কর্ম কিছু বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে। তাঁর কর্মের বিবেচনা শুধু প্রশংসা ও স্তুতিতে সীমাবদ্ধ থাকাটা সুস্থ পর্যালোচনার অভিপ্রকাশ হবে না। কানাই দাশ এবং তানভীর আকরাম বদরুদ্দীন উমরের ইতিবাচক অবদানকে কোনোভাবে খাটো না করে এসব কিছু বিতর্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। তাদের বক্তব্যের সাথে সকলের একমত হতে হবে এমন কথা নেই। তবে এসব বিতর্কের উল্লেখ স্মরণ অংশটিকে আরও পূর্ণাঙ্গ করায় সহায়ক হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

এই সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধরনের রচনার সকল লেখকদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি জানি যে, এই সংখ্যাতেও বিভিন্ন মুদ্রণপ্রমাদ ও অন্যান্য ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে। আশা করি সকলে নিজগুণে তা ক্ষমা করে দেবেন। আমাদের সামর্থ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আমাদের কাজ করতে হয়েছে। ভবিষ্যতে আপনাদের সহযোগিতা সহকারে আরও ত্রুটিমুক্ত সংখ্যা উপহার দিতে পারবো বলে আমরা আশা করি। এ সংখ্যাটি যদি আপনাদের সমাদর পায় এবং প্রগতির অভিমুখে বাংলাদশের বাঞ্ছিত অভিযাত্রায় সহয়ক হয় তাহলেই আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক হবে।

ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বজনের বিপদ

আনু মুহাম্মদ*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে গত কয় দশকে উগ্র ধর্মপন্থী ও বৈষম্যবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। এতদিন বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকা সামরিক শাসকেরা কিংবা দেশের বৃহৎ দল আওয়ামী লীগ বা বিএনপি এসব শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে এবং ব্যবহার করেছে। এখন এসব শক্তি নিজেরাই রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সমাজ ও রাজনীতিতে তাদের এই প্রভাব বৃদ্ধি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান লেখায় এই উত্থানের স্বরূপ ও উৎস সন্ধান করা হয়েছে। প্রথমে দেশীয় ও বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জটিলতা এবং এর সাথে সম্পর্কিত ধারণা-শব্দ ও সংজ্ঞা নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে বিভিন্ন পরিচয় সত্ত্বেও দেশে দেশে ধর্মীয় উগ্রবাদ ও বর্ণবাদসহ দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোর অভিন্ন অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, আবার একই ইসলাম ধর্মের অনুসরণ করেও দেশে দেশে শাসনব্যবস্থার পার্থক্য। এরপর দেশে দেশে ধর্মীয় উগ্রবাদ বিস্তারের সাথে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব আধিপত্যের বা বৈশ্বিক ফ্যাসিবাদী কাঠামোর যোগসূত্র অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আফগানিস্তানে মার্কিন-সৌদী-পাকিস্তানের সম্মিলিত ভূমিকায় আল কায়েদা তালিবানের বিশ্ব নেটওয়ার্ক তৈরি ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরীক্ষা করা হয়েছে। একদিকে তথাকথিত 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ' অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী তৎপরতার পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত ল্যাটিন আমেরিকায় শাসক শোষকদের থেকে ভিন্নভাবে ধর্মের ভাষা তৈরি ও জনগণের নিপীড়ন বিরোধী লড়াইয়ে তার ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে সমৃদ্ধি ও বৈষম্য-বঞ্চনার বৈপরীত্য আর সেই সাথে সামরিক শাসন এবং বিভিন্ন বড় দলের কৌশলগত তৎপরতার সাথে জামায়াতসহ ধর্মপন্থী গোষ্ঠীগুলির শক্তিবৃদ্ধির সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হয়েছে। উগ্র ও জনবিদ্বেষী গোষ্ঠীগুলোর উত্থান, সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উদারতাবাদের ভেতর তার আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বজনের জন্য কত ধরনের বিপদ তৈরি হয়েছে তা চিহ্নিত করে এর থেকে মুক্তির কাজে গুরুত্ব দেবার আহ্বান জানানো হয়েছে।

---

*অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্পাদক *সর্বজনকথা*

ভূমিকা

ধর্ম সামনে রেখে সহিংসতা, অসহিষ্ণুতা, সন্ত্রাসও বাড়ছে ক্রমেই। পাকিস্তান প্রথম থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র। তবুও সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে সহিংস সংঘাত কখনো কমেনি বরং বেড়েছে। ইসলামের নামে বিভিন্ন মসজিদে হামলা ও মুসল্লী হত্যাও প্রায় নিয়মিত। যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পাকিস্তান এখন সন্ত্রাসের ও ড্রোন হামলার স্থায়ী ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

এই অঞ্চলের সবচাইতে বড় রাষ্ট্র ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' হলেও সেখানে গত কয় দশকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রসার ঘটেছে অনেক। কয়েকদফা জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে প্রায় একচেটিয়া বিজয় নিয়ে সেখানে হিন্দুত্ববাদী দল ক্ষমতাসীন। তিনদফা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত এবং ভারতে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির নায়ক নরেন্দ্র মোদী। জোর করে ইতিহাস পরিবর্তন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ এবং বিদ্বেষও নানাভাবে বাড়ছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। নেপালে নতুন প্রণীত সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান রেখে পাশ হলেও নেপালকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার জন্য সেখানে আন্দোলন দাঁড় করানোর চেষ্টা এখনও বলবত আছে। নেপালের রাজনীতিতে ভারতের বর্তমান সরকার নানাভাবে হস্তক্ষেপ করছে। সামনে সেখানেও হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি প্রসারের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে এখনও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' আছে, তবে সাথে আছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামও। 'ধর্মনিরপেক্ষ' দল/জোট ক্ষমতায় ছিল দেড় দশকেরও বেশি সময়; কিন্তু এসময়ে রাজনীতি ও সমাজে রাষ্ট্রের ধর্মীয় পক্ষপাত কমেনি বরং বেড়েছে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতা কমেনি বরং বেড়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিভিন্ন গোষ্ঠী অনেকক্ষেত্রে এই 'ধর্মনিরপেক্ষ' দলকেও পরিচালনা করেছে। বিনা নির্বাচনে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ধর্মীয় শক্তিগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে এই সরকার।

বিশ্বজুড়ে ধর্মকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস, সংঘাত ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে। তার থেকে বেশি বাড়ছে আতংক ও এই বিষয় নিয়ে ধোঁয়াশা। সারাবিশ্বে সংবাদমাধ্যমে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে 'ইসলামপন্থী রাজনীতির সন্ত্রাস' নিয়ে

প্রবল মনোযোগ এবং হুলস্থুল দেখা গেলেও এর উৎস সন্ধানে অনাগ্রহও দেখা যায় সেরকমই। যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত তথাকথিত 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ মডেল' জোরকদমে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে বেড়েছে সন্ত্রাসী ভুতুড়ে গোষ্ঠী, ডিজিটাল প্রচারণা আর অদৃশ্য সরকারের তৎপরতা। দেশে দেশে পুঁজিপন্থী সংস্কার চলছে আর তার যাত্রাপথ মসৃণ করে বিভিন্ন ধর্মের নামে উন্মাদনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই 'মৌলবাদ', 'আধুনিকতা', 'পশ্চিম', 'ধর্ম', 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ইত্যাদি নিয়ে সাদাকালো বিভাজনকে প্রশ্নের মধ্যে আনার তাগিদ তৈরি হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক ফ্যাসিবাদী কাঠামো বিবেচনায় রেখে বর্তমান প্রবন্ধে এসব বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। একইসাথে রাষ্ট্র, ধর্মপন্থী ও তথাকথিত সেকুলার রাজনীতির পারস্পরিক ঐক্য-বিবাদের নানা গ্রন্থি তুলে ধরে বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা প্রান্তের সর্বজনের বিপদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

১. বিষয়ের জটিলতা

বর্তমান সময়ে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব বহুবিধ। কারণ-

- প্রথমত, বিশ্বজুড়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'ধর্মীয়' এজেন্ডার চাপ আগের চাইতে অনেক বেশি। একই সময়ে সাম্প্রদায়িক, জাতিবিদ্বেষী, বর্ণবাদী, যৌনবাদী, অসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়গুলোও আগের তুলনায় বেশি উপস্থিত।
- দ্বিতীয়ত, ধর্মকে ভিত্তি করে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নানা গোষ্ঠীর তৎপরতা বাড়ছে। 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের' নামে দেশে দেশে সামরিকীকরণও বাড়ছে।
- তৃতীয়ত, শোষণ ও অবিচারের সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং এর থেকে মুক্তির দিশাহীনতার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের নানাবিধ সংগঠন ও তৎপরতা অনেক বেশি পরিসর তৈরি করেছে।
- চতুর্থত, 'ধর্মনিরপেক্ষ' হিসেবে পরিচিত অনেক রাজনৈতিক দলও নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে, ক্ষমতা ও ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে ধর্ম ও ধর্মীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিজেদের

রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করছে।

- পঞ্চমত, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা তার প্রাসঙ্গিকতা টিকিয়ে রাখতে নানাভাবে 'ধর্মীয় সন্ত্রাস' চাষ করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমেই কয়েকটি প্রশ্নের মুখোমুখি হই। এগুলো হলো:

- এক. 'মৌলবাদী' শব্দটি ধর্মপন্থী রাজনীতি বোঝাতে উপযুক্ত শব্দ কিনা।
- দুই. এই রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে সবসময় 'উদারনৈতিক' 'গণতান্ত্রিক' রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বিপরীত হিসেবে দেখা ঠিক কিনা।
- তিন. তথাকথিত 'মৌলবাদী' রাজনৈতিক শক্তি কি পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধ কোনো শক্তি? 'মৌলবাদ' আর পুঁজিবাদী উন্নয়নের মধ্যে কি অন্তর্গত কোনো বিরোধ আছে?
- চার. প্রান্তস্থ দেশগুলোতে 'মৌলবাদ' কি বৈশ্বিক পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ তৈরি করেছে?
- পাঁচ. 'মৌলবাদ' কি কেবল মুসলিম দেশ ও গ্রামীণ অঞ্চলের বিষয়?
- ছয়. ধর্মপন্থী রাজনীতি কি সমাজের গরীব নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে বা করতে পারে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা ক্রমশ পেতে থাকবো আশা করি। তবে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ নিয়ে লেখার শুরুতে কয়েকটি বিষয়ে আমার অবস্থান পরিষ্কার করে নিতে চাই।

- প্রথমত, সাধারণভাবে ধার্মিক মানুষের কাছে ধর্মের রূপ, আর ধর্মের একটি নির্দিষ্ট বয়ানের ওপর ভিত্তি করে কোনো গোষ্ঠীর রাজনৈতিক তৎপরতা এক কথা নয়।
- দ্বিতীয়ত, নিজ নিজ ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের মৌল আদর্শের প্রতি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাঁর/তাঁদের বিশ্বাস ও চর্চার অধিকার অবশ্যই রাখেন। তা অন্য কারও সঙ্গে না মিললে তাতে কেউ আপত্তি করতে পারেন না, যদি তা তাদের অসুবিধা না ঘটায়।

- তৃতীয়ত, কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠী/ সংগঠন যখন ধর্মের মৌল আদর্শ নিজেদের মতো সংজ্ঞায়িত করে, এবং অন্যদের মত/বিশ্বাস/চর্চা অস্বীকার করে তা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে তখন তা তৈরি করে সহিংস পরিস্থিতি। জোর করে চাপানোর এই মতাদর্শিক অবস্থানই ফ্যাসিবাদী রাজনীতির জন্ম দেয়।
- চতুর্থত, ধর্মীয় চর্চায় যুক্ত আছেন, সেটাই তাদের জীবিকা এরকম ইমাম, মুয়াজ্জিন, মাদ্রাসা শিক্ষক, প্রমুখকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের সাথে গাটছড়ায় বাঁধা কতিপয় ক্ষমতাবান ধর্মীয় নেতার ভূমিকা থেকে ভিন্নভাবে দেখতে হবে। কারণ এই পেশাজীবীরা পেশাগত কারণে এবং জীবিকার প্রয়োজনে সাধারণত বিত্তবান ও ক্ষমতাবানদের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য থাকেন।
- পঞ্চমত, মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িক এক কথা নয়। কারও মধ্যে এই দুটো প্রবণতা একসাথে নাও থাকতে পারে। মৌলবাদ ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জীবনচর্চা কাঠামো। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ধর্মের পরিচয়কে ভিত্তি করে তৈরি হলেও তাতে অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ থাকে প্রধান। সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি মানে অন্য সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিদ্বিষ্ট, আক্রমণমুখি। একজন ধর্মবিশ্বাসী সাম্প্রদায়িক নাও হতে পারেন, যেমন একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ধর্মবিশ্বাসী বা চর্চাকারি নাও হতে পারেন। অর্থাৎ ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়কে নিয়ে বিদ্বেষী রাজনীতি এক কথা নয়। অভিজ্ঞতা বলে, সাম্প্রদায়িকতা অনেকসময় ধর্মীয় সংখ্যালঘুর জমিজমা সম্পদ দখলের আবরণ হিসেবেও ব্যবহার হয়।
- ষষ্ঠত, কোনো ব্যক্তি ধর্মবিশ্বাসী মানেই মৌলবাদী নন, ধর্মবিশ্বাসী মানেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অনুসারী নন।
- সপ্তমত, খ্রীষ্টান মানে খ্রীষ্টান সুপ্রিমেসিস্ট নয়, ইহুদী মানেই জায়নবাদী নয়, হিন্দু মানেই বর্ণবাদী নয়, ইসলামপন্থী মানেই সন্ত্রাসী নয়। এবং
- অষ্টমত, মৌলবাদ প্রাচ্যনির্দিষ্ট বা প্রাচীন মতবাদ শুধু নয়। বস্তুত, এর শুরু পাশ্চাত্যেই, এবং এটি বর্তমানে 'আধুনিক' পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই ফলাফল। ইহজাগতিকতা বা সেকুলারিজম

এবং গণতন্ত্রও পশ্চিম নির্দিষ্ট এবং 'আধুনিক' কালের বিষয় শুধু নয়। এর বহু ধারা বিভিন্নকালে মুসলিম বিশ্ব সহ প্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় বহুকাল আগে থেকেই পাওয়া যায়।

২. ঐক্য এবং অনৈক্য

মুসলিম, হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ বা ইহুদী যে ধর্মেরই হোক, এর অনুসারী রাজনৈতিক শক্তি স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থ বা 'ঐশী' বিধান নিয়ে নিজ নিজ ব্যাখ্যার ওপর ভর করেই তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। বৌদ্ধ ধর্ম নিরীশ্বর হলেও তার মধ্যেও বিধি বিধান নিয়ে ব্যাখ্যা ও ভূমিকার তারতম্য হয়। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তি ইহজগতের রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ, আইনকানুন, প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রেও ধর্মগ্রন্থের নিজ নিজ ব্যাখ্যাকে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখতে রায় দেন। এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলাও অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে একটি বাড়তি বিষয় হলো বর্ণপ্রথা, যা এর মৌলভিত্তি। মৌলবাদী বা ফান্ডমেন্টালিস্ট শব্দটি এসেছে মার্কিন প্রটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদের মধ্য থেকে। তাঁরা তুলনামূলকভাবে উদারনৈতিক খ্রীষ্টানদের থেকে নিজেদের পার্থক্য বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করতেন।

এখন এই শব্দটি ইসলামপন্থী রাজনীতি প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। মৌলবাদী বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয়, ধর্মগ্রন্থ যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিধিবিধান জারি করেছে তার মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান খোঁজা, এবং এর বাইরে কোন কিছু গ্রহণ করতে অসম্মতি। এর অর্থ হলো সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন তাদের বিবেচনাযোগ্য নয়। সেই হিসেবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথেও তাদের মিলবার কথা নয়। এই জন্য এদেরকে অনেকসময় 'প্রাক পুঁজিবাদী' শক্তিও বলা হয়।

কিন্তু বিশ্ব জুড়ে বহু ধর্মপন্থী দলের কার্যক্রম থেকে তার প্রমাণ মেলে না। ধর্মের বাণিজ্যিকীকরণ, নেতাদের জীবনযাপন, ব্যাংক বীমাসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে দক্ষ বিনিয়োগসহ অর্থনৈতিক নীতি-তৎপরতা ইত্যাদি বহু কিছুই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মান্য করেই কাজ করে। নেতাদের অনেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সুফলভোগীও বটে।

তাছাড়া বর্তমান সকল ধর্মপন্থী রাজনীতির বড় অংশই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। তাদের অধিকাংশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই একটি নির্ধারিত সংস্করণ তৈরির জন্য চেষ্টায় রত; তারা বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বায়নেরও সুফলভোগী। যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের সাথে সাথে ধর্মপন্থী রাজনীতির বিস্তার ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরিতেও সহায়ক হয়েছে। পার্থক্য এখানেই যে, তাদের অনেকে এই ব্যবস্থার ওপর ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সচেষ্ট। যেমন বিজেপি আরএসএস পুঁজিবাদের কট্টর বা নয়া উদারনৈতিক ধারা অনুসরণ করছে হিন্দুত্ববাদের আবরণ দিয়ে। জামায়াতে ইসলামীর অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক তৎপরতা তাদের সমাজ-অর্থনীতি মডেলের দুটো গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। বলা হয়, অর্থনীতির একচেটিয়াকরণ ও বৈষম্য ঠেকাতে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা থাকবে। এই ব্যবস্থা পরিচালিত হবে 'ঐশী নির্দেশ' বা 'আল্লাহর আইন' অনুযায়ী। কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক ঈশ্বরের পক্ষে তা কে নির্ধারণ করবেন? করবেন ক্ষমতাবানরা, এর বিরুদ্ধে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ খুবই সীমিত। একদিকে শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই দুটোর সমন্বয় প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাই নির্দেশ করে।

তবে কোনো ধর্মই ইতিহাসের বাইরে নয়, স্থান কাল নিরপেক্ষ নয়। সেজন্য সকল ধর্মের মধ্যেই স্থান ও কালের ছায়া আছে। সকল ধর্মের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন কাল ও স্থান ভেদে নানা মত ও পথের সন্ধান পাওয়া যায়। অভিন্ন গ্রন্থ বা ধর্মীয় কাঠামো থেকে এই ভিন্ন ভিন্ন মত ও তরিকা তৈরি হয় স্থান, কাল ছাড়াও সামাজিক অর্থনৈতিক মতাদর্শিক অবস্থানগত ভেদের কারণে। অর্থাৎ ধর্মের ব্যাখ্যা ব্যক্তি/গোষ্ঠী/মতাদর্শিক অবস্থান ভেদে ভিন্ন হতে পারে।

প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে তো বটেই, একই ধর্মের বিভিন্ন ধারা ও উপধারার মধ্যেও সংঘাত বিদ্বেষ তাই অনেক পুরনো। ইসলাম ধর্মের মধ্যেও এর কমতি নেই। ষষ্ঠ শতকে আরব বিশ্বে তৎকালীন বিদ্যমান ব্যবস্থার নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইএর মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন হয়। পরবর্তীকালে এই ধর্ম অনুসরণে এমনকি কুরআনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, হাদিসের বিভিন্ন ভাষ্য ব্যাখ্যায় বহুধরনের মত পথ তৈরি হয়। এর মধ্যে বৈষম্যবাদী, নিপীড়নমূলক বহু মত পরীক্ষা করলে তার সাথে সেই

সেই সময়ের ক্ষমতাবানদের যোগ পাওয়া যায়। আবার সাম্য ও সংবেদনশীল মতও পাওয়া যায় যার সাথে মানুষের লড়াইয়ের যোগ আছে।

স্পষ্টতই বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের অনুসারী উগ্রপন্থী রাজনীতির প্রধান ধারাগুলোর মধ্যে কিছু অভিন্ন উপাদান পাওয়া যায় যা আবার অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম-বহির্ভুত কিছু রাজনীতির ধারা, যেমন শ্বেতাঙ্গ উগ্রপন্থী, উগ্র জাত্যাভিমানী, যৌনবাদী ইত্যাদি ধারার সঙ্গেও মেলে। ভারতে বিজেপি-শিবসেনা-আরএসএস, যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইউরোপে খ্রীষ্টান মৌলবাদী উগ্রপন্থী শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী জাতি ও ধর্ম বিদ্বেষী থেকে শুরু করে জামায়াত-আল কায়েদা-তালেবান-আইসিস, এদের সবার মধ্যেই কিছু অভিন্ন প্রবণতা কমবেশি পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে উচ্চকিত বা প্রচ্ছন্ন বক্তব্যের সাধারণ দিকগুলো নিম্নরূপ:

ক) মানুষ ঐশী ক্ষমতার সৃষ্টি। ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই ঐশী গ্রন্থ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বিশ্লেষণ ক্ষমতা বা অধিকার সকল মানুষের নাই। এই দায়িত্ব নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ধারণ করেন। এরা পূর্বনির্ধারিত ধর্মীয় নেতা।

খ) এই বিশ্বাস কাঠামো এবং তাদের ইহজাগতিক জীবন অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট উচ্চক্রম অনুযায়ী কঠোর আইন দ্বারা সংগঠিত ব্যবস্থায় পরিচালিত হতে হবে।

গ) 'ঈশ্বরের বিধান' হিসেবে ধর্মীয় নেতাদের স্বীকৃত বিষয়গুলো নিয়ে কেনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। 'মানুষ তৈরি' কোনো বিধান দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপন করা যাবে না।

ঘ) একই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধারা উপধারা গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য ধর্ম বা বিশ্বাসের মানুষ বিশেষ বিবেচনায় থাকবেন, সমান মর্যাদা নিয়ে নয়।

ঙ) নারীকে পূর্ণ মানুষ হিসাবে স্বীকারে অনীহা, এবং তাদের ভূমিকা নির্দিষ্ট পরিসরে সীমিতকরণ। ঘরে ও বাইরে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নকে বৈধতা দানের যুক্তি; বয়ানে নারীকেই সকল ঝামেলার কারণ, পাপের আধার, বিপজ্জনক, অনিয়ন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত করা। লিঙ্গীয় বৈচিত্র অস্বীকারের প্রবণতা।

চ) গর্ভপাত, নির্ধারিত বিধি-বিধানের বাইরে নারী-পুরুষ সম্পর্ক পাপ হিসেবে বিবেচিত।

ছ) নির্দিষ্ট কাঠামোর বাইরে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মের কাঠামোর মধ্যে থেকেও স্বাধীন চিন্তা বা (কর্তৃত্বের সাথে) ভিন্নমত হুমকির সম্মুখীন। লেখক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, ধর্মতাত্ত্বিক অনেকেই বিভিন্ন সময়ে নির্যাতিত।

বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন, সশস্ত্র সংগ্রাম, কিংবা সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার তৎপরতা আগের তুলনায় বেড়েছে। তবে ইসলামপন্থী রাজনীতির কোন একক বা সমরূপ চেহারা নেই। কারও কাছে এর লক্ষ্য ওপর থেকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সমাজকে পরিবর্তিত করা এবং কারও কাছে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে রাজনীতিকে প্রভাবিত করা। আবার ইসলামের ভিত্তি যে কুরআন তার ব্যাখ্যায় বহু মতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইসলামের মুক্তিকামী ব্যাখ্যার পাশাপাশি নারীবাদী ব্যাখ্যা ইসলাম সম্পর্কে অনেক নতুন চিন্তাও যোগ করেছে ।

সমাজে ইসলাম কায়েম করা সবার কাছে রাজনীতিও নয়। উল্লেখযোগ্য কিছু ধারা আছে যারা ব্যক্তিকে ইসলামের পথে আনার মাধ্যমে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নীতি অনুসরণ করেন। সুফীবাদী ধারা ধর্মমত নির্বিশেষে মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে ঈশ্বরের সাথে প্রেম এবং সবার মধ্যে ঐক্যের আহবান নিয়ে হাজির হয়।

ইসলামী রাষ্ট্র অতীতে আমরা অনেক দেখেছি; বর্তমান বিশ্বেও তা দুর্লভ নয়। অতীতে বিভিন্ন স্থানে ও কালে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেখা গেছে। ইসলামের শুরুতে খেলাফত স্বল্পস্থায়ী ছিলো, সেখানে রাজতন্ত্র অনুমোদিত ছিলো না। ইমাম হোসেনের ঘাতক ইয়াজিদকে দিয়েই রাজতন্ত্র শুরু, যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। মধ্যপ্রাচ্যে সৌদী আরব, কাতার, কুয়েত, জর্দান, সংযুক্ত আরব আমিরাত কথিত ইসলামী শাসনব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে রাজতন্ত্র অনুমোদিত আইন বিধান ও প্রতিষ্ঠান সেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর। ইসলাম ধর্মে অনুমোদিত না হলেও এদের রাজতন্ত্রী ব্যবস্থাই মুসলিম বিশ্বে সবচাইতে প্রভাবশালী। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র হলেও দুয়ের

মধ্যে পার্থক্য অনেক, বিশেষত নারী শিক্ষায় বিশাল তফাৎ। ইরান ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত। সেখানে ধর্মীয় নেতা ও নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্টের একটি সমন্বয় তৈরি করা হয়েছে।

৩. সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ এবং শত্রু-মিত্র খেলা

আমরা জানি যে, পুঁজিবাদের সম্প্রসারণে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা খুবই সহায়ক হয়েছিলো। আর উপনিবেশগুলোতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্প্রসারণে পশ্চিমা মিশনারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো; ভূমিকা ছিলো স্থানীয় এক ধরনের ধর্মীয় নেতা ও ক্ষমতাবানদেরও। আবার ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী অবস্থানেও কোনো কোনো মিশনারী ও স্থানীয় কোনো কোনো ধর্মীয় নেতার ভূমিকা দেখা গেছে। ঔপনিবেশিকোত্তর কালে প্রান্তস্থ দেশগুলোতে খুঁটি ধরে রাখতে এবং বিপ্লব ঠেকাতে পুঁজিবাদী কেন্দ্র বা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ধর্মীয় শক্তি ব্যবহারে ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। মূলধারার চার্চ সাম্রাজ্যবাদের খুঁটি হিসেবে বরাবরই কাজ করেছে। তারা একদিকে মুসলিম রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে; অন্যদিকে ইসরাইলকে একটি বিষফোঁড়া হিসেবে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান পাকাপোক্ত করেছে। মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে তাদের অনুগত ইসলামপন্থী দল ও ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে বিপ্লব বিরোধী আতংক সৃষ্টি করবার কাজ সহজ ছিলো। বস্তুত এই ধর্মপন্থীরা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে জনগণের মুক্তির লড়াই ঠেকাতে সামরিক-বেসামরিক স্বৈরশাসকদের সমর্থন দেবার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের পথই সুগম করেছে।

এভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ৮০'র দশক পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ধর্মপন্থী সংগঠন, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে ধর্মরক্ষার নাম করে নিজেদের আধিপত্য নিশ্চিত করার কাজে ব্যবহার করেছে। এর একটি বড় উদাহরণ আফগানিস্তান। প্রথমে মুজাহেদীনদের মাধ্যমে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সমর্থিত সরকার উচ্ছেদ করে যুক্তরাষ্ট্র। সেইসময় আফগান মুজাহেদীনদের সবরকম পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে তারা – প্রশিক্ষণ দিয়েছে, অস্ত্র দিয়েছে, অর্থ দিয়েছে। এর অংশীদার ছিল সৌদী আরবও। ইউএসএইড সরবরাহ করেছে ইসলামের নামে সহিংস উন্মাদনা সৃষ্টির মতো বই, শিশুদের পাঠ্যপুস্তক, যার মধ্যে সোভিয়েত সৈন্যের চোখ

উপড়ে ফেললে বেহেশতে যাবার প্রতিশ্রুতিও ছিলো। আফগানিস্তানে সিআইএ-র এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠের ভূমিকা পালন করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। সামরিক শাসনের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউল হকের মতো এক বাধ্য নিষ্ঠুর সামরিক জেনারেলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা সেসময় যুক্তরাষ্ট্রের খুব কাজে দিয়েছে।

মুজাহেদীনদের অস্থিতিশীল শাসনের সময়েই একপর্যায়ে আকস্মিকভাবে বিশাল শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয় তালিবান। মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র, সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ এবং কৌশলগত সমর্থন সবই যোগান দিয়েছে সেই একই যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম দফায় তালিবানরা আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলের সূচনা করে ১৯৯৭ সালের ২৪ মে। ঠিক তার আগের দিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ ব্যবসা জগতের মুখপাত্র ওয়াল স্ট্রীট জার্ণাল আফগানিস্তান নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সেখানে লেখা হয়:

> আফগানিস্তান হচ্ছে মধ্য এশিয়ার তেল, গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক গ্যাস রফতানির প্রধান পথ।...তাদের পছন্দ কর বা না কর ইতিহাসের এই পর্যায়ে তালিবানরাই আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সবচাইতে উপযুক্ত।

দুদিন পর অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের ২৬ মে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমস লেখে:

> ক্লিনটন প্রশাসন মনে করে যে, তালিবানদের বিজয় ইরানের পাল্টা শক্তি হিসেবে দাঁড়াবে(এবং) এমন একটি বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত করবে যা এই অঞ্চলে রাশিয়া ও ইরানের প্রভাবকে দুর্বল করবে।

মার্কিন তেল কোম্পানি ইউনোকাল, যারা ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ সময়কালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে গ্যাস রপ্তানির জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, তারা ক্লিনটন প্রশাসন ও ওয়াল স্ট্রীট জার্ণালের অবস্থানকে 'খুবই ইতিবাচক অগ্রগতি' বলে অভিহিত করে। এই কোম্পানি বিশ্ববাজারে বিক্রির জন্য তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল নেয়ার প্রকল্প নিয়ে অপেক্ষা করছিলো।

একইবছর যুক্তরাষ্ট্র সামরিক দিক থেকে আরও অনেক শক্তিশালী ও আক্রমণাত্মক প্রকল্প গ্রহণ করে, যার শিরোনাম ছিলো: 'প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি'। এতে যারা স্বাক্ষর করেন তাঁদের মধ্যে ইউনোকাল কর্মকর্তা, অস্ত্র ব্যবসায়ী সহ আরও ছিলেন বৃহৎ ব্যবসা ও হোয়াইট হাউসের দীর্ঘদিনের প্রভাবশালী ব্যক্তি ডিক চেনী, ডোনাল্ড রামসফেল্ড, জেব বুশ এবং ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা প্রমুখ। বিশ্বব্যাপী 'নয়া উদারতাবাদী' ধারার সংস্কার, দখল, আধিপত্যের নতুন পর্ব আরও জোরদার হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে।

১৯৯০ এর শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্ব আধিপত্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শত্রুপক্ষ দরকার হয়। ১৯৯১ সালে প্রথম দফা ইরাক আক্রমণের মধ্য দিয়ে পরবর্তী কয়েক দশকের যাত্রাপথ নির্মিত হয়। একদিকে 'গণতন্ত্র' ও 'শান্তি'র প্রতিপক্ষ 'সন্ত্রাসী' হিসেবে সবরকম বিদ্বেষী প্রচারণা, বৈষম্য ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে থাকে মধ্যপ্রাচ্য, আরব ও মুসলমান পরিচয়ের মানুষেরা; অন্যদিকে রাজা বাদশাহসহ মুসলিম প্রধান দেশের শাসকদের দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী এই নকশা বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনে। এই সময় থেকে 'ইসলামী সন্ত্রাসী'র তৎপরতাও বেশি বেশি দেখা যায় যা এই নকশা এগিয়ে নিতে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

২০০১ সালে নিউইয়র্কের 'টুইন টাওয়ার' হামলার পর থেকে এই কর্মসূচির অধিকতর সামরিকীকরণ ঘটে। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলা, স্পষ্ট-অস্পষ্ট, ঘোষিত-অঘোষিত, 'সন্ত্রাসী'দের বিরুদ্ধে ২০০১ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' একটি বৈশ্বিক এজেন্ডার রূপ দেয়। আরব বিশ্বের রাজতন্ত্রকে ভর করেই এই সন্ত্রাসী আধিপত্য বিস্তৃত হয়। পাশাপাশি পুরনো মিত্রদেরই সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে যুক্তরাষ্ট্র, মিডিয়াসহ তাদের নানা সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমান বিদ্বেষী প্রচারণা জোরদার হয়। এই প্রচারণার প্রতিক্রিয়ায় ধর্মীয় পরিচয় ও রাজনীতির ক্ষেত্রও উর্বর হতে থাকে। অন্যদিকে অপমান, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষোভের ওপর ভর করে বিশ্বজুড়ে ইসলামপন্থী রাজনীতির নতুনভাবে প্রসার ঘটে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কমপ্লেক্সের সঙ্গে ইসলামপন্থী জঙ্গী সশস্ত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর যে যোগ তৈরি হয়, যেভাবে তার আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয় তার ধারাবাহিকতা পরেও অব্যাহত

থাকে। এর বিস্তৃতি ঘটে কয়েক দশক জুড়ে। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থার কাগজপত্র কখনও প্রকাশিত হলে এর অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে। উইকিলিকসে এর কিছু প্রকাশিত হয়েছে। আইসিস, তালেবান, আল কায়েদা, ইত্যাদি নামে পরিচিত যেসব গোষ্ঠীকে দমন করবার কথা বলে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে দখলদারিত্বের নতুন জাল ফেলে তাদের প্রায় সবাই মার্কিনীদেরই সৃষ্ট বা লালিত পালিত।

এগুলোর সূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নারী, পুরুষ, ও শিশুসহ বহু নিরীহ মানুষ খুন হয়েছে; মসজিদ, মন্দির গীর্জা, মেলা, উৎসব, ভাস্কর্য আক্রান্ত হয়েছে। ইসলামের নাম নিয়ে এইসব গোষ্ঠীর বর্বর দিগভ্রান্ত সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তাহীনতা আরও বেড়েছে। রাষ্ট্রের দমন পীড়ন সহিংসতা বেড়েছে; বিশ্ব অশান্তি বেড়েছে। এগুলোকেই কেউ কেউ 'জিহাদ' এবং কেউ কেউ 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই' বলে মহিমান্বিত করতে চান। মোহমুক্ত থাকলে এসব বয়ান যে কত ভ্রান্ত তা উপলব্ধি কঠিন নয়। কারণ এসব আক্রমণ ও সন্ত্রাস বিশ্বের ক্ষমতাবান রাষ্ট্র, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার বিরুদ্ধে দেখা যায় না। সেকারণে তাদের দুর্বলও করে না; বরং তাদের দমন পীড়নের ব্যবস্থার আরও বিস্তৃতির পক্ষে যুক্তি তুলে দেয়। সেই সূত্র ধরেই গত আড়াই দশকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিভাবকত্বে পরিচালিত 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের' নামে দেশে দেশে জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস জুলুম আরও বেড়েছে। রাষ্ট্র আরও সশস্ত্র এবং নৃশংস হয়েছে। এই কাঠামোতেই অন্য অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও নতুন নতুন নিপীড়নমূলক আইন চাপানো হয়েছে; র‍্যাবসহ বিভিন্ন বাহিনী গঠিত হয়েছে; গুম, ক্রসফায়ার বেড়েছে; নজরদারির আয়োজন ভয়ংকর আকার নিয়েছে। তথাকথিত 'জঙ্গী দমন' হয়ে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রের জুলুমকে বৈধতা দানের অস্ত্র।

অনেকে এও যুক্তি দিতে চেষ্টা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এই 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ' 'ইসলামী জঙ্গী'দের বিরুদ্ধে সেকুলার শক্তির পক্ষে। এটিও আরেকটি বড় ভ্রান্তি। বস্তুত নির্বাচিত এবং সেকুলার সরকার উচ্ছেদে মার্কিনী রেকর্ড অনেক। চিলিসহ ল্যাটিন আমেরিকায় এর দৃষ্টান্ত অনেক; বিশ্বের অন্য প্রান্তেও দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন ৭০ ও ৮০ দশকে আফগানিস্তানে সেকুলার সরকারই ক্ষমতায় ছিল; কিন্তু তাদের অপরাধ তারা ছিলো মার্কিন বিরোধী। অথচ এই সরকারগুলো আফগানিস্তানে ভূমি সংস্কার, নারী অধিকার, শিক্ষা ও চিকিৎসা সংস্কারে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলো।

এদের উচ্ছেদ করে মার্কিন রাষ্ট্র এমন শক্তিকে একের পর এক ক্ষমতায় এনেছে যারা এগুলোর ঘোর বিরোধী। ইরাক ও লিবিয়াতেও সেকুলার সরকারই ক্ষমতায় ছিলো। তাদের কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার সমস্যা থাকলেও জাতীয় সক্ষমতা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিশুদ্ধ পানিসহ জন অধিকারের ক্ষেত্রে সেখানে অনেক সাফল্য ছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনে সাদ্দাম ও গাদ্দাফীর শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদের পর সেসব ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেছে। আর সেখানে বিভিন্ন ধর্মপন্থী গোষ্ঠীর প্রভাব, সংঘাত বেড়েছে। সর্বশেষ সিরিয়াতেও তাই ঘটলো।

এরকমও কেউ কেউ বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এসব দেশে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। শতভাগ ভুল কথা। স্বৈরাচার সাম্রাজ্যবাদের জন্য কখনোই সমস্যা না, বরং বিশ্বে স্বৈরাচারী শাসকদের প্রধান অংশ তাদেরই তৈরি কিংবা তাদেরই লোক। স্বৈরশাসক তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তারা বিরক্ত হয়।

৪. কে কাকে শক্তি যোগায়

তথাকথিত 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ' কর্মসূচির নামে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের পরিচালিত সন্ত্রাস, দখল, যুদ্ধ, গণহত্যা ভয়ংকর পর্যায়ে নিয়ে যায়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লাশের সংখ্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ বাড়তে থাকে। ২০১৫ সালে 'বডি কাউন্ট: ক্যাজুয়ালটি ফিগারস আফটার টেন ইয়ারস অব দ্য ওয়ার অন টেরর' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে জার্মান, কানাডিয়ান ও মার্কিন তিনটি সংগঠন যৌথভাবে। এগুলো হলো 'ইন্টারন্যাশনাল ফিজিশিয়ানস ফর দ্য প্রিভেনশন অব নিউক্লিয়ার ওয়ার', 'ফিজিশিয়ানস ফর সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি', এবং 'ফিজিশিয়ানস ফর গ্লোবাল সারভাইভাল'। এই রিপোর্টে ২০০৪ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত পরিচালিত সমীক্ষা থেকে দেখানো হয়েছে যে, এই এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণে ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ১৩ লাখেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১০ লাখ ইরাকে, দুই লাখের বেশি আফগানিস্তানে। মার্কিন ড্রোন ও অন্যান্য আক্রমণে ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন শুধু পাকিস্তানেই। এর মধ্যে বেসামরিক নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এরপরেও খুনের ধারা থামেনি; বরং অব্যাহত থেকেছে। গত কিছুদিনে নৃশংস চেহারা নিয়েছে

আন্তর্জাতিক সব রীতি নীতি প্রস্তাব সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে প্যালেস্টাইনে মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় ইসরাইলের অবিরাম গণহত্যা।

২০০১-এর আগে ইরাক লিবিয়া ও সিরিয়ায় আল কায়েদা বা তালেবান ধারার কোনো গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না। তথাকথিত 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ'এই অঞ্চলকে চেনা-অচেনা সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করে। এক পর্যায়ে এই অঞ্চলে বিরাট জৌলুস নিয়ে আবির্ভূত হয় আইসিস। যারা তাদের ভাষায় 'ইসলামী রাষ্ট্র' বা 'খিলাফত' প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি ঘোষণা করে। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, নতুন শত শত গাড়ী, বার্ষিক ১৬ হাজার কোটি টাকার বাজেট এবং প্রায় ৩০ হাজার সশস্ত্র সদস্য নিয়ে তারা যেন আচমকা হাজির হয়। তারা ইরাক সিরিয়ায় একের পর এক অঞ্চল দখল করে। তবে কখনোই ইসরাইলে হামলা করেনি। তারা আরও বিভিন্ন দেশে একের পর এক মুসলমানসহ ভিন্নধর্ম ও মতাবলম্বী মানুষদের আক্রমণ করতে থাকে; গলা কাটা ও নির্যাতনের দৃশ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচার করে বীরত্ব দেখাতে থাকে। হঠাৎ করে এরকম একটি বিশাল বাহিনীর জন্ম এবং ক্রমান্বয় বিজয় এর কয়েক বছর আগে আফগানিস্তানে তালিবানদের আচমকা আবির্ভাব এবং দ্রুত আফগানিস্তান দখলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ইরাক, লিবিয়া, এবং সিরিয়া ছিন্নভিন্ন হবার ফলে এই দেশগুলোর মানুষদের নারকীয় অনিশ্চিত অবস্থায় পড়তে হয়েছে। ইউরোপে অভিবাসনে বিশাল স্রোত এরই ফলাফল। অন্যদিকে এর প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী তিনপক্ষ: সৌদী আরব, ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। তাদের কাছে ইরাকের সাদ্দামের আসল অপরাধ স্বৈরশাসন ছিল না; তা ছিল তেলক্ষেত্র জাতীয়করণ এবং সামরিক শক্তি হিসেবে সৌদী আরব ও ইসরায়েলের কর্তৃত্ব অস্বীকারের ক্ষমতা। লিবিয়ার গাদ্দাফিরও একই অপরাধ ছিল। সৌদী রাজতন্ত্র বরাবরই তাদের ওপর গোস্বা ছিলো। গাদ্দাফী জীবনের শেষ পর্যায়ে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক গড়ার লক্ষ্যে 'নয়া উদারতাবাদী' বলে কথিত পুঁজিপন্থী কিছু সংস্কারের পথে গেলেও তাঁর বড় অপরাধ ছিল সৌদী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্পষ্ট আক্রমণাত্মক কথাবার্তা। ২০১১ সালে গাদ্দাফী সরকারকে উচ্ছেদ করবার জন্য ন্যাটো বাহিনীর ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন ভাড়াটিয়া উগ্রপন্থীদের জড়ো করার কাজটি যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা কয়েকটি দেশ ও সৌদী আরবের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

এদের কাছে সিরিয়ার আসাদ সরকারেরও অপরাধ স্বৈরশাসন নয়; অপরাধ হলো সৌদী আরব-ইসরাইল অক্ষের বিরোধিতা। সিরিয়ার আসাদ সরকার উচ্ছেদের জন্য সেই কারণে বিভিন্ন ক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় পশ্চিমা শক্তি ও সৌদী-কাতার-জর্ডান রাজতন্ত্র। ইসরাইলকে শক্তি যোগানো এবং ইরানকে কাবু করাও এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সৌদী আরব, কাতার, তুরস্ক, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বিপুল অর্থ, যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র যোগানের ওপর ভর করেই এসব উগ্রপন্থী গোষ্ঠী শক্তিপ্রাপ্ত হয়। এর সাথে মার্কিন ব্রিটিশ ফরাসী ও ইসরায়েলী গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বিত ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাইডেন যখন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট, তখন এক বক্তৃতায় মুখ ফসকে আইসিস এর পেছনে তাদের ও মিত্র দেশগুলোর শত হাজার কোটি ডলার সহ নানা পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলে ফেলেন। পরে মিত্রদের ক্ষোভের মুখে আবার মাফও চেয়েছেন। কিন্তু সত্য ঢাকা পড়েনি।

ব্রিটিশ-পাকিস্তানী লেখক তারিক আলী তথ্য যুক্তি দিয়ে সঠিকভাবেই দেখান যে, 'বর্তমান সময়ে সবচাইতে বড় "মৌলবাদ", "সকল মৌলবাদের জন্মদাতা" হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ'। আর যুক্তরাষ্ট্রের ইসলাম বিষয়ক গবেষক আমিনা ওয়াদুদ বলেন, 'ইসলামপন্থীদের বর্তমান পুনরুত্থান একটি উত্তর-আধুনিক ঘটনা'। তাই এসব উগ্রপন্থী/সন্ত্রাসী তৎপরতাকে বিচ্ছিন্ন, নিছক ধর্মীয়, গ্রামীণ, অনাধুনিক, পশ্চাৎপদ বিষয় হিসেবে খারিজ করলে এর শেকড়ের সন্ধান পাওয়া যাবে না এবং এর ব্যাপ্তি বোঝানো যাবে না। ধর্মীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভাবকে নিছক স্থানীয় বা জাতীয় বিষয় হিসেবে দেখাও ঠিক হবে না।

একইসাথে পরস্পরবিরোধী অনেক কিছুই ঘটতে দেখা যাচ্ছে। যেমন একদিকে 'সন্ত্রাস বিরোধী তৎপরতা'র নামে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ হচ্ছে, অস্ত্র যোগান বাড়ছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর হচ্ছে; অন্যদিকে নতুন নতুন দৃশ্যমান অদৃশ্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে, গোয়েন্দা সংস্থার দাপট বাড়ছে, সন্ত্রাস বাড়ছে, এবং তা দমনে নতুন নতুন দমন পীড়নের আইন, বিধিনিষেধ তৈরি হচ্ছে। সাপ আর ওঝা একসাথেই চলছে। যারা সবচাইতে বড় সন্ত্রাসী তারাই বিশ্বজুড়ে দাপাচ্ছে 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ' নাম

দিয়ে। এসবের মধ্যে বাংলাদেশও আছে। বিশ্ব সন্ত্রাসের উর্বর ভূমি হয়ে উঠার অনেক শর্তই আছে এখানে। বানানোর চেষ্টাও জোরদার বলে মনে হয়।

৫. বাংলাদেশে সমৃদ্ধি ও বঞ্চনার পাহাড়

সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর গত প্রায় ৫৪ বছরে বাংলাদেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রথাগত বিচারে 'অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি'র অনেকগুলো দিকই চিহ্নিত করা যায়। যেমন অবকাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। সড়ক পথের বিস্তার ঘটেছে অনেক; পরিবহণ ও যোগাযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে; বহুতল ভবন বেড়েছে অভূতপূর্ব মাত্রায়; আমদানি রপ্তানি দুটোই বেড়েছে; রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে গার্মেন্টস বড় সাফল্য অর্জন করেছে; প্রবাসী আয় বৈদেশিক মুদ্রার বিশাল মজুত তৈরি করেছে; প্রতিষ্ঠানে ও অর্থনৈতিক তৎপরতায় ক্ষুদ্রঋণ ও এনজিও মডেল অনেক বিস্তৃত হয়েছে; নগরায়ন বেড়েছে; মোবাইল-ইন্টারনেট শহর গ্রামে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেছে; প্রযুক্তির সম্প্রসারণে পেশাগত ও অর্থনৈতিক নতুন নতুন সুযোগ বেড়েছে; জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে অনেক বেশি, যদিও মানুষের যথেষ্ট এবং নিরাপদ খাদ্যের সংস্থান হয়নি। মানুষের সচলতা বেড়েছে।

কিন্তু এই সমৃদ্ধির গতি ও ধরনের কারণে প্রত্যক্ষ সুফলভোগী হয়েছে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী। এর সামাজিক ও পরিবেশগত খেসারতও অনেক বেশি। নদীনালা, খালবিল, ও বন শিকার হয়েছে দখল ও বিপর্যয়ের। বৈষম্য বেড়েছে। এই সময়কালেই দেশে একটি অতি-ধনিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে। 'কালো টাকা' নামে পরিচিত চোরাই টাকার মালিকদের বিত্ত এবং দাপট বেড়েছে বহুগুণ। ঢাকা শহরে এখন একইসঙ্গে বিত্তের জৌলুস এবং দারিদ্রের নারকীয়তা দুটোই পাশাপাশি অবস্থান করে। চোরাই কোটি-কোটিপতির সংখ্যা যখন বেড়েছে তখন মাথাগণনায় দারিদ্রের প্রচলিত সংজ্ঞা বা কোনভাবে টিকে থাকার আয়সীমার নীচে মানুষের সংখ্যা চার কোটির বেশি। যদি দারিদ্র সীমায় শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, মানবিক মর্যাদার প্রশ্ন যুক্ত করা হয় তাহলে দেখা যাবে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষই অমানবিক জীবনে আটকে আছেন।

রাষ্ট্রীয় বৈরী নীতিমালার কারণেই সর্বজন বা পাবলিক সকল প্রতিষ্ঠানই একে একে ক্ষতবিক্ষত। পাশাপাশি বেসরকারি ক্লিনিক ল্যাবরেটরী ও হাসপাতাল, বেসরকারি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, কনসালটেন্সী ফার্ম ইত্যাদিরও বিস্তার ঘটেছে অনেক। অনলাইন-অফলাইন বেচা-কেনা বেড়েছে; এবং কম্পিউটর, মোবাইল, ইন্টারনেট, টিভি ইত্যাদি কেন্দ্রিক ব্যবসারও প্রসার ঘটেছে যার অনেকগুলোই আমদানিকৃত পণ্যের উপরই নির্ভরশীল। প্রচলিত উন্নয়ন ধারার কারণেই দেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিকাশ ঘটেছে বেশি। স্বনিয়োগভিত্তিক কাজের অনুপাত বেড়েছে। এছাড়া রিকশা, অটোরিকশা, বাস, ট্রাক, টেম্পোসহ বিভিন্ন পরিবহণ, হোটেল রেস্তোরাঁ, ছোট বড় দোকান ইত্যাদি বেশিরভাগ মানুষের অস্থায়ী নিয়োজনের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'টুকটাক অর্থনীতি' হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমজীবী মানুষের প্রধান কর্মক্ষেত্র। এসব খাতে বেশিরভাগ কাজ অস্থায়ী, অনিয়মিত ও মজুরী নিম্নমাত্রার।

বর্তমানে বাংলাদেশে যতসংখ্যক মানুষ বিভিন্ন ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তার চাইতে বেশিসংখ্যক মানুষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে কর্মরত। এদের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। দেশে তাদের কর্মসংস্থান নেই। বিদেশেও তাঁদের জীবন ও জীবিকা চরম নিরাপত্তাহীনতার শিকার। অন্যদিকে এদেরই পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ রেমিট্যান্স এখন বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। দেশে সার্ভিস সেক্টরের দ্রুত বিকাশ হলেও তা কর্মসংস্থানকে খুবই অস্থায়ী, নাজুক ও নিম্ন আয়ের ফাঁদে আটকে রেখেছে।

দোকানদারি অর্থনীতির উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের চাহিদা বাড়ছে যা দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্থায়ী ভিত্তি তৈরির জন্য আগ্রহী নয়। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস বিষয়কে মৌলিক জ্ঞানচর্চায় বাহুল্য জ্ঞান করা হয়। ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খায় এবং বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে বাজার, ভোগবাদিতা ও নিয়তিবাদিতার প্রভাব বেড়েছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, ধর্মীয়করণ ও বেসরকারিকরণ ঘটেছে ব্যাপক মাত্রায়। শিক্ষা সকলের অধিকার ও তা বাস্তবায়ন রাষ্ট্রের দায়িত্ব – এটা কোনো সরকারই স্বীকার করেনি। সর্বজনের জন্য অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ ও অনিচ্ছুক দেখা গেছে সব সরকারকেই। বিপরীতে ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে

তারা। চিকিৎসা খাতেও একই চিত্র। সেকারণে শিক্ষা ও চিকিৎসার উচ্চ ব্যয় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য স্থায়ী উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার বিষয়।

কয়েকদশকে নারীর দৃশ্যমান সচলতা স্পষ্টতই অনেক বেড়েছে। পাশাপাশি ঘরে-বাইরে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনাও বাড়ছে। তার বিরুদ্ধে ছোটবড় প্রতিরোধও তৈরি হচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পে বর্তমানে শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই নারী। শহর ও গ্রামে সরাসরি মজুরি-শ্রমিক হিসেবে নারীর উপস্থিতি এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি দেখা যায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদেরও উপার্জনমুখী কাজে অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। গ্রাম শহরে জমি, কাজ ও আশ্রয় থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি পাচ্ছে; তাদের শিশু ও নারীর অবস্থা তুলনায় আরও বেশি নাজুক। জালিয়াতি, প্রতারণা, এবং নিপীড়নের মাধ্যমে যৌনবাণিজ্যে শিশু কিশোরী ও তরুণীদের ক্রমবর্ধমান হারে যুক্ত করা, এবং নারী ও শিশু পাচারের সুযোগ এখান থেকেই তৈরি হচ্ছে।

আগেই বলেছি, বনজঙ্গল, সরকারী জমি, সাধারণ সম্পত্তি, নদীনালা খালবিল সবই এখন দখলের বস্তু। অতি ধনিক গোষ্ঠীর জন্ম ও বিকাশ এর মধ্য দিয়েই প্রধানত ঘটেছে। এই দখল-সন্ত্রাস, দুর্নীতি এবং অপরাধমূলক তৎপরতা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব নয়। এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, জাইকার হাত ধরে নয়া উদারতাবাদী বা পুঁজিপন্থী অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতিমালায় সকল সরকারি (সর্বজনের) সম্পত্তির মুনাফামুখি দখলের পথ খুলে দেয়া হয়েছে। এসব নীতির কারণেই গত কয়েক দশকে কতিপয় গোষ্ঠীর হাতে বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে পেরেছে। দেশের তেল-গ্যাস-কয়লাসহ প্রাকৃতিক সম্পদ, বিদ্যুৎ খাত, অবকাঠামো, ও কৃষিকে বহুজাতিক পুঁজির জন্য উন্মুক্ত ও দখল নিশ্চিত করবার জন্য তারা মরিয়া। গত কয় দশকে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ও ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক সংস্থাকে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে আইনী-বেআইনী বিভিন্ন তৎপরতায় লিপ্ত দেখা গেছে। শেখ হাসিনা সরকার বিনা নির্বাচনে ক্ষমতা চিরস্থায়ীকরণের চেষ্টা করতে গিয়ে ভারতসহ এসব দেশের সাথে বিভিন্ন ক্ষতিকর চুক্তি করেছে।

গত কয়েক দশকে একদিকে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর জৌলুস অন্যদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের দারিদ্র ও বৈষম্যের বিভীষিকা, একদিকে সম্ভাবনার বিকাশ অন্যদিকে দেশি-বিদেশি দখলদারদের দাপটে জননিরাপত্তার বিপর্যয় একটি নির্মম বৈপরীত্যের মধ্যে বাংলাদেশকে নিক্ষেপ করেছে। দেশে এযাবত অনেক সামরিক-নির্বাচিত-অনির্বাচিত সরকারের পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু এসব নীতির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয়নি, নতুন কোন গতিমুখ সৃষ্টি হয়নি। আগের তুলনায় দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের মাত্রা শুধু বেড়েছেই। দল বদলেছে, মুখ বদলেছে, প্রক্রিয়ার বদল হয়নি। সর্বশেষ দেড় দশকে তার চরম চেহারা দেখা গেছে। রাজনীতির মূলধারা তাই জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে না, করে দেশি ও বিদেশি দখলদারদের। এইসব গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই তাদের প্রতিযোগিতা আর হিংস্র সংঘাত দেখা গেছে গত কয় দশকে। তাদের বর্ম হিসাবেই ধর্ম ও ধর্মপন্থী গোষ্ঠী ব্যবহার ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিযোগিতাও এই সময়ে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে।

৬. সামরিক শাসন ও জামায়াতের প্রত্যাবর্তন

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘরে ঘরে ধর্মচর্চা বেড়ে গিয়েছিল। অনিশ্চয়তার মুখে নিরাপত্তার প্রার্থনায় নামাজ, কুরআন খতম, জিকির, দোয়া দরূদ সবই বেড়েছিল মুসলিম পরিবারগুলোতে। আমাদের পরিবারে তার অংশীদার ছিলাম আমিসহ সব ভাইবোনেরাই। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি যারা অংশ নিয়েছেন, যারা সহায়তা করেছেন, মুসলমান হলে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর রাজাকার বদরদের নৃশংসতার মুখে, আল্লাহ রসুলের উপর ভরসাই ছিল তাদের বড় অবলম্বন।

কিন্তু অন্যদিকে জামায়াতসহ প্রায় সব ইসলামপন্থী দল পাকিস্তান সামরিক জান্তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। অধিকাংশ প্রভাবশালী পীরের ভূমিকাও ছিল একইরকম। তাঁদের কেউ কেউ সরাসরি পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা, নারী নির্যাতনের পক্ষে সাফাইও গেয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পীর বা নেতা হিসেবে এদেরই মেনেছেন জীবনভর, তারা উল্টো মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছেন। ধর্মীয় নেতাদের অবস্থান তাঁদের প্রভাবিত করতে পারেনি। স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশের মানুষ এই ধারা অব্যাহত রেখেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চা থেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তাঁরা আলাদা করে রেখেছেন।

ইতিহাস আরও সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেবার দাবি জানায়নি; সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার জন্য কোনো মিছিল করেনি; সংবিধানের ধর্ম-নিরপেক্ষতা নীতির পরিবর্তন করার জন্য দাবি তোলেনি; ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করবার পক্ষেও কোনো মত প্রকাশ করেনি। তবুও বিভিন্ন সময়ে শাসকগোষ্ঠী এসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের নিজেদের সুবিধার্থে, অন্য ব্যর্থতাকে আড়াল করতে, কিংবা জনগণের ধর্মানুভূতিকে ব্যবহার করে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে। লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশে (এবং ৭১ পূর্ব ও পরবর্তী পাকিস্তানে) সামরিক শাসনের কালে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রসার ঘটেছে সবচাইতে বেশি। এর বাইরে বুর্জোয়া রাজনীতির সংকট এবং বাম রাজনীতির বুর্জোয়া লেজুড়বৃত্তি ধর্মপন্থী রাজনীতির পরিসর বাড়িয়েছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ ঘটেছে অসংখ্য। মূল যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকজন পার পেয়ে গেছে প্রথমেই। স্বাধীনতার পর 'দালাল আইন' করে দেশি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কার্যক্রম শুরু হয়। একপর্যায়ে ১৯৭৩ সালে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বাদে বাকি সকলের জন্য 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করা হয়। এর ফাঁক দিয়ে বড় ছোট অনেক অপরাধীই পার পেয়ে যায়।

এ সময়ে ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা খাতে ব্যয়বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু কর্মসূচি নেন শেখ মুজিব। একই সাথে তিনি ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্ভবত 'ধর্মহীনতা'র মিথ্যা অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে এবং একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্যই এসব উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

বিশ্বব্যাংক-আইএমএফএর শর্ত অনুযায়ী অর্থনীতির সংস্কারও শুরু হয় এই সময়েই। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় সরকারের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। ১৯৭৪-এ আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এরপর জরুরী অবস্থা এবং একদলীয় শাসনে আপাতদৃষ্টিতে মহাপরাক্রমশালী সরকার প্রকৃতপক্ষে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন সামরিক বাহিনীর একাংশ দ্বারা এবং শুরু হয় সামরিক শাসন।

সামরিক শাসনামলে পাকবাহিনীর সহযোগী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমে বৈধতা পায়। সেই সাথে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সক্রিয়

ব্যক্তিরাও সমাজে রাজনীতিতে আবারো ফিরে আসতে থাকে। ১৯৭৮ সালে জামায়াত আনুষ্ঠানিকভাবে তার কার্যক্রম শুরু করলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে প্রথম আন্দোলন সূচিত হয়। সেসময় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং দেশজুড়ে প্রভাবশালী। কর্ণেল কাজী নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে তারাই এই আন্দোলন সারাদেশে বিস্তৃত করে। জামান সাহেবের ভাষ্য অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাদের সাথে বৈঠক করে এবিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৮১ সালে জিয়া নিহত হন, একই সূত্রে আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার নিহত হন। সেসময় সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে এরশাদই ছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্রে।

১৯৮২ সালে নির্বাচিত বিএনপি সরকারকে উচ্ছেদ করে এরশাদের নেতৃত্বে আবারো সামরিক শাসন শুরু হয় এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যু ধামাচাপা পড়ে যায়। পুরো ৮০ দশক জুড়ে এরশাদ তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখবার জন্য ধর্ম, ধর্মপন্থী দল, মাদ্রাসা, পীর, মাজার ইত্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। ক্ষমতার সুবিধার্থে দুর্বৃত্ত কিছু নেতাকে দুহাতে পৃষ্ঠপোষকতা দেন। এই সময়েই ধর্মের বাণিজ্যিকীকরণ, পীর ও ধর্মপন্থী দলগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্প্রসারণ ঘটে সবচাইতে বেশি। শীর্ষপদ থেকে দুর্নীতির বিস্তার ঘটে তখনই।

এই দশকে এরশাদ স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫ দল ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দল পরিচালিত আন্দোলনে সমঝোতার মধ্য দিয়েই যুগপৎ কর্মসূচিতে জামায়াতে ইসলামী অংশীদার হয়ে যায়। ১৯৮৬ সালে এরশাদ সংসদ নির্বাচন দিয়ে ক্রমবর্ধমান জনপ্রতিরোধ থেকে নিজের ক্ষমতা রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ ১৫ দলের কয়েকটি দলের সাথে জামায়াতও অংশ নেয়। নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি ও কয়েকটি বাম দল। ১৫ দল ভেঙে ৫ বাম দল আলাদা হয়ে যায়। একদিকে প্রশাসনের প্রশ্রয় অন্যদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশীদারের বৈধতা নিয়ে এই দশকেই জামায়াতে ইসলাম দেশব্যাপী নিজেদের দলের সবচাইতে বেশি সম্প্রসারণ ঘটাতে সমর্থ হয়। এছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের দক্ষ কৌশলী নানা প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয় এসময়েই।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের দ্বন্দ্ব সংঘাত বাড়তে থাকে। বিশেষত ৮০ দশকের দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের সন্ত্রাস, রগকাটা, হত্যার বহু খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। শিবিরের সঙ্গে প্রধানত সংঘাত হয় বাম সংগঠনগুলোর। কিন্তু ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সাথেও অনেকগুলো রক্তাক্ত সংঘাত দেখা যায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের হাতে ছাত্রদল নেতা কবির নিহত হন ১৯৮৯ সালে। এরপরই বাকি সকল ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরকে ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

এই দশকেই বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি জোরদারভাবে বাস্তবায়ন হতে থাকে। সেই অনুযায়ী শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রেও বাণিজ্যিক তৎপরতার সুযোগ উন্মুক্ত হয়। ক্রমে শিক্ষা, ব্যাংক, বীমা, কম্পিউটার, এনজিও সবক্ষেত্রে জামায়াত দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। সরকারী প্রশাসন-বিনিয়োগ খাত-এনজিও, এবং কয়েকটি দেশের দূতাবাস মিলে জামায়াতের একটি শক্ত নেটওয়ার্ক দাঁড়ায়। একদিকে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, দুপক্ষের জন্যই অনুকূল সময় ছিল এরশাদের স্বৈরশাসন।

১৯৮৭ সালের শেষ দিকে এরশাদ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন ব্যাপক আকার নেয়। ১০ই নভেম্বর বুকে পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক', 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে সরকার বিরোধী মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন নূর হোসেন। পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হবার পর গণপ্রতিরোধ দ্রুত গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। জরুরি অবস্থা দিয়ে এরশাদ কোনোভাবে সামাল দিতে সক্ষম হন। ক্ষমতার বৈধতা তৈরি করতে তিনি আবার সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। সে নির্বাচন বর্জন করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দল, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দল, ৫ বাম দল, জামায়াতসহ সবাই।

১৯৮৮ সালে কতিপয় 'গৃহপালিত' দল নিয়ে করা এই প্রহসনের নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে মানুষজনই দেখা যায়নি। তবে ঘোষিত ফলাফলে বিপুল ভোটে এরশাদের দল বিজয়ী হয়। এরশাদ সরকার নিজের জনধিকৃত গদির বৈধতা আদায় করতে সেই চরম প্রহসনমূলক ভোটারবিহীন নির্বাচনে গঠিত সংসদে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' করে সংবিধান সংশোধন করে। তবে

আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতসহ উপরের সবগুলো দলই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়।

৭. যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও হেফাজতের আবির্ভাব

১৯৯০ সালে এরশাদের পতন ঘটে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দল, বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দল ও বাম ৫ দল সরকার পতন-পরবর্তী গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য 'তিন জোটের রূপরেখা' দিয়েছিল। তবে এই রূপরেখা বাস্তবায়নে পরের সরকারগুলোর কোনো উদ্যোগ দেখা যায় নি। এরশাদ পতনের পর জামায়াতে ইসলামীও বিজয়ী শক্তি হিসেবে নিজেদের উপস্থিত করে।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয় বিএনপি। কিন্তু তাদের সরকার গঠনে যথেষ্ট আসন ছিল না, দুটো আসন বাকি ছিল। বিএনপির সরকার গঠনে সেই সমর্থন দিয়ে জামায়াত তার রাজনৈতিক অবস্থান পোক্ত করে। এরপর আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুদলই তাদের নিজ নিজ প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর জন্য গোলাম আজমের কাছে সমর্থনের জন্য দোয়া চাইতে যায়। যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে নাগরিকত্ব হারানো গোলাম আজম তখনও নাগরিকত্ব ফেরত পাননি। পরিস্থিতি অনুকূল দেখে ১৯৯১ সালের শেষ দিকে জামায়াত গোলাম আজমকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের আমির ঘোষণা করে। সমাজে এসবের প্রতিক্রিয়া হয় ব্যাপক। তার কারণেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আন্দোলন আবারো নতুন ভাবে শুরু হয়।

১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি গঠিত হয় ১০১ সদস্য বিশিষ্ট 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। আহবায়ক হন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। পরে এই কমিটি সম্প্রসারিত করে আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন বামদল এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে গঠিত হয় 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন জাতীয় সমন্বয় কমিটি'। ১৯৯২ এর ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক গণআদালত অনুষ্ঠিত হয়। সরকার এই গণআদালত আয়োজনকারী প্রধান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করে। কিন্তু এই আন্দোলন এতো বিস্তৃত হয় যে, সারাদেশেই জামায়াতে ইসলামী কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

এই পর্যায়ে একটি মহাবিপর্যয় থেকে জামায়াতকে কার্যত প্রথমে উদ্ধার করে ভারতের হিন্দুত্ববাদী বিজেপির সাম্প্রদায়িক সহিংস কর্মসূচি এবং পরে আওয়ামী লীগের 'বৃহত্তর ঐক্য'। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে বিজেপির বাবরী মসজিদ ভাঙার ঘটনা ঘটে। এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়। এই জনবিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে জামায়াতে ইসলামী নিজেদের আবার জোরগলায় পুনর্বাসন করতে সক্ষম হয়। এর দেড়বছরের মধ্যে ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে জাহানারা ইমাম মৃত্যুবরণ করেন। একই সময়ে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সমঝোতার খবর প্রকাশিত হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ১৯৯৫ সালে আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির যুগপৎ আন্দোলনের সূচনা হয়। এই ঐক্য জামায়াতকে বিরাট স্বস্তি দেয় এবং তার কর্মসূচির সম্প্রসারণ অনেক সহজ হয়। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৯৬ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যায়। একপর্যায়ে অধিকতর দরকষাকষির মাধ্যমে জামায়াত আবারো যুক্ত হয় বিএনপির সঙ্গে। গঠিত হয় বিএনপি জামায়াতসহ চার দলীয় জোট। ২০০১ সালের নির্বাচনে এই জোট বিপুলসংখ্যক আসন নিয়ে বিজয়ী হয়, এবং সেভাবেই জামায়াত সরকারের অংশীদার হয়। স্বাধীনতার ৩০ বছর পর, গণআদালত আন্দোলনের ১০ বছর পর, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সুনিদিষ্ট অভিযোগ আছে এরকম দুজন ব্যক্তি বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দুটো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জামায়াতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব আরও সম্প্রসারিত হয়।

বস্তুত ৮০ দশক থেকে অর্থনৈতিক নীতি, দুর্নীতি, লুণ্ঠন এবং অগণতান্ত্রিক শাসন পীড়নে দেশ যেভাবে চলেছে তাতে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির কোন ফারাক করা যায় না। তবে ১৯৭১ সালের বিচার নিষ্পত্তি না হওয়ায় আওয়ামী লীগের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্র করে একটি ভিন্ন সমর্থনবলয় তৈরির সুযোগ তখনও অবশিষ্ট ছিলো। আর ২০০৮ সালের নির্বাচনে এটাই ছিল তার শেষ অবলম্বন। সুতরাং যুদ্ধাপরাধীর বিচারের প্রতিশ্রুতি নিয়েই তাকে এবার জনগণের সামনে যেতে হয়েছে। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে পরিচিত দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মন্ত্রী হওয়ার কারণে সমাজে যে ক্ষোভ তৈরি হয় তার উপরই ভর করে আওয়ামী লীগ।

ক্ষমতা গ্রহণের পর এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে গেছে আওয়ামী লীগ; ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। চিহ্নিত কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীর বিচার শুরু হলেও প্রথম থেকেই বিভিন্ন কারণে জনগণের মধ্যে সংশয় দেখা যায়। কারণ প্রথমত, এই আশংকা বরাবরই থেকেছে যে, যেহেতু আওয়ামী লীগ একবার জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য করেছে, বারবার নানা আপোষ প্রবণতা দেখিয়েছে, তাদের একটি মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে, সেহেতু যেকোনো সময় ভোট বা অন্য কোনো বিবেচনায় আবারও এরকম কিছু করতে পারে। দ্বিতীয়ত, শুধু ১৯৭১ নয় এর আগে থেকেই জামায়াত বরাবরই যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রশক্তি । যুক্তরাষ্ট্রের চাপ, লবিং ইত্যাদি যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে পরেও নানাভাবে সক্রিয় থেকেছে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে ধনিক শ্রেণী গঠনের প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ বিভক্তি মুছে দখল-লুণ্ঠন-জালিয়াতির একটি শক্তিশালী চক্র তৈরি হয়েছে দেশে। এই শ্রেণী-মৈত্রীর শক্তি যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক তৎপরতা ছাড়াও ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জমি দখল, নির্যাতনেও এই ঐক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম থেকেই এই বিচার কাজে সরকারের অদক্ষতা, অযত্ন, শৈথিল্য, দুর্বলতা নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ছাত্রলীগ-যুবলীগ হামলা-হত্যা-জখম-সন্ত্রাস-চাঁদাবাজী করে সমাজে বিক্ষোভ বাড়িয়েছে। খুনী-সন্ত্রাসীদের ক্ষমা-প্রশ্রয় ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী নানা চুক্তি করে সরকার জনবিরোধী অবস্থান নিয়েছে। দখল নির্যাতন, দুর্নীতি, লুণ্ঠন, জাতীয় স্বার্থবিরোধী অপকর্মের বিরুদ্ধে জনগণের নানা আন্দোলনের সামনে না দাঁড়াতে পেরে যখন তখন যে কোনো আন্দোলনকে 'যুদ্ধাপরাধী বিচার নস্যাতের আন্দোলন' কিংবা 'জামাতী চক্রান্ত' বলে সরকারী লোকজন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতের শক্তি জুগিয়েছে। সামনে তখন ২০১৪ সালের নির্বাচন। নানা রহস্যজনক ঘটনায় ভোটের হিসাব নিকাশে সরকার জামায়াতের সাথে আবারো নতুন আঁতাতের পথে যাচ্ছে, এই সন্দেহ ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে।

সমাজের ভেতরে নানা সংশয় ও প্রশ্ন নিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করার দাবিতে তখন তৈরি হয় তরুণদের নেতৃত্বে 'শাহবাগ আন্দোলন' গণজাগরণ মঞ্চ এবং তা ব্যাপক জনসমর্থন পায়। কয়েকমাস এই আন্দোলন সমাজের মনোযোগের কেন্দ্রে ছিলো। কিছু হঠকারী তৎপরতা এবং আওয়ামী লীগের ক্ষমতার রাজনীতির বলয়ে আটকে গিয়ে এই

আন্দোলন কিছুদিনের মধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়ে কিংবা সরকার এটাকে গিলে ফেলে।

এই সময়েই আবির্ভাব ঘটে হেফাজত ইসলাম সহ আরও নানা গোষ্ঠীর। গঠনের তিন বছরের মাথায় ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের বিশাল সমাবেশ বিস্ময়কর এবং রহস্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এর আগের তিনদশকের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক গতিধারায়, যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগে দিয়েছি।

এই বছর শাহবাগে আন্দোলন ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে, অথচ এই আন্দোলনকে কতিপয় গোষ্ঠী 'নাস্তিকতা প্রচার', 'ইসলাম বিদ্বেষী' হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ৭১ এর গণহত্যায় নিহত মানুষদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠই মুসলিম, সেই কারণেও ইসলামপন্থীদের তো আরও সক্রিয়ভাবে এই গণহত্যার অপরাধীদের বিচার দাবি করার কথা। কিন্তু দেখা গেছে এই দাবি তুললেই তাকে 'ইসলাম বিরোধী' বলে কোনো কোনো গোষ্ঠী হুলস্থুল শুরু করে। বোঝা যায় যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা করাই তাদের রাজনৈতিক অবস্থান। এইসব মিথ্যা প্রচারের ওপর ভর করেই হেফাজত নেতৃত্ব সারাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমবেত করে। সরকার তাদের প্রথমে অনুমতি দিয়েও পরে 'এই সমাবেশকে বিএনপি জামায়াত কাজে লাগাতে পারে' এই ভয়ে দীর্ঘমেয়াদী অবস্থানে বাধা দেয়। রক্তক্ষয়ী যৌথ সামরিক অভিযানে হেফাজতের সমাবেশ শেষ হয়। সেই অভিযানে নিহতদের সংখ্যা বা তালিকা এখনও কেউ স্পষ্ট করেনি।

এই রক্তক্ষয়ী ঘটনার আগে থেকেই হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন মাত্রার যোগাযোগের কথা জানা যায়। সমাবেশউত্তর কালে এই যোগাযোগ ও সমঝোতা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। পাইকারিভাবে লেখক-ব্লগারদের গ্রেফতার, একের পর এক ব্লগার হত্যাকান্ডের সুরাহা করতে সরকারের অনীহা, আইসিটি আইনের মাধ্যমে কার্যত 'ব্লাশফেমী' আইনচর্চা, ইত্যাদি পর্দার পেছনের সমঝোতার প্রমাণ দেয়। শুধু তাই নয়, হেফাজতের দাবি অনুযায়ী স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রাতারাতি পরিবর্তনসহ একের পর এক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা তাদের আস্থাভাজন হন। হেফাজতের প্রকাশ্য সমাবেশে, মূল নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে, তাঁকে 'কওমী জননী' খেতাব দেয়া হয়। আওয়ামী লীগের

অঙ্গ সংগঠন আওয়ামী ওলামা লীগও হেফাজতের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বিভিন্ন দাবি ও কর্মসূচি হাজির করতে থাকে।

গত দশকে দেশে গুম খুনের আরও বিস্তার ঘটে, সকল প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণ চরম আকার নেয়, নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। নির্বাচনকে সরকার প্রহসনে পরিণত করে। গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত করে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার দিকে সরকার যত এগুতে থাকে ততই দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নানাধরনের সন্ত্রাসী ও ধর্মপন্থীসহ বিভিন্ন বৈষম্যবাদী গোষ্ঠীর তৎপরতা বাড়তে থাকে।

৮. ধর্মের ভাষা মানুষের লড়াই

বাইরের নাম কিংবা ধর্মীয় পরিচয় যাই থাকুক, বিভিন্ন ধর্মের উগ্রপন্থী বা ডানপন্থী রাজনীতির বিভিন্ন ধারার মর্মবস্তু পর্যালোচনা করলে এসবের মধ্যে অভিন্ন কিছু উপাদান পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ভিন্নজাতি, ভিন্নধর্ম ও নারীর প্রতি বিদ্বেষ; চিন্তার অনড়তা; সৃজনশীলতা ও সমতার বিরোধিতা; অসহিষ্ণুতা এবং যুদ্ধপ্রেম। সাধারণভাবে শাসক শ্রেণী বা সমাজের ক্ষমতাবানদের সাথে এই গোষ্ঠীগুলোর যোগাযোগ, নির্ভরশীলতা ও সম্প্রীতি থাকে।

সেজন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বা সৃজনশীল মানুষ, প্রচলিত বিধি ভঙ্গকারী নারী ও অন্য লিঙ্গের মানুষ, অন্য ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে এদের যত সক্রিয় সোচ্চার অবস্থান দেখা যায় তার ছিটেফোঁটাও জালেম, শোষক, দুর্নীতিবাজ, লুটেরাদের বিরুদ্ধে দেখা যায় না। বরং তারা অনেক সময়েই এদেরই মুখপাত্র বা লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করে। তবে এটি সাধারণ চিত্র হলেও ধর্মপন্থী রাজনীতির ভিন্ন দৃষ্টান্তও বিভিন্ন স্থানে ও কালে পাওয়া যায়, যা ধর্মপন্থী রাজনীতির মূলধারাকে চ্যালেঞ্জ করে বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। অর্থাৎ ধর্মের বহুরকম ভাষা তৈরি হতে পারে।

সেজন্য সবকালে সবদেশে আমরা দেখি যে, শ্রেণী সংগ্রাম হোক বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই হোক, বা জাতীয় মুক্তির লড়াই হোক -- এই লড়াইগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি ও ধর্ম বিভিন্নভাবে একটা ভাষা পায়। ল্যাটিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখি, তাঁরা তাদের সংস্কৃতি,

বিশেষত মিথ ব্যবহার করে শোষণ আধিপত্য বিরোধী অনেক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। মিথ থেকেও তারা শক্তিসঞ্চয় করেছেন। আফ্রিকাতেও আমরা এ ধরনের অভিজ্ঞতা পাই। ল্যাটিন আমেরিকায় 'লিবারেশন থিওলজি'র অভিজ্ঞতা সারাবিশ্বের মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কিউবা, নিকারাগুয়া, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়ায় এই ধারার চার্চের ভূমিকা দেখি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে।

'লিবারেশন থিওলজি' বা 'মুক্তির ধর্মতত্ত্বে'র অনুসারীরা বলেন, ঈশ্বর হচ্ছেন জনগণের প্রভু, সেকারণে অবশ্যই শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরোধী। ঈশ্বর তাই কখনো পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করতে পারেন না। যদি কেউ ঈশ্বরকে পেতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। চার্চের এই ধারাটি অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ল্যাটিন আমেরিকায়। 'লিবারেশন থিওলজি'র আন্দোলন থেকে বোঝা যায়, ধর্মের ভাষা দিয়েও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, শোষণ নিপীড়ন বিরোধী লড়াই হতে পারে; ধর্মের ভাষা দিয়ে শ্রেণী সংগ্রামও হতে পারে। তবে তা এইসাথে এটাও দেখায় যে, এসবই নির্ভর করে ধর্মের নতুন মুক্তিকামী ব্যাখ্যা এবং সমাজে বিপ্লবী শক্তির সাবালক উপস্থিতির ওপর।

বাংলাদেশে মওলানা ভাসানী ইসলামের একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যা ছিল স্পষ্টতই শোষণের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সাম্যের পক্ষে। কিন্তু ভাসানী কোনো ধারা তৈরি করতে পারেননি। তার ফলে যেটা ল্যাটিন আমেরিকায় সম্ভব হয়েছে 'লিবারেল থিওলজি'র মধ্য দিয়ে, সেটা ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সম্ভব হয়নি। তার পেছনে বিপ্লবী শক্তির দুর্বলতা এবং দৈন্যও নিশ্চয়ই দায়ী।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনে গরীব মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি দেখিয়ে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন যে, এসব সংগঠন গরীব নিপীড়িত মানুষের লড়াই-এর সংগঠন। কিন্তু কোনো রাজনীতির ধারায় গরীব মেহনতি মানুষের উপস্থিতি দিয়ে যদি তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হতো তাহলে বাংলাদেশের মেহনতি মানুষের সবচাইতে বড় দুটো দল হতো আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। কারণ দেশের গরীব মানুষেরা বিভিন্ন মাত্রায় কয়েক দশক ধরে এই দুটো দলেরই প্রধান ভোটার, প্রধান সমর্থক

গোষ্ঠী। আসলে কোনো রাজনীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে কি না তা নির্ভর করে তার মতাদর্শিক অবস্থান ও কর্মসূচির ওপর, তার শত্রুমিত্র বিচারের ওপর। এটা ঠিক যে, অধিকাংশ মাদ্রাসায় গরীব মানুষের ছেলেমেয়েরাই পড়ে, কিন্তু এর বিকাশ, নিয়ন্ত্রণ গরীব মানুষের হাতে নয়। উপরন্তু মাদ্রাসা মানেই শুধু একরকম প্রতিষ্ঠান নয়, এখন স্কুলের পাশাপাশি খুবই ব্যয়বহুল ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসাও গড়ে উঠছে অনেক বেশি সংখ্যায়। তার চাহিদা তৈরি হয়েছে ক্রমবিকাশমান মধ্যবিত্তের মধ্য থেকেই।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক এই রাজনীতির নেতৃত্ব বিত্তবান এবং সমাজের সুবিধাভোগীদেরই অংশ। তাদের অনেকের সন্তানই ব্যয়বহুল ইংলিশ মিডিয়ামে বা বিদেশে পড়ে, আর তাদের ক্ষমতার মজুদ হিসেবে কাজ করে মাদ্রাসার গরীব ছাত্র ও শিক্ষকেরা। মাদ্রাসার গঠনগত নিয়ন্ত্রণমূলক বৈশিষ্ট্যের কারণে সমাজের প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা, ক্ষমতাবান লুটেরা ধনিক বা রাষ্ট্রপরিচালকেরা তাদের উপর এককভাবে কর্তৃত্বশালী হতে পারে, তাদের ব্যবহারের সুযোগ পায়। মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, যারা অধিকাংশই গরীব বা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান, তারা এই রাজনীতির প্রধান ভিত্তি হলেও নীতি নির্ধারণে তাদের কোনো ভূমিকা থাকে না। একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর বাইরে চিন্তাজগতের সাথে যোগাযোগের সুযোগও তাদের খুব কমই ঘটে। ধর্মীয় পেশাজীবী গোষ্ঠীর বৃহৎ অংশের ভূমিকা তাদের সামাজিক অবস্থানের দুর্বলতার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। গরীব নারী পুরুষদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব সংঘাত, বা তাদের কর্তৃত্ব বুঝতে গেলে দেখতে হবে বিদ্যমান ক্ষমতাবানদের সাথে তাদের সম্পর্কের ধরন। ক্ষমতাবানদের উপর নির্ভরশীলতার কারণেই এই ধর্মীয় পেশাজীবীদের অনেককেই নিপীড়কের পক্ষে দাঁড়াতে দেখা যায়। শিক্ষা প্রশিক্ষণের ধরনও তাকে বৈষম্যবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

এসব কারণে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক ক্ষেতমজুর, নারী, আদিবাসী, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন স্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনে এদের খুব কমই শামিল হতে দেখা যায়। একই কারণে চিহ্নিত লুটেরা নির্যাতকদের বিরুদ্ধে তাদের সাধারণভাবে কখনো ফতোয়া দিতে দেখা যায় না। বরং অনেকক্ষেত্রে এদের প্রভাবশালী নেতারা ধর্মীয় বয়ান নিয়ে নির্যাতকদের রক্ষাকারী হিসেবে আবির্ভূত হন।

আরেকটি বিষয় আমাদের মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইহুদী খ্রীষ্টানবিরোধী ধর্মীয় রাজনীতি আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনীতি এক কথা নয়। সাম্রাজ্যবাদ মানে শুধু ট্রাম্প বা বুশ বা ওবামা বা নেতানিয়াহু বা কিছু ইহুদী ব্যবসায়ী নয়, এটি একটি জৈবিক বিশ্বব্যবস্থা। এর চালকদের মধ্যে খ্রীষ্টান, ইহুদী যেমন আছে, তেমনি মুসলমান হিন্দুও আছে। আবার প্যালেস্টাইন থেকে শুরু করে ভেনেজুয়েলা পর্যন্ত যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিরোধ, সেখানে মুসলমানদের পাশাপাশি আমরা খ্রীষ্টান, ইহুদী, হিন্দুসহ বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষদের এক সারিতে দেখি।

শুধু ধর্মপরিচয় দিয়ে তাই রাজনীতি সনাক্ত করা যায় না। কেননা এক ধর্মের মধ্যেই বহু সুর থাকে। বুশ এর গড ইরাকে হামলার নির্দেশ দেয়; শ্যাভেজের গড তাকে রুখে দাঁড়াতে বলে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা ইসলাম ও আল্লাহ রসুলের দোহাই দিয়েই এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন ধর্ষণসহ ভয়ংকর অপরাধ করেছে। আবার অন্যদিকে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা আল্লাহ রসুলের নাম নিয়েই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ ও ধর্মের অর্থ তাই দুজনের কাছে ভিন্ন। একজনের কাছে নিপীড়নের অবলম্বন, আরেকজনের কাছে নিপীড়িতের আশ্রয়।

৯. সন্ত্রাসীর রকমফের এবং বাংলাদেশের বিপদ

বেশ কয়েক বছর সাংগঠনিকভাবে কোণঠাসা হয়ে থাকলেও বাংলাদেশে ধর্মপন্থী দলগুলোর মধ্যে এখনও জামায়াতে ইসলামী সবচাইতে বড় ও সংগঠিত দল। তাদের আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রশাসনিক শক্তি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। গত সরকারের বেশিরভাগ সময় তারা স্বনামে কাজ করতে না পারলেও নানা সংগঠনের নামে কিংবা ছদ্ম পরিচয়ে তাদের কাজ অব্যাহত ছিল।

এর বাইরে, বিশেষত তথাকথিত 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ' শুরু হবার পর থেকে নিত্যনতুন ইসলামপন্থী সংগঠনের নাম শোনা যায়। তবে এর কোনটা আসল কোনটা নকল বা কোনটা গোয়েন্দা সংস্থার তৈরি তা বলা কঠিন। 'জঙ্গী' 'সন্ত্রাসী' দমনের নামে যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাস দমন' মডেলে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশও। একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন সময় যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সাথে যৌথ সামরিক কর্মসূচিও নেয়া হয়েছে। এই মডেলে প্রবেশের অর্থ যে কথিত জঙ্গী-সন্ত্রাসীর বর্ধিত পুনরুৎপাদন এবং সন্ত্রাসের

চিরস্থায়ীকরণ তা আমরা অভিজ্ঞতা থেকেই দেখছি। যুক্তরাষ্ট্রের এই মডেলের সক্রিয় সহযোগী পাকিস্তানের বিপন্ন দশা এর একটি বড় প্রমাণ।

'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের' কাঠামোতে বিশ্বজুড়ে যে প্রচার তাতে তিনধরনের ধর্মীয় গোষ্ঠীর বা 'সন্ত্রাসী'র দেখা পাওয়া যায়।

প্রথমত, কিছু কিছু ইসলামপন্থী গ্রুপ আছে যারা 'ইসলামী রাষ্ট্র' 'খিলাফৎ' প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে, এবং তাদের অনেকে কমবেশি সহিংস পথই সঠিক মনে করে। তাদের কেউ কেউ ভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বীদের ব্যাপারে, নারী প্রশ্নে, খুবই বিদ্বেষমূলক এবং আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করে। কেউ কেউ পশ্চিমা ব্যবস্থার বিরোধিতা করে, নিজেদের বুঝমতো, ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে চায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, তার মানুষ ও পরিবেশ বিধ্বংসী চরিত্র, অর্থাৎ পুঁজিবাদের অন্তর্গত সমস্যার যথাযথ উপলব্ধি না করে, ধর্মীয় বিচারে খ্রিস্টান ও ইহুদী বিরোধিতা, তাদের প্রতিবাদের শক্তিকে প্রায়শই ভিন্ন পথে নিয়ে যায়, সাম্রাজ্যবাদের মূল শক্তি ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামপন্থী ধারার কিছু নাম আমরা প্রচারণায় পাই, যারা বিভিন্ন দেশে গোয়েন্দা সংস্থার পালিত গোষ্ঠী বলে ধারণা করা যায়। বিভিন্ন সময়ে তাদের ব্যবহার করা হয় এবং নতুন নতুন নাম যোগ হয়। বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারের রহস্যজনক ভূমিকায় এই ধারণা সৃষ্টি হয়। তাদের সাথে সম্পর্কিত সন্ত্রাসী ঘটনার কোনো কূল কিনারা পাওয়া যায় না। কিন্তু সেগুলো দেখিয়েই দেশে দেশে জনগণের বিরুদ্ধে নতুন নতুন নিপীড়ন, নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণমূলক চুক্তি-বিধি-নীতি গৃহীত হতে থাকে।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সংগঠিত প্রচারণা। এর মাধ্যমে আতংক তৈরি করে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা, সামরিকীকরণ, নিরাপত্তা বাণিজ্যকে যৌক্তিকতা দেয়ার চেষ্টা দেখা যায়।

১০. বিপদের নানা দিক

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কমপক্ষে পাঁচ দিক থেকে বিপদের মধ্যে আছে।

প্রথমত, বিপদের বড় উৎস হলো সাম্রাজ্যবাদ। ৯০-এর পরবর্তী সময়কালে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের জন্য বড় আশ্রয়/যুক্তি/অছিলা হলো ইসলামী জঙ্গী/সন্ত্রাসী। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পরে তার সামনে দৃশ্যমান এবং উপস্থাপন করার মত শত্রু নেই। তাদের যে সামরিক অবকাঠামো ও বিনিয়োগ তার যৌক্তিকতা কী? অর্থনীতিকে অধিকতর ঋণগ্রস্ত করে, জনগণের প্রয়োজন উপেক্ষা করে বিভিন্ন বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থে সমরাস্ত্র, যুদ্ধ, এবং আগ্রাসনের পেছনে বিপুল ব্যয় কীভাবে যুক্তিযুক্ত হবে যদি বড় কোনো শত্রু না থাকে? সুতরাং 'শত্রু' বাঁচিয়ে রাখা, কোথাও না থাকলে সেখানে তৈরি করা সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য আবশ্যক। এখন চীন যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হলেও সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের মডেল এখনও কার্যকর আছে। অন্যদিকে সৌদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্রী শাসকদের সাথে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের গভীর বন্ধন প্যালেস্টাইনে ইসরাইলী গণহত্যা অব্যাহত রাখতে দিয়েছে, শান্তিচুক্তি নতুন দখলদারিত্ব নিশ্চিত করতে যাচ্ছে। এই মৈত্রী বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় বৈষম্যবাদী শক্তিগুলোকে পুষ্টি যোগাচ্ছে।

বিপদের দ্বিতীয় উৎস হলো, ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ চাষ। এর মাধ্যমে বিশ্বের মুসলমান সমাজকে যেভাবে ঘা দেয়া হয়েছে, যেভাবে আহত করা হয়েছে তার প্রতিক্রিয়ায় ধর্মের নামে বৈষম্যবাদী রাজনীতির ভূমিই উর্বর হয়েছে।

তৃতীয়, বিপদ দেশের মূলধারার রাজনীতি থেকে আসছে। কয়েক দশক জুড়ে বৃহৎ রাজনৈতিক দুটি দল এবং তাদের জোট ক্ষমতার রাজনীতিতে আধিপত্য অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করে ধর্মপন্থী রাজনীতির ওপর ভর করেছে, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী, মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পীরদেরকে 'রিজার্ভ আর্মি' হিসেবে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করেছে দুই প্রধান ধারার রাজনীতি। ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ কালে (২০১৪-২৪) আওয়ামী লীগ কৌশল হিসেবে হেফাজত ও তুলনীয় বিভিন্ন ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে সখ্যতা তৈরি করেছে। আবার কখনও কখনও জামায়াতের সঙ্গেও বোঝাপড়া করেছে। তার সহযোগী ছিল ওলামা লীগসহ আরও বেশকিছু তুলনীয় সংগঠন। শাসক শ্রেণীর এই দুই অংশের প্রতিযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা, ধর্মের নামে, উগ্র অসহিষ্ণু রাজনীতিও তাদের এজেন্ডাকেই শক্তিশালী করেছে। ফলে

গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আওয়াজ উঠলেও এসব বৈষম্যবাদী রাজনীতির আগ্রাসী তৎপরতাই এখন বেশি দেখা যাচ্ছে।

চতুর্থত, বিপদের আরেক উৎস ভারতের রাষ্ট্র ও রাজনীতি। ভারতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার প্রসার বাংলাদেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িকতার ভূমি উর্বর করছে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের আগে ও পরে সহিংস সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবাষ্প তৈরি হয়েছিলো তার রেশ তো আছেই, তার সাথে ভারতের আগ্রাসী রাজনীতি এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করছে।

পঞ্চমত, বিপদের বড় উৎস হলো বিপ্লবী, বামপন্থী বা জনপন্থী রাজনীতির দৈন্যদশা। সমাজ ও অর্থনীতির বর্তমান গতি ও বৈপরীত্য, অর্থাৎ প্রাচুর্য্য ও দারিদ্র, সমৃদ্ধি ও বঞ্চনা, সম্ভাবনা ও হতাশা, নিপীড়ন ও নিরাপত্তাহীনতা, চিকিৎসা বাণিজ্য ও চিকিৎসাহীনতা, শিক্ষা বাণিজ্য ও শিক্ষা সমস্যা, আর্থিক উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও প্রাণ প্রকৃতি বিনাশ ইত্যাদির গোলকধাঁধার শিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। এর থেকে মুক্তির পথ খোঁজা মানুষের তাই অবিরাম তাগিদ। দেশে লুটেরা ও চোরাই কোটিপতিদের রাজনৈতিক আধিপত্যকে মোকাবিলা ও পরাজিত করার মতো রাজনৈতিক শক্তিই মানুষের আকাঙ্খা। কিন্তু সেই রাজনৈতিক সামাজিক শক্তি সমাবেশ খুবই দুর্বল। বামপন্থীদের বড় অংশ একের পর এক আপোষ ও আত্মসমর্পণ করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করেছে। সমাজে তাই দিশাহীনতা, হতাশা ও অনিশ্চয়তা প্রবল। বলাই বাহুল্য, এই বিপদ দূর হলে আগের চারটি বিপদ মোকাবিলা করা বাংলাদেশের জনগণের জন্য খুবই সম্ভব। শ্রমিক, নারী, শিক্ষার্থী, জাতীয় সম্পদ নিয়ে বিভিন্ন ছোটবড় জনপ্রতিরোধে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বশেষ শিক্ষার্থী গণঅভ্যুত্থানেও এই প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তা ভেঙে গেছে জনপন্থী শক্তি সমাবেশের অতিশয় দুর্বলতার কারণে।

১১. উপায় কী?

দেশে-বিদেশে এখন আতংক আর অনিশ্চয়তা সব ধরনের সক্রিয়তার পথ আগলে আছে। জনগণের মুক্তির লড়াই ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বর্তমান গতি ও জাল, তার অন্তর্গত সংকটের কারণেই, বিশ্বের

সকল প্রান্তের মানুষকে কার্যত এক বৈশ্বিক ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে গেছে। এই বিশ্বব্যবস্থার ফ্যাসিবাদী আবহাওয়ার মধ্যে, কোথাও তার সহযোগী হিসেবে কোথাও তার বিরোধিতা করার নামে, বিভিন্ন চরিত্রের ধর্মপন্থী, জাতীয়তাবাদী, বর্ণবাদী তথা বৈষম্যবাদী রাজনীতির বিস্তার ঘটছে। কিন্তু ধর্মপন্থী রাজনীতি, তার কাঠামোগত ও মতাদর্শিক সীমাবদ্ধতার কারণেই, বর্তমান দানবীয় বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকল মানুষের একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই এগিয়ে নিতে সক্ষম নয়। বরং বর্তমান ধরনে এই রাজনীতির বিস্তার দেশে দেশে মানুষের মুক্তির লড়াইকে বাধাগ্রস্ত করে বিশ্বের শোষক নিপীড়ক যুদ্ধবাজ বৈষম্যবাদী জালেমদের শক্তিকেই স্থায়ীত্ব দিচ্ছে। যারা জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইচ্ছা নিয়ে এসব ধারায় শরীক হয়েছেন, জালেমের জাল সম্পর্কে তাদের মোহমুক্তি সবার জন্যই জরুরী।

দুনিয়া ও মানুষের মুক্তির জন্য শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতিগত বৈষম্য, ও নিপীড়ন বিরোধী বৈশ্বিক মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই অপরিহার্য। দরকার ধর্ম বর্ণ জাতিগত গন্ডি অতিক্রম করে মানবিক নতুন পরিচয়ে নিজেদের সংহতি দাঁড় করানো। তা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া এখনও নানা বাধার মুখে, তবে নতুনভাবে নির্মিত হবার লক্ষণ এবং চেষ্টাও বিশ্বজুড়ে মাঝে মধ্যেই দেখা দিচ্ছে। এই সংহতি ছাড়া কোনো ধর্মের মানুষেরই মুক্তি নেই, মুক্তি নেই ধর্মপন্থী রাজনীতির অনুসারী মানুষদেরও। প্রতিকূলতা ও সংকটেই নতুন সৃষ্টির সময় আসে। প্রবল প্রতিকূলতা আর অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও সেখানেই আমাদের চিন্তা ও সক্রিয়তা যোগ করতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যসূত্র

আনু মুহাম্মদ (১৯৯৪): *ধর্ম, রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন*, চার্বাক, ঢাকা।

আনু মুহাম্মদ (২০০০): *রাষ্ট্র ও রাজনীতি: বাংলাদেশের দুই দশক*, সন্দেশ, ঢাকা।

আনু মুহাম্মদ (২০০৮): *কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ?* সংহতি প্রকাশন, ঢাকা।

আনু মুহাম্মদ (২০১০): *বিপ্লবের স্বপ্নভূমি কিউবা* (২য় সংস্করণ), শ্রাবণ, ঢাকা।

আনু মুহাম্মদ (২০১২): *নারী, পুরুষ ও সমাজ* (৩য় সংস্করণ), সংহতি প্রকাশন, ঢাকা।

আনু মুহাম্মদ (২০২৫): *গণঅভ্যুত্থানের বাংলাদেশ - ১৯৬৯, ১৯৯০, ২০২৪*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

পারভেজ আলম (২০১৫): *জিহাদ ও খেলাফতের সিলসিলা*, আদর্শ, ঢাকা।

রেহনুমা আহমেদ (২০০৬): (অনূদিত ও সংকলিত), *ইসলামী চিন্তার পুনর্পঠন*, *সমকালীন মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রাম*, একুশে, ঢাকা।

Karen Armstrong (2001): *The Battle for God: A History of Fundamentalism.* Random Publishing, NY.

Tariq Ali (2003): 'Re-Colonizing Iraq', *New Left Review*, 15 February.

Tariq Ali (2002): *The Clash of Fundamentalism. Crusades, Jihads and Modernity*. Verso, London.

Nafeez Ahmed (1997): 'The War on Freedom: How and Why America Was Attacked', pp.49-50; *Wall Street Journal*, 23 May.

New York Times, 26 May, 1997.

ট্রাম্প আরোপিত 'পাল্টা-পাল্টি শুল্ক' ও বাংলাদেশ: সম্ভাব্য অভিঘাত ও করণীয়

মোস্তাফিজুর রহমান*

সারসংক্ষেপ

বর্তমান প্রবন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক ২ এপ্রিল, ২০২৫-এ আরোপিত পারস্পরিক শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ, সংক্ষেপে আরটি) এবং তার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বাংলাদেশের রপ্তানি কার্যক্রমের ওপর সম্ভাব্য কি অভিঘাত রাখতে পারে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্মর্তব্য, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি বাজার এবং দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য- তৈরী পোশাক রপ্তানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশের গন্তব্যস্থল। জুতা (ফুটওয়্যার) রপ্তানির ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একটি প্রধান বাজার। সুতরাং, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের তাৎপর্যের বিষয়টি যে কোনো বিচারে গুরুত্বের সাথে আলোচনার দাবীদার। প্রবন্ধে অতিরিক্ত শুল্কের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানির ওপর এ শুল্কের সম্ভাব্য অভিঘাত কি হতে পারে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধে বিশেষতঃ তৈরী পোশাকের বাজারে এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মূল মূল প্রতিযোগী দেশের সাথে তুলনামূলক প্রতিযোগীতাসক্ষমতার অবস্থান ও পরিবর্তন নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এ বিষয়ে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ও তার তাৎপর্য নিয়ে প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অতিরিক্ত শুল্কের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের করণীয় নিয়ে প্রবন্ধে বেশ কিছু সুপারিশ রাখা হয়েছে।

১. পাল্টা-পাল্টি শুল্ক-প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট

এই অনুচ্ছেদে যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত পাল্টাপাল্টি শুল্কের প্রেক্ষাপট ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদর্শিত যুক্তি, এবং এসব যুক্তির ন্যায্যতা ও যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

* সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)।

এ সংখ্যার সম্পাদক নজরুল ইসলাম প্রবন্ধের প্রাথমিক খসড়ার ওপর তাঁর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন। লেখক তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

১.১ পাল্টাপাল্টি শুল্কের ঘোষণা

স্মর্তব্য যে, ২ এপ্রিল ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে (প্রকৃত অর্থে অপপ্রয়োগের মাধ্যমে) বিভিন্ন দেশের ওপর 'পারস্পরিক শুল্ক' (*রেসিপরোকাল ট্যারিফ*, সংক্ষেপে *আরটি*) আরোপের ঘোষণা দেন। এর ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-বিনিয়োগ-অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে শুধু এমন সব দেশের জন্য নয়, বরং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের জন্যও তা গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আরোপিত 'পাল্টাপাল্টি শুল্ক' এই শব্দযুগলের সাথে পাল্টাপাল্টিতার সংযোগ খুবই ক্ষীণ। বিপরীতে এ শুল্ককে 'একপাক্ষিক' বলাই যুক্তিযুক্ত হবে। ট্রাম্পের এই ঘোষণা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যবস্থাপনা ও চলমান বৈশ্বিক বাণিজ্যকে এক গভীর অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাংলাদেশের জন্য এই অতিরিক্ত শুল্কারোপের তাৎপর্য অস্বীকার করার কোন উপায় নাই, বিশেষত তা এই কারণে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একটি প্রধান বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগী দেশ। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একক সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি গন্তব্যস্থল, এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগেরও অন্যতম উৎস। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চরিত্র বহুমাত্রিক এবং এ কারণে ট্রাম্প প্রশাসন আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক এবং তার বহুমাত্রিক অভিঘাতসমূহকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্ক একটি অস্ত্র হিসাবে ব্যাবহার করা হচ্ছে যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) আওতাধীন তিন দশক ব্যাপী নিয়ম-ভিত্তিক (রুলস-বেইসড) বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে গুরুতর হুমকির মুখে ফেলেছে। অতিরিক্ত শুল্কের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় একটি 'নতুন বন্দোবস্ত' (নিউ নরমাল) প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, যেখানে দ্বিপাক্ষিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে বহুপাক্ষিকতাকে দূর্বল করার একটি সচেতন প্রয়াস ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। যদিও পরবর্তীতে চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, প্রতিপক্ষ যদি শক্তিশালী হয় তবে মার্কিন প্রশাসন তার সাথে নমনীয়তা প্রদর্শনে এবং পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য শর্তে সমাধানে আসতে প্রস্তুত। বিপরীতে, বাংলাদেশের মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনীতির দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের মত শক্তিশালী দেশের আলোচনা

অনেকটাই এক তরফা হবে এটাই প্রত্যাশিত, যা পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, ট্রাম্পের 'পাল্টা-পাল্টি শুল্ক' কেবল শুল্ক সম্পর্কিত নয়, এর সাথে ট্রাম্প প্রশাসন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক কৌশলও নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক বিষয়ের বাইরে বিভিন্ন অ-শুল্ক ইস্যুও নিয়ে এসেছে যেগুলি বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ, শুল্ক নীতি ও কাঠামো এবং ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে অনেক ক্ষেত্রে সংঘাতময়ভাবে জড়িত। এ দিক থেকে ট্রাম্প শুল্ক বিশ্ব অর্থনীতিতে শক্তির ভারসাম্য ও সমীকরণে পরিবর্তন আনার একটি চেষ্টা হিসাবেও দেখা যেতে পারে, যেখানে চীনের উত্থানকে সীমিত ও বাধাগ্রস্থ করার একটি সুস্পষ্ট প্রয়াস দৃশ্যমান। প্রতোত্তরে, চীনও যে পাল্টা উদ্যোগ গ্রহণ করবে সেটাও প্রত্যাশিত ছিল। এই দুই অর্থনৈতিক পরাশক্তির টানাপোড়নের কারণে বাংলাদেশের মত দেশের জন্য একটি কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরণের পরস্পর বিরোধী ও পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপ বিশ্ব অর্থনীতিকে একটা বিপজ্জনক প্রতিযোগিতা ও নেতিবাচক প্রবণতার দিকে ঠেলে দিতে পারে, যা বাংলাদেশের মত দূর্বল অর্থনীতির দেশের জন্য কেবলমাত্র ক্ষতিরই কারণ হবে না, একই সাথে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করবে।

২রা এপ্রিলের ঘোষণায় বাংলাদেশের ওপরে ৩৭ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল যা ৯ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। পরবর্তীতে, যুক্তরাষ্ট্র ঐ তারিখ থেকে সব দেশের জন্যই অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করে, এবং বিভিন্ন দেশকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়। অন্তবর্তীকালীন এ সময়ে সব দেশের ওপর ১০% হারে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপিত থাকবে বলে বলা হয়। এর পরবর্তীতে ১ আগষ্ট থেকে বিভিন্ন দেশের ওপর বিভিন্ন হারে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়া হয় এবং এসব দেশকে আলোচনায় বসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আল্টিমেটাম দেয়া হয়। বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক হার তখন নির্ধারিত হয় ৩৫%। আরোপিত এ অতিরিক্ত শুল্ক পরবর্তীতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মাধ্যমে ২০% এ নামিয়ে আনা হয় যা বর্তমানে (৯ আগষ্ট, ২০২৫ থেকে)

বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । অবশ্য এর বিপরীতে বাংলাদেশকে বিভিন্ন শর্তে স্বীকৃত হতে হয়েছে, যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

১.২ পাল্টাপাল্টি শুল্কের ইতবৃত্ত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ২ এপ্রিল ২০২৫ যে নির্বাহী আদেশ জারি করেন তাতে 'বৃহৎ আকারের ও স্থায়ী মার্কিন পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি'কে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার মূল কারণে হিসাবে দেখান হয়। । ১৯৭৭ সালের এই আইনটি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়, যেমন প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলে যে কোন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানীকৃত পণ্যের ওপর আরোপিত আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারবে। আদেশে বলা হয়, 'আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কসমূহে পারস্পরিকতার অভাবের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির ওপর বৈষম্যমূলক শুল্ক হার ও বিভিন্ন অ-শুল্ক বাধা আরোপ করা হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে এসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, মার্কিন বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ মজুরি ও ভোগের ওপর এসবের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে'। আদেশে সতর্ক বার্তা দেয়া হয় যে, অতিরিক্ত শুল্কের উত্তরে কোনো বাণিজ্য সহযোগী দেশ যদি যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির উপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে বা অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে এই পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়, তা'হলে যুক্তরাষ্ট্র সে দেশের উপর আরোপিত শুল্কহার আরো বৃদ্ধি করতে পারবে ও এর ব্যাপ্তি আরো বিস্তৃত করতে পারবে, এবং পণ্যের তালিকা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে হারমোনাইজড শুল্ক তফসিলে (এইচটিএস)-এ সংশ্লিষ্ট দেশের জন্য প্রযোজ্য অতিরিক্ত শুল্ক হার আরো বাড়ানোর জন্য অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারবে। এটিও উল্লেখ করা হয় যে, 'এ অধ্যাদেশের কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে না'।

প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক আরোপের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'আমদানি-গুরুত্বভরযুক্ত' (ইমপোর্ট- ওয়েটেড) গড় শুল্কহার, যা আগে ২.০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল, তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ২৪.০ শতাংশে। এটা ছিল গত একশত বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রকৃতপক্ষে এ হার ১৯৩০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্মুট-হওলি এক্ট-এর মাধ্যমে আরোপিত সংরক্ষণমূলক (প্রটেকশানিস্ট) শুল্ক হারের চেয়েও বেশি। স্থগিতাদেশকালে (যখন সব দেশের জন্য ১০% অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ

করা হয়) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি-গুরুত্বভরযুক্ত গড় শুল্কহার দাঁড়ায় প্রায় ১২.০ শতাংশ । বর্তমানে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে শুল্ক হার যা দাঁড়িয়েছে তাতে গড় শুল্ক হার কিছুটা হ্রাস পেলেও তা আগের তুলনায় অনেক বেশি। বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীতে বৈশ্বিক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদারীকরণের যে ধারাবাহিকতা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছিল, ট্রাম্প প্রশাসনের এ ধরণের পদক্ষেপের কারণে তা ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে, এবং ফলশ্রুতিতে প্রচলিত বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা গভীর সংকটের মুখে পড়েছে।

১.৩ পারস্পরিক শুল্কের হিসাব পদ্ধতি

পারস্পরিক শুল্কের নির্ধারণ পদ্ধতি থেকেই বোঝা যায় যে, মার্কিন পণ্যের ওপর বিভিন্ন দেশের আরোপিত আমদানি শুল্কই যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র উদ্বেগের কারণ ও বিবেচ্য বিষয় ছিল না। প্রেসিডেন্সিয়াল আদেশে এ যুক্তি দেখানো হয় যে, উচ্চ আমদানি শুল্কের পাশাপাশি দেশ ভেদে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরণের অ-শুল্ক বাধাও (নন-ট্যারিফ মেজারস) এ প্রেক্ষিতে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেসব কারণ উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে আছে পরিবেশ ও শ্রমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মমান্যতার অভাব, মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারের কারসাজি (কারেন্সি ম্যানিপুলেশান), মার্কিন বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা, মেধাস্বত্ব আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে শৈথিল্য, ইত্যাদি। বলা হয়, এসবের সম্মিলিত প্রভাবে মার্কিন পণ্যের প্রতিযোগিতাসক্ষমতা দুর্বল হয়, এবং ফলশ্রুতিতে দেশটির রপ্তানি আয় হ্রাস পায় এবং আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বলা হয় যে, এসব কারণে বিভিন্ন দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ঘাটতির সম্মুক্ষীন হতে হয়।

যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যায় যে, এসব যুক্তির যথার্থতা আছে, তাহলেও এটা স্বীকার করতে হবে যে, এক এক দেশের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ এক এক রকম হবারই কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, পারস্পরিক শুল্ক পরিমাপের পদ্ধতি ও সূত্রের প্রয়োগ ছিল সকল দেশের জন্যই এক ও অভিন্ন!

পারস্পরিক শুল্কের হার পরিমাপ করতে নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করা হয়েছিল :

$$\text{পাল্টাপাল্টি শুল্ক হার} = \left[\frac{\text{মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি}}{\text{মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি}} \times ১০০\right] \left(\frac{১}{২}\right)।$$

এ সূত্র ব্যবহার করে বাংলাদেশের উপর আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক নির্ধারণ করা হয় ৩৭% (যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ থেকে আমদানি ৮.৬ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি ২.২ বিলিয়ন ডলার, এবং ফলশ্রুতিতে ঘাটতি ৬.৪ বিলিয়ন ডলার)। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও এই একই ফর্মূলা ব্যবহার করে অতিরিক্ত শুল্ক হার নির্ধারণ করা হয় (যেমন, ভিয়েতনাম: ৪৬%; কেম্বোডিয়া: ৪৯%; ভারত: ২৬%; এবং চীন: ১৪৫%)। চীনের ওপর অবশ্য এই সূত্রভিত্তিক হারের চেয়েও বেশি পরিমাণে অতিরিক্ত শুল্ক হার নির্ধারণ হয় 'বিশেষ পরিস্থিতির' কারণে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্যে বাস্তবিক অর্থেই ঘাটতি আছে (২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১,২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার), একই সময়ে সেবা খাতের বৈশ্বিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্বৃত্ত ছিল (যুক্তরাষ্ট্রের সেবা খাতের বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত ২০০০ সালে ছিল ৭৭.০ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৯৫.০ বিলিয়ন ডলারে)। যদি বিশ্ববাণিজ্য কার্যক্রম পণ্য ও সেবা উভয় খাত ঘিরেই পরিচালিত হয়, তবে পারস্পরিক শুল্কের মত পদক্ষেপ কেবল পণ্যখাতের বাণিজ্যকে বিবেচনা করবে কিন্তু সেবা খাতের বাণিজ্যকে নয়, এটি ধারণাগতভাবে ভ্রান্ত হবার কথা। আর, যদি সেবাখাতের উদ্বৃত্ত/ঘাটতি বিবেচনায় নেয়া হয়, তাহলে অন্য অনেক দেশ মার্কিন সেবা পণ্যের আমদানির ওপর একই ধরণের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করলে তাকে কোন ভাবেই অযৌক্তিক বলা যাবে না। কিন্তু বাস্তবতা হল অন্যান্য দেশের সেই শক্তিমত্তা নেই যা যুক্তরাষ্ট্রের আছে।

যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যা বহুলাংশে তুলনামূলক সুবিধা'র তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার সাথে অনেকাংশেই সাংঘর্ষিক। অনেক অর্থনীতিবিদদের মতে, এ ধরণের শুল্ক শুধু সংশ্লিষ্ট

দেশের জন্য নয় বরং বিশ্ব বাণিজ্য, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং ফলশ্রুতিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি দুষ্টচক্রের সৃষ্টি হতে পারে। ১৯৩০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত উচ্চ প্রতিরক্ষণমূলক শুল্ক আরোপ এবং তার অভিঘাতের ইতিহাস থেকে এ আশংকার যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়। অনেক অর্থনীতিবিদই স্মুট-হাওলি এ্যক্ট-পরবর্তী উচ্চ শুল্ক হারকে ১৯৩০-এর দশকের বিশ্ব মহামন্দার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে মনে করে থাকেন। এবারের আরোপিত পাল্টাপাল্টি উচ্চ শুল্ক হারের নেতিবাচক প্রভাব আরো গভীর হতে পারে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করছেন। ১৯৩০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক বাণিজ্যের (রপ্তানি ও আমদানির যোগফলের) অংশ দেশটির জিডিপি'তে ছিল মাত্র ৫.০ শতাংশ; ২০২৪ সালে এ অংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ শতাংশ। বর্তমানে চীনের ক্ষেত্রে তা ৩৮ শতাংশ। বৈশ্বিক বাণিজ্যে বর্তমানে (২০২৪ সালে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১০.৪ শতাংশ) এবং চীন (১৭.৫ শতাংশ)-এর সম্মিলিত অবদান প্রায় ২৭.৯ শতাংশ। এই পরিসংখ্যানগুলি থেকে বোঝা যায়, বিশ্ববাণিজ্যে এ ধরণের উচ্চ শুল্কের নেতিবাচক প্রভাব এবং পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপ বিশ্ববাণিজ্য প্রসারের কারণে ১৯৩০-এর দশকের তুলনায় আরো অনেক গভীর ও বিস্তৃত হবার আশঙ্কা একেবারেই অমূলক নয়।

অর্থনীতির ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, এ ধরণের বাণিজ্য যুদ্ধে কোন বিজয়ী দেশ নেই। কিছু দেশ কিছু ক্ষেত্রে হয়তো কিছু সময়ের জন্য জিততে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধে সব দেশেরই ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা বেশি। পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপ ঘোষণার পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী স্টক মার্কেটের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ এ ক্ষেত্রে প্রাসংগিক। এ ঘোষণার পর প্রথম কয়েক দিনের ট্রেডিং-এ মার্কিন স্টক মার্কেট প্রায় ৬.০ ট্রিলিয়ন ডলারের ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বন্ড মার্কেটও উল্লেখযোগ্য অস্থিরতার মধ্যে পড়ে। গোল্ডম্যান স্যাক্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৫ সালের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রান্তিকের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে ০.৫ শতাংশে নামিয়ে আনে, এবং পরের এক বছরের মধ্যে মন্দার ৪৫ শতাংশ সম্ভাবনা আছে বলে প্রাক্কলন করে।

উচ্চ শুল্ক কতটা ভোক্তা, উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারক, ব্র্যান্ড বাইয়ার ও ক্রেতাদের ওপর বর্তাবে তা অবশ্য এখনও অনিশ্চিত। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি এবং আমদানিজাত পণ্যের চাহিদার ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের পরিবর্তন হতে

পারে তা অনেকাংশেই নির্ভর করবে শুল্কের মূল্য স্থিতিস্থাপকতা এবং মার্কিন বাজারে নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতার উপর। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানির প্রায় ৯০ শতাংশই তৈরী পোষাক ও টেক্সটাইলজাত পণ্য, সেহেতু এ নির্দিষ্ট খাতের ওপর অতিরিক্ত শুল্কের অভিঘাত কিভাবে বন্টিত হবে তা বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অতিরিক্ত আমদানি শুল্কের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি-প্রতিস্থাপক শিল্পখাতসমূহে বিনিয়োগ কতটা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে তা অবশ্য দেখার বিষয়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ বিষয়টিকেও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের অন্যতম কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন। অনেক অর্থনীতিবিদই এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তৈরী পোশাকের মত শ্রম-নিবিড় খাতের পণ্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী প্রতিস্থাপক শিল্পের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে বলে কোন অর্থনীতিবিদই মনে করেন না । তাই এটাই স্বাভাবিক যে, যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী পোশাক খাতের চাহিদার প্রায় ৯৭.০ শতাংশই আমদানির মাধ্যমে পূরণ হয়ে থাকে। বরং অতিরিক্ত শুল্কের কারণে কাঁচামাল ও অন্তবর্তী পণ্যের (ইন্টারমিডিয়েট গুডস) মূল্য বৃদ্ধি পাবে, এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পের উৎপাদন-ব্যয় বাড়বে বলেই অনেকে মনে করেন। এ সবকিছু যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতিকে উস্কে দিবে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ আশংকা করছেন।

২. বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য কাঠামো ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের প্রবণতাসমূহ

যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নকে যদি একটি একক সত্ত্বা হিসাবে বিবেচনা না করা হয়, তাহলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের বৈশ্বিক রপ্তানির ১৯ শতাংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান ছিল সর্বপ্রথম।

চিত্র ১: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানির চিত্র

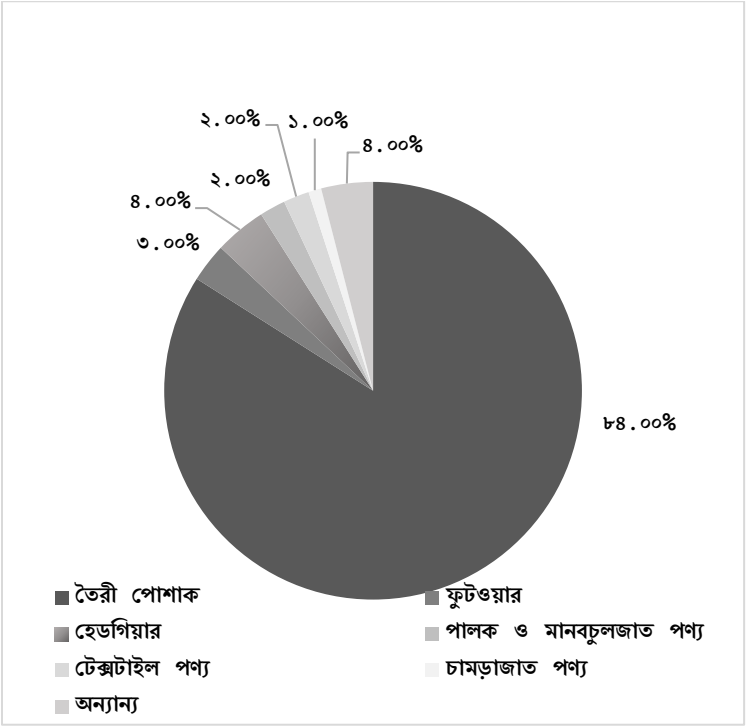

সূত্র: ইপিবি এবং ইউ.এস.আই.টি.সি-এর তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রণীত

চিত্র ১ দেখায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানির প্রায় ৯০ শতাংশই প্রধানত তৈরী পোশাক (৮৪ শতাংশ), এবং অন্যান্য টেক্সটাইল আইটেম (৬%)। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানির ভিত্তি তুলনামূলকভাবে বৈচিত্রপূর্ণ: লোহা ও ইস্পাত (৩০ শতাংশ), বীজ ও শস্য (১৬ শতাংশ), তুলা (১১ শতাংশ) ও অন্যান্য (৪৩%)।

চিত্র ২: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে মূল প্রবণতাসমূহ

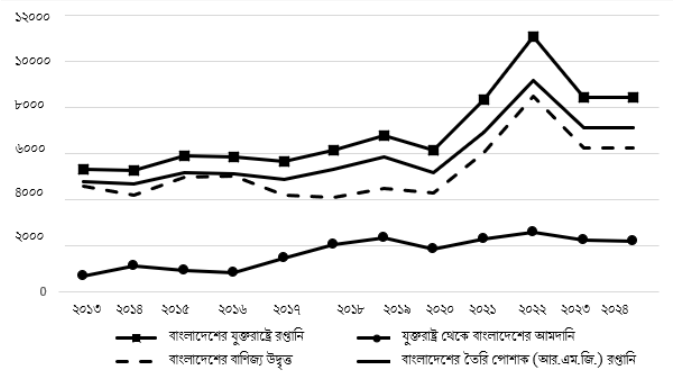

সূত্র: ইউএসআইটিসি.

চিত্র ২ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের প্রধান প্রবণতাসমূহ তুলে ধরে। দেখা যায় যে, গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি ২০১৩ সালের প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২২ সালে ১০ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পায়; ২০২৪ সালে তা কিছুটা কমে ৮.৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানি ২০১৩ সালের ০.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ সালে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ২০১৩ সালের ৪.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২৪ সালে ৬.০ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ২ থেকে লক্ষণীয় যে, ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন প্রথমবার চীন থেকে আমদানির উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে তারপর যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক রপ্তানি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এ রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে, যদিও পরবর্তীতে বাইডেন প্রশাসন চীনের ওপর ট্রাম্প আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক অব্যাহত রেখেছিল। চীন যেহেতু মার্কিন বাজারে তৈরী পোশাকের একক বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ, এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যও তৈরী পোশাক, তাই উপরিদৃষ্ট রপ্তানি প্রবণতা এটাই নির্দেশ করে যে, শুল্কের পার্থক্যই প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একমাত্র নির্ধারক নয়। বর্তমানে

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীন বা ভারতের ওপর তুলনামূলকভাবে বেশি হারে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপে বাংলাদেশের যারা কিছুটা স্বস্তি বোধ করছেন, তাদের জন্য এ তথ্যটি প্রণিধানযোগ্য।

সারণি ২.১: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানির ওপর আরোপিত শুল্ক কাঠামো (২০২৪)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে	আইটেমের সংখ্যা আমদানি মূল্য	আমদানি (মিলিয়ন ডলার) অথবা শতাংশ
মোট আমদানিকৃত পণ্য	২৫১৫	২,৯১২.৭
শুল্ক-যুক্ত পণ্য	২২১৮	২,১৫৫.৪
শুল্ক-মুক্ত পণ্য	২৯৭	৭৫৭.৩
সকল পণ্যের মধ্যে শুল্ক-যুক্ত পণ্যের অংশ	৮৮.২%	৭৪.০%
সকল পণ্যের মধ্যে শুল্ক-মুক্ত পণ্যের অংশ	১১.৮%	২৬.০%
মোট আরোপিত শুল্ক (মিলিয়ন ডলার)		১৮০.৫
যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর গুরুত্বভরযুক্ত শুল্কহার	৬.২%	-
আমদানি রিবেট সামঞ্জস্যের পর গুরুত্বভরযুক্ত শুল্কহার	২.২%	২,৯১২.৭

সূত্র: এনবিআর প্রদত্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত

সারণি ২.১ দেখায় যে, সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর বাংলাদেশের আমদানি গুরুত্ব-ভরযুক্ত শুল্কহার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ২০২৪ সালে এই হার ছিল ৬.২ শতাংশ। ফেরতযুক্ত আগাম শুল্ক যদি বাদ দেয়া হয় তাহলে এ হার ২.২ শতাংশে নেমে আসে। ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানিতে সংগৃহীত শুল্কের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ১৮০.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যদি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত শীর্ষ তিনটি পণ্যের (যেগুলির ওপর শুল্ক আছে) ওপর শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনা হয়, তাহলে বাংলাদেশের শুল্ক ক্ষতি হবে প্রায় ৬১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যদি এমএফএন ভিত্তিতে অনুরূপ শুল্ক মুক্ত

সুবিধা অন্য সব দেশকে দেওয়া হয়, তাহলেও এই তিনটি পণ্য আমদানীতে বাংলাদেশের মোট শুল্ক ক্ষতি হবে ১৬৮.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (আমদানির পরিমাণ ও বর্তমান শুল্ক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকা সাপেক্ষে)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে শূন্য-শুল্ক বাজার সুবিধা দেয়ার যে কোনো সিদ্ধান্ত তাই সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতির কথা বিবেচনায় রেখে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে।

সারণি ২.২: বাংলাদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত আমদানি শুল্ক কাঠামো (২০২৪)

সূচক	পণ্যের সংখ্যা	মূল্যমান (মিলিয়ন ডলার)
মোট আমদানিকৃত পণ্য	১২০৮	৮,৪৫১.৮
শুল্কযুক্ত আমদানিকৃত পণ্য	৯২৭	৮,০৫০.২
শুল্কমুক্ত আমদানিকৃত পণ্য	২৮১	৪০১.৬
মোট পণ্যে শুল্কযুক্ত পণ্যের অংশ	৭৬.৭%	৯৫.৩%
মোটের মধ্যে শুল্কমুক্ত পণ্যের অংশ	২৩.৩%	৪.৮%

সূত্র: লেখক কর্তৃক ইউএসআইটিসি ডাটাবেসের তথ্যের ভিত্তিতে হিসাবকৃত

সারণি ২.২ দেখায় যে, বাংলাদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেসব পণ্য-আমদানি করে থাকে তার প্রায় এক-চতুর্থাংশের ওপর কোন শুল্ক আরোপ করা হয় না (শুল্কমুক্ত)। এসব পণ্যের আমদানি মূল্য অবশ্য বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমদানির মাত্র ৪.৮ শতাংশ। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বৈচিত্রকরণের অভাবই এ পরিসংখ্যান থেকে ফুটে উঠে। তৈরী পোশাকের বিভিন্ন পণ্যের ওপর অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি শুল্কহার তুলনামূলকভাবে (অন্যান্য পণ্যের সাপেক্ষে) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের গড় আমদানি শুল্ক তাই কম হলেও মূলতঃ তৈরী পোশাক রপ্তানিকারই বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি শুল্ক হার তাই কার্যত অনেক বেশী। বাংলাদেশের জন্য অবশ্য এটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

সারণি ২.৩: বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি (২০২৪)

পণ্য	আমদানির পরিমাণ (মিলিয়ন ডলার)	শুল্কের পরিমাণ (মিলিয়ন ডলার)	আমদানি-গুরুত্বভরযুক্ত শুল্কের হার
তৈরী পোশাক পণ্যের আমদানি	৭,১২৮.৭১	১,১৯৬.০৯	১৬.৮%
তৈরী পোশাক পণ্য-বহির্ভূত আমদানি	১,৩২৩.১০	৭৭.১০	৫.৮%
মোট আমদানি	৮,৪৫১.৮০	১,২৭৩.১৯	১৫.১%

সূত্র: লেখক কর্তৃক ইউএসআইটিসি'র তথ্যের ভিত্তিতে হিসাবকৃত

সারণি ২.৩ থেকে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আরোপিত আমদানি-গুরুত্বভরযুক্ত গড় শুল্কের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত আমদানি-গুরুত্বভরযুক্ত গড় শুল্ক হার অনেক বেশি। এর প্রধানতম কারণ হল যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক গড় আমদানি শুল্ক যদিও বেশ কম, ২-৩ শতাংশের মত, বিপরীতে তৈরী পোশাক পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত আমদানি শুল্ক হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি, ১০-৩০ শতাংশের মত। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকৃত সকল পণ্যের ওপর আমদানি-গুরুত্বভরযুক্ত গড় শুল্ক হার ছিল ১৫.১ শতাংশ (২০২৪)। তৈরী পোশাকের ওপর যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি-গুরুত্বভরযুক্ত গড় শুল্ক হার ছিল ১৬.৮ শতাংশ (২০২৪)। বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মোট আদায়কৃত আমদানি শুল্কের পরিমাণ ২০২৪ সালে ছিল প্রায় ১,২৭৩.০ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত তৈরী পোশাক থেকে যুক্তরাষ্ট্র ২০২৪ সালে মোট শুল্ক আদায় করেছে ১,১৯৬.০ মিলিয়ন ডলার।

সারণি ২.৪ বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: তুলনামূলক আমদানি-গুরুত্বভরযুক্ত শুল্ক হার (২০২৪)

দেশ	আমদানি গুরুত্বভরযুক্ত গড় শুল্কহার	অংশীদার দেশ থেকে আমদানিতে মোট আদায়কৃত আমদানি শুল্ক	অংশীদার দেশ থেকে শুল্কমুক্ত আমদানি
বাংলাদেশ	৬.২% (২.২%)	১৮০.০ মিলিয়ন ডলার (৬৪.০ মিলিয়ন ডলার)	আমদানি মূল্যের ২৬.০% (৫০.০%)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৫.১%	১,২৭৩.০ মিলিয়ন ডলার	আমদানি মূল্যের ৪.৮%

সূত্র: এন.বি.আর. ও ইউ.এস.টি.আর. (২০২৪) ডাটাবেস থেকে হিসাবকৃত

সারণি ২.৪ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান আমদানির গুরুত্ব-ভরযুক্ত শুল্কহার এবং এ দুই দেশের পরস্পরের আমদানির ওপর আরোপিত ও আদায়কৃত আমদানি শুল্ক সম্পর্কিত আপেক্ষিক চিত্র তুলে ধরে। সারণি - ৪ থেকে দেখা যায়, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস প্রান্তে বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আদায়কৃত মোট আমদানি শুল্কের পরিমাণ বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় ছয় গুণ বেশি ছিল; আর যদি বাংলাদেশের আমদানিকারকদের ফেরতযোগ্য শুল্ক (শুল্ক রিবেট) বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাহলে এই পরিমাণ ছিল প্রায় ১৭ গুণ বেশি। যদি গড় আমদানি-গুরুত্বভরযুক্ত শুল্কের তুলনা করা হয়, তাহলে মার্কিন গড় শুল্ক হার বাংলাদেশের তুলনায় ৩ গুণ বেশি ছিল (শুল্ক রিবেট বিবেচনা সাপেক্ষে তা ছিল ৬.৯ গুণ)। যে প্রশ্নটি এখানে করা যায় তা হল প্রকৃত বিচারে কে কাকে বাজার সুবিধা দিচ্ছে! কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে দায়ী করা হচ্ছে এই বলে যে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত পণ্যের ওপর অন্যায্যভাবে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করছে। অতিরিক্ত ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে (যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির পরিমাণ একই থাকা সাপেক্ষে) প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের সব পণ্যের ওপর শুল্ক আদায়ের পরিমাণ বর্তমানের ১২৭৩ মিলিয়ন ডলারের পরিবর্তে দাঁড়াবে ২৯৬০ মিলিয়ন ডলার; তৈরী পোশাকের ক্ষেত্রে সংখ্যা দুটি হবে যথাক্রমে ১১৯৬.০ মিলিয়ন ডলার ও ২৬১৯ মিলিয়ন ডলার।

উল্লেখ্য, ইউএসটিআর'র ন্যাশনাল ট্রেড এস্টিমেট রিপোর্টে (মার্চ ২০২৫) বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বেশ কিছু উদ্বেগ ও সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে: (ক) যুক্তরাষ্ট্র থেকে

আমদানিকৃত অনেক পণ্যের ওপর বাংলাদেশে উচ্চ শুল্কহার; (খ) শুল্কভিন্ন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা; এবং (গ) বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে মান্যতার অভাব। এ প্রতিবেদনে দুর্নীতি, সরকারী ক্রয়ে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকা, বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, শ্রম আইন, পরিবেশ সুরক্ষা, ইত্যাদি মান্যতার ক্ষেত্রে দুর্বলতা, মেধাস্বত্ত্ব আইনের প্রয়োগে শৈথিল্য, মার্কিন কোম্পানির লভ্যাংশ বিদেশে প্রেরণে বিভিন্ন বাধার কথাও বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের এসব উদ্বেগ বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩. অতিরিক্ত শুল্কের সম্ভাব্য অভিঘাত

বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের ওপর শেষ পর্যন্ত কতটা অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ হয়েছে, এবং এর ফলশ্রুতিতে এ বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা। অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রেক্ষাপটে ব্র্যান্ড ও মধ্যবর্তী ক্রেতারা বাংলাদেশের উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদের কাছে মূল্য হ্রাস দাবী করছে; অনেক ক্রেতা অর্ডার প্লেসম্যান্টের ক্ষেত্রে বিলম্ব করছে; এবং এ খাতের বিনিয়োগকারীরা অপেক্ষা করার ও ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করছে। সার্বিকভাবে বর্তমানে একটি অনিশ্চয়তার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। তবে পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের সাথে ইউএসটিআর'র দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত অতিরিক্ত শুল্কহার বিভিন্ন মাত্রায় পুণর্নির্ধারিত হয়েছে, এবং এ ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বর্তমানে কিছুটা কেটেছে। বিভিন্ন দেশের জন্য নির্ধারিত এ অতিরিক্ত শুল্ক হার অবশ্য বিভিন্ন: বাংলাদেশ (২০%), ভিয়েতনাম (২০%), কেম্বোডিয়া (১৯%), ভারত (৫০%), চীন (সাধারণভাবে ৫৭% থেকে কমিয়ে ৪৭%, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সর্বশেষ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মূল প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশের প্রতিযোগীতামূলক অবস্থানের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ভিয়েতনাম, কেম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের শুল্ক প্রায় একই পর্যায়ে আছে, অন্যদিকে চীন ও ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থানে আছে।

স্মর্তব্য যে, অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশকে এমন এক সময়ে মোকাবেলা করতে হচ্ছে যখন বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকরা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ম্যান-মেড ফাইবার (এমএমএফ) ভিত্তিক পোশাকের ক্ষেত্রে তাদের অংশ সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। এ ছাড়া, এটি এমন এক সময়ে ঘটছে যখন সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মান্যতা (পরিবেশ, শ্রম, কার্বন নিঃসরণ স্ট্যান্ডার্ডসমূহ ইত্যাদি) নিশ্চিতকরণের জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে; আসন্ন এলডিসি থেকে উত্তরণ সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হতে হচ্ছে; এবং এলডিসি থেকে উত্তরণকে মসৃণ ও টেকসই করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হচ্ছে ।

ব্র্যান্ড ও ক্রেতা, উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারীদের মধ্যে অতিরিক্ত শুল্ক কিভাবে বন্টিত হবে তা এখনও অনিশ্চিত। এফওবি মূল্যের উপর এমনকি ৫.০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্কও বাংলাদেশের পোশাক শিল্পোদ্যোক্তাদের অনেকেরই জন্য বহন করা কঠিন হবে বলে মনে হয়। এবং পাল্টা শুল্ক এমন এক সময়ে মোকাবেলা করতে হচ্ছে যখন অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ আছে; গ্যাস, জ্বালানি ও বিদ্যুৎসহ অনেক কিছুর মূল্য বাড়তির দিকে; এবং জ্বালানীর ক্ষেত্রে প্রাপ্যতার সীমাবদ্ধতাও আছে। ব্যাংক ঋণের সুদের হারও বর্তমানে বেশ চড়া। বিশেষত, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য পরিবেশ এখন বাস্তবিক অর্থেই বেশ প্রতিকূল।

রায়হান ও সেন (২০২৫) জিটিএপি মডেল ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর পারস্পরিক শুল্কের সম্ভাব্য অভিঘাত পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। লেখকদের গবেষণায় দুটি চিত্রকল্প উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমটি, ১০ শতাংশ হারে অতিরিক্ত শুল্ক প্রয়োগের প্রভাব (৯০-দিনের বিরতি সাপেক্ষে) এবং দ্বিতীয়টি, ২০২৫ সালের ২ এপ্রিল প্রাথমিকভাবে ঘোষিত পারস্পরিক শুল্কহার প্রয়োগের প্রভাব। উভয় ক্ষেত্রেই চীনের (এবং কানাডা ও মেক্সিকোর) উপর উচ্চতর হারে শুল্ক আরোপকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যকল্পে, চীনের রপ্তানি (বৈশ্বিক) যথাক্রমে ১০.৮ শতাংশ এবং ১০.৯ শতাংশ হ্রাস পায়; যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ক্ষেত্রে তা হ্রাস পায় যথাক্রমে ১১.৭ শতাংশ এবং ১৪.৯ শতাংশ। প্রথম দৃশ্যকল্পে বাংলাদেশ (এবং ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং পাকিস্তান) লাভবান হতে পারে বলে দেখা যায়। শুল্ক পার্থক্যের

কারণে চীন ও ভারত থেকে রপ্তানির বাজার এসব দেশের স্থানান্তর (ট্রেড ডাইভারসান)-জনিত কারণে এটা হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যকল্পে প্রায় সব দেশের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ০.৩ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

প্রকৃত ফলাফল অবশ্য নির্ভর করবে পারস্পরিক শুল্ক নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের ওপর বর্তমানে পুনঃনির্ধারিত অতিরিক্ত শুল্কহারের সম্ভাব্য অভিঘাতের ওপর। কিন্তু এসব হিসাব থেকে এই ধারণাই পাওয়া যায় যে এ ধরণের অতিমাত্রার আমদানি শুল্ক হার সব দেশের জন্যই নেতিবাচক।

সারণি ৩.১: প্রধান প্রতিযোগীদেশসমূহের নিরীখে বাংলাদেশের অতিরিক্ত শুল্কের আপেক্ষিক চিত্র

দেশ	প্রাথমিক পারস্পরিক শুল্ক	মূল মূল প্রতিযোগীদের তুলনায় বাংলাদেশের শুল্ক পার্থক্য	স্থগিতকালিন শুল্ক	দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে সর্বশেষ আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক	প্রতিযোগীদের তুলনায় বাংলাদেশের চূড়ান্ত শুল্কহারের পার্থক্য
বাংলাদেশ	৩৭%	-	১০%	২০%	-
ভিয়েতনাম	৪৬%	+৯%	১০%	২০%	০%
কম্বোডিয়া	৪৯%	+১২%	১০%	১৯%	-১%
চীন	৫৪%	+১৭%	১৪৫%	৩০%	+১০%
পাকিস্তান	২৯%	-৮%	১০%	১৯%	-১%
শ্রীলঙ্কা	৪৪%	+৭%	১০%	২০%	০%
ভারত	২৬%	-১১%	১০%	৫০%	+৩০%
হন্ডুরাস	১০%	-২৭%	১০%	১০%	-১০%
ইন্দোনেশিয়া	৩২%	-৫%	১০%	১৯%	-১%

সূত্র: লেখক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত অতিরিক্ত শুল্কের তথ্য থেকে সংগৃহীত।
টীকা: বন্ধনীতে ফেরতযোগ্য এডভান্স-ভ্যাট ও এডভান্স ইনকাম ট্যাক্স বিয়োগের পর আমদানী-গুরুত্বভরযুক্ত গড় শুল্ক হার ও মোট আমদানির অংশ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩.১ প্রাথমিক ও সর্বশেষ আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সাথে মূল মূল প্রতিযোগী দেশের জন্য প্রযোজ্য শুল্ক হারের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। যদিও শুল্ক পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তা কেটেছে,

কিন্তু তা এখনও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয় নি। ভারত ও চীনের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কের কারণে বাংলাদেশের কিছুটা সুবিধা হলেও উচ্চ শুল্ক হার যুক্তরাষ্ট্র ও বৈশ্বিক চাহিদার ওপর নেতিবাচক প্রভাব রাখবে তা অস্বীকার করা যাবে না।

রাজ্জাক ও সহ-লেখকরা চূড়ান্ত নির্ধারিত শুল্ক হারকে বিবেচনায় নিয়ে যে সিমুলেশন করেছেন তা থেকে দেখা যায় যে, অতিরিক্ত শুল্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী পোশাকের মোট আমদানি ১২% হ্রাস পেতে পারে (১০ বিলিয়ন ডলার)। বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ১৪% হ্রাস পেতে পারে (১.২৫ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে ১.০৮ বিলিয়ন তৈরী পোশাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। এই সিমুলেশন থেকে এটাও দেখা যায় যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোশাকের আমদানি ট্রাম্প শুল্কের ফলশ্রুতিতে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা উল্লেখযোগ্য নয় (২%-এর মত)। কেম্বোডিয়া, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত আমদানি হ্রাস প্রায় একই মাত্রার, ১০-১৪%, যদিও ভারত (৫০%) ও চীন (৬০%) এর ক্ষেত্রে তা তুলনামূলকভাবে বেশি। স্মর্তব্য, এ দু'দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক শুল্ক আলোচনা চলমান রয়েছে (চীনের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক ৫৭% থেকে আপাতত ৪৭% এ নামিয়ে আনা হয়েছে)।

বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত প্রধান পণ্যের সবগুলিই তৈরী পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত ৭টি প্রধান পোশাক আইটেম যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মোট পোশাক রপ্তানির প্রায় ৬২.৩ শতাংশ (৭.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে ৪.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) যুগিয়ে থাকে। এই ৭টি পণ্যে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ চীন ও ভিয়েতনাম। আবার কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে পাকিস্তান, ভারত, হন্ডুরাস এবং মেক্সিকোও বাংলাদেশের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে থাকে। মেক্সিকো যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকো (ইউএসএমসিএ) মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের সদস্য (এবং সে কারণে শর্তসাপেক্ষে অতিরিক্ত শুল্ক থেকে অব্যাহতি পাবে), সে কারণে অতিরিক্ত শুল্কের প্রেক্ষিতে দেশটি প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সুবিধা ভোগ করবে।

সারণি ৩.২: নির্বাচিত কয়েকটি দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্কের প্রভাব

দেশ	প্রস্তাবিত অতিরিক্ত শুল্ক হার	২০২৩ সালে মোট রপ্তানির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ (শতাংশ)	শুল্ক হার বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি চাহিদার সম্ভাব্য পরিবর্তন (বিলিয়ন ডলার)	বিভিন্ন দেশের উপর বিভিন্ন মাত্রায় শুল্ক হার বৃদ্ধির কারণে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি বৃদ্ধি বা হ্রাস	যুক্তরাষ্ট্রের মোট বাণিজ্যে নিট প্রভাব (কলাম ৪ ও ৫ এর যোগফল; বিলিয়ন ডলার)	২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির পরিমাণ (বিলিয়ন ডলার)	যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হ্রাস	বৈশ্বিক রপ্তানি হ্রাস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বাংলাদেশ	৩৭%	১৫%	-৫.০৭	০.৭১	-৪.৩৬	৭.২৫	-৬০%	-১১%
	১০%	১৫%	-২.৬৬	০.২২	-২.৪৫	৭.২৫	-৩৪%	-৫%
	২০%	১৬%	-৪.৬৩	-০.০৮	-৪.৭১	৮.৬৭	-৫৪%	-৯%
ভিয়েতনাম	৪৬%	৪৮%	-৯.৫৯	১.৪৫	-৮.১৪	১৪.৪২	-৫৬%	-২৭%
	১০%	৪৮%	-৪.২০	০.৭৪	-৩.৪৬	১৪.৪২	-২৪%	-১২%
কম্বোডিয়া	৪৯%	৪৪%	-২.৩৭	০.১০	-২.২৭	৩.৪৮	-৬৫%	-৩০%
	১০%	৪৪%	-১.১৬	০.০৭	-০.৯৯	৩.৪৮	-৩২%	-১১%
ভারত	২৬%	৩২%	-৩.৮৮	১.১২	-২.৭৫	৪.৬৮	-৪৬%	-১৫%
		১০%	৩২%	-১.৭০	০.২৯	-১.৪১	৪.৬৮	-২১%
চীন	১৪৫%	১২%	-২৫.৫২	-১৫.১৩	-৪০.৬৫	১৭.৮০	-৯৯%	-১২%
		৩০%	১২%	-৮.৫৫	-৩.১০	-১১.৬৪	১৭.৮০	-৬৫%

সূত্র: লেখক কর্তৃক টিনা মডেলের ফলাফল এবং ইউএন কমট্রেড- এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত

সারণি ৩.২ দেখায় ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্কের কারণে বাংলাদেশ ও তার মূল প্রতিযোগী কয়েকটি দেশের তৈরী পোশাক রপ্তানির ওপর কি ধরণের অভিঘাত পড়তে পারে। ইউএনএসকাপের টিনা মডেল থেকে এ ফলাফলগুলি নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দুইটি চিত্রায়ন করা হয়েছে: একটি হলো, প্রথম আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক (বিভিন্ন দেশের ওপর বিভিন্ন হারে)

এবং দ্বিতীয়টি হলো, পরবর্তীতে ৯০ দিনের জন্য আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক (১০% হারে)। এ প্রাক্কলণ থেকে দেখা যায় যে, সব রপ্তানিকারক দেশই বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ট্রাম্প যে ধরণের এবং যে মাত্রার শুল্ক আরোপ করেছেন তার নেতিবাচক অভিঘাত শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে নয়, বৈশ্বিক বাণিজ্যেও পড়বে – এ আশংকাও এ প্রাক্কলনের মাধ্যমে শক্তিশালী হয় ।

এ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রত্যাশিতভাবেই, ট্রাম্প আরোপিত শুল্কের ফলে বিভিন্ন দেশের রপ্তানির ওপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব পড়বে যদিও তার মাত্রা বিভিন্ন দেশের জন্য বিভিন্ন হবে। যেমন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৩৭% শুল্ক আরোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোশাকের আমদানি ৬০% হ্রাস পেতে পারে, আর বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের বৈশ্বিক রপ্তানি ১১% হ্রাস পেতে পারে। প্রতিযোগী অন্যান্য দেশের রপ্তানিও মাত্রাভেদে হ্রাস পাবে। সারণি ৬ দেখায় যে, বিরতিকালীন তিন মাসে (যখন ১০% অতিরিক্ত শুল্ক আরোপিত ছিল) সঙ্গত কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ববাজার উভয় ক্ষেত্রে রপ্তানি হ্রাসের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম ছিল (বাংলাদেশের জন্য যথাক্রমে ৩৪% ও ৫%)। ভিয়েতনামসহ অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের জন্যও মাত্রাভেদে এ ধরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, পরবর্তীতে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে অতিরিক্ত শুল্ক বিভিন্ন দেশের জন্য পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য ২০% হারে শুল্ক আরোপের ফলে তুলনামূলক অভিঘাতের চিত্র কি দাঁড়াবে সারণি ৬ থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি হ্রাস পেতে পারে ৫৪% আর বৈশ্বিক রপ্তানি হ্রাস পেতে পারে ৯%। পূর্বোদ্ধৃত রাজ্জাক ও সহলেখকদের প্রাক্কলনেও এ ধরণের আভাস পাওয়া যায়।

৪. বাংলাদেশের দরকষাকষির অভিজ্ঞতা

৯০ দিনের বিরতি-সময়কালের পর ২০২৫ এর আগষ্টে বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত শুল্ক যখন ৩৭% থেকে মাত্র ২% হ্রাস করে ৩৫% নির্ধারিত করা হয়, তখন অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য ব্যাপক চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপ মোকাবেলা করা সহজ ছিল না; কিন্তু নীতি-নির্ধারকরা ধৈর্য্যের সাথে এ কাজটি করেছেন।

কিন্তু বাংলাদেশের আলোচকরা যুক্তরাষ্ট্রের *নন-ডিসক্লুওজার ক্লজ* (গোপনীয়তার নীতি)-এ স্বীকৃত হয়ে তাদের আলোচনার শক্তি ও সক্ষমতা অনেকটাই দুর্বল করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। হয়ত-বা এটা না মেনে তাদের কোন উপায়ও ছিল না। কিন্তু এ শর্ত মানলেও, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে কোন ধরণেরই পরামর্শ করা যাবে না – এটা বোধ হয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন আলোচনার পদ্ধতি নয়। এ ধরণের দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অনেক তথ্য-উপাত্ত, বুদ্ধি পরামর্শের প্রয়োজন হয়। রক্ষণাত্মক কৌশল (*ডিভেন্সিভ স্ট্রাটেজী*) এবং আক্রমনাত্মক কৌশল (*অফেনসিভ স্ট্রাটেজী*) নির্ধারণ এবং রিকোয়েস্ট ও অফার লিষ্ট (*অনুরোধ ও চাহিদা তালিকা*) কি হবে এসব বিষয়ে কৌশল নির্ধারণ করার জন্য এই বুদ্ধি-পরামর্শ অপরিহার্য। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল অবশ্য সে পথে যান নি, বরং কি আলোচনা হচ্ছে তা নিয়ে তাঁরা গভীর গোপনীয়তা রক্ষা করেছেন। শেষ পর্বের আলোচনায় সরকারের প্রতিনিধি দল বিজিএমই-কে সাথে নিয়েছিলেন, আমেরিকান ফুটওয়ার ও এপারেলস এসোসিয়েশান (আফটা) এর সাথে বৈঠক করেছেন এবং লবিষ্ট ফার্ম নিয়োগ করাসহ কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তখন আলোচনা মোটামুটি শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

পাল্টা শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে শেষ পর্যন্ত যে ২০ শতাংশ দাঁড়িয়েছে, তা মন্দের ভাল! কিন্তু তার বিনিময়ে বাংলাদেশ কী দিয়েছে, অর্থাৎ কোন্ কোন্ জায়গায় ছাড় দিয়েছে তাও বিবেচনায় রাখতে হবে। বাংলাদেশ যা দিতে স্বীকৃত হয়েছে তার আর্থিক মূল্যমান কত তা হিসাব করতে হবে; এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিক থেকে তার তাৎপর্য কি তার বিচার করতে হবে।

নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট থাকায় এখনো অনেক বিষয় সর্বসাধারণের কাছে পরিষ্কার নয়। তবে এখন অবশ্য গোপনীয়তা রক্ষার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যেসব শর্ত পালন করা হবে বলে বলা হয়েছে তা আগামী নির্বাচিত সরকারকেই মূলত বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই এ বিষয়ে অধিকতর স্পষ্টতা অত্যন্ত জরুরী।

এ ক্ষেত্রে যেটুকু জানা যায়, তারমধ্যে বাংলাদেশের আমদানী শুল্ক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের বিষয় আছে, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবৃদ্ধির কথা আছে, বিভিন্ন মানদন্ডের মান্যতা নিশ্চিতকরণের বিষয় আছে, এবং অন্য দেশের

(মূলত চীনের) সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সতর্কবাণী আছে। শেষের বিষয়টি আবার বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক সম্পর্ক ও স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আগেই বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রকে শুল্কছাড় দেওয়ার কারণে রাজস্ব আয় হ্রাসের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাড়তি আমদানিজনিত *ট্রেড-অফ* (লাভ-ক্ষতি)-এর বিষয়ও আছে। এসব অভিঘাতের তাৎপর্য নিয়ে আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলো উৎপাদন খরচ ও বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চেষ্টা করবে, এটাই স্বাভাবিক। পাল্টা শুল্কের কারণে দর কষাকষির শক্তি, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানিমূল্য নির্ধারণ হবে, তার গুরুত্ব এখন অনেক বেড়ে গেছে। অর্থাৎ, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, লিড টাইম সংকোচন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, মেধাস্বত্ত্ব আইনের যথার্থ প্রয়োগ, শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা – এসব বিষয়ে আরো বেশি মনোযোগী হবারও প্রয়োজন আছে। দরকষাকষির সক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে। বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক (যুক্তরাষ্ট্রের সাথে) এবং বৃহত্তর স্বার্থেই এগুলির প্রতি আরো গভীরভাবে মনোযোগ দিতে হবে ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫. অতিরিক্ত শুল্কের অভিঘাত মোকাবেলায় সম্ভাব্য কৌশল

বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কের অভিঘাত কয়েকটি নিম্নরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে: (ক) আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কের হার; (খ) এই অতিরিক্ত শুল্ক কতদিন কার্যকর থাকবে; (গ) কোন্ কোন্ পণ্য এই শুল্কের আওতায় পড়বে; (ঘ) প্রতিযোগীদের তুলনায় বাংলাদেশ কী দিতে স্বীকৃত হয়েছে; (ঙ) যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রতিযোগী দেশগুলো কি ধরণের কৌশল গ্রহণ করছে; এবং (চ) বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও গৃহীত কৌশলের কার্যকারিতা।

অতিরিক্ত শুল্কের প্রেক্ষাপটে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনীতির দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এ শুল্কের সম্ভাব্য অভিঘাতগুলি শনাক্ত করতে হবে, এবং তার প্রেক্ষিতে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ ও

বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ কয়েকটি উদ্যোগ ও পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.১ টিকফা প্ল্যাটফর্মের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র ২৫ নভেম্বর ২০১৩ (ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট-টিকফা) চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর আওতায় বিভিন্ন সময়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউএসটিআর'র প্রতিবেদনেও এই চুক্তিকে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যাকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে আলোচনা করার মূল প্ল্যাটফর্ম হসেবে গণ্য করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। টিকফার আওতায় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র *দ্বিপাক্ষিক মুক্ত-বাণিজ্য চুক্তি* (এফটিএ) স্বাক্ষর বিষয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। যদিও এ ধরণের আলোচনা শুরুর আগে বাংলাদেশকে যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন চাহিদা ও স্ট্যান্ডার্ডের প্রেক্ষিতে মান্যতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে । টিকফা প্ল্যাটফর্মের সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য-বিনিয়োগের সমস্যা নিয়ে যেমন আলোচনা করতে পারে, তেমনি বাংলাদেশও অতিরিক্ত শুল্কের বিষয়টি উত্থাপন করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রশাসন অতিরিক্ত শুল্ক বিষয়ে ভিন্নতর কৌশল অবলম্বন করতে পারে এবং এমন কি এ শুল্ক হার পুনর্বিবেচনাও করতে পারে। দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বাংলাদেশকে এসব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যে ক্ষমতার আওতায় প্রেসিডেন্ট এ শুল্ক আরোপ করেছেন তাকে চ্যালেঞ্জ করা মামলার শুনানী যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে চলমান রয়েছে। এদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫.২ যুক্তরাষ্ট্রকে শুল্ক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রভাব মূল্যায়ণ করতে হবে

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে যেসব আমদানীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত বা শূন্য শুল্ক প্রদান করতে স্বীকৃত হয়েছে তার অভিঘাত বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। বাংলাদেশের স্থানীয় আমদানি-প্রতিস্থাপক শিল্পের ওপর এসবের প্রভাব, অন্য দেশকে এসব পণ্যে একই ধরনের শুল্ক সুবিধা প্রদান করলে তার কারণে শুল্ক কত হ্রাস পেতে পারে এসব নিয়ে গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে হবে। সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতি ও অর্থনৈতিক প্রভাব পরিমাপ করা এখন একটি অত্যন্ত জরুরী করণীয় হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

৫.৩ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক এফটিএ স্বাক্ষরের সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে

এটা ঠিক যে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক মুক্ত-বাণিজ্য বাণিজ্য চুক্তি করা গেলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অন্যান্য দেশকে অনুরূপ শুল্ক সুবিধা দেয়ার প্রয়োজন হবে না। জর্ডান, কোষ্টারিকার মত উন্নয়নশীল দেশের সাথেও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আছে; তাই কাজটি কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ যারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এফটিএ স্বাক্ষর করেছে তাদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশকে এ বিষয়ে সুচিন্তিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। বাণিজ্য উদারীকরণের ক্ষেত্রে দ্বৈত-ট্র্যাকের অনুসরণ এবং বাস্তবায়নের সময়কাল দীর্ঘায়িত করতে সক্ষম হলে বাংলাদেশ লাভবান হবে। আলোচনায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনীতি হিসাবে নমনীয়তার বিষয়গুলিকে জোরালোভাবে উত্থাপন করতে হবে।

৫.৪ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত তুলা সংক্রান্ত নমনীয়তা ব্যবহার করতে হবে

বাংলাদেশে তুলা আমদানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চম বৃহৎ উৎস (মোট আমদানির ১২%)। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বাংলাদেশ তুলার সপ্তম বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্যস্থল। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত তুলা দিয়ে প্রস্তুতকৃত তৈরি পোশাক রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ না করার অনুরোধ করতে পারে। এ ধরণের একটি ইঙ্গিত ট্রাম্পের এক্সিকিউটিভ অর্ডারে দেয়া আছে। এটা সম্ভব হলে প্রতিযোগীদের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। টিকফা আলোচনায়ও এ বিষয়টি উত্থাপন করা যেতে পারে।

৫.৫ তুলা আমদানি বৃদ্ধিতে বিশেষায়িত গুদাম সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ বিশেষ গুদাম সুবিধা প্রদানের কথা বিবেচনা করতে পারে। ইতোমধ্যে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এই বিষয়ে অনুমতির জন্য আবেদন করেছে। এ ধরণের উদ্যোগ বাস্তবায়ত হলে লিড টাইম কমবে এবং শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, অন্যান্য বাজারেও রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা

বাড়বে। এটি ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী পোশাক রপ্তানিতে শুল্ক ছাড় আদায়ের আলোচনায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি বৃদ্ধি করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ভারসাম্যে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

৫.৬ বিলম্বিত পেমেন্ট সুবিধা

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানির ক্ষেত্রে বিলম্বিত পেমেন্টের সুবিধা প্রদান করলে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক খাত উপকৃত হবে, এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো বেশি তুলা আমদানিতে তারা উৎসাহিত হবে।

৫.৭ ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহে নীতি সহায়তা প্রদান করতে হবে

বাংলাদেশের ১০০টিরও বেশি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান মূলতঃ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের উপর নির্ভরশীল; প্রায় ৩০০টি প্রতিষ্ঠানের অর্ধেকেরও বেশি রপ্তানি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যায়। ব্র্যান্ড ও ক্রেতারা অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা ভাগ করে নিতে রাজি হলেও, এটা ধরে নেয়া যায় যে, তারা এই বোঝার বড় অংশ বাংলাদেশের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের উপর চাপানোর চেষ্টা করবে। অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এই অতিরিক্ত বোঝা বহন করা খুবই কঠিন হবে, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন বাংলাদেশে ব্যাংক ঋণের সুদ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি, জ্বালানির খরচ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সাধারণভাবে ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির উপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র ও মাঝারী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকেরই পক্ষে এই পরিস্থিতিতে টিকে থাকা কঠিন হবে। এ সাময়িক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তার লক্ষ্যে এসব প্রতিষ্ঠানকে নীতি ও প্রণোদনা সহায়তা দিতে হবে। এ পরিস্থিতিতে অনেক রপ্তানিকারক ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য ট্র্যাডিশনাল বাজারের দিকে মনোযোগ দিতে পারে। এর ফলে সেসব বাজারে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হবে এবং রপ্তানি মূল্যের উপর তা নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সঙ্গত কারণেই বাজার বহুমুখিকরণের প্রয়োজনীয়তা এখন আরো বেশি মাত্রায় অনুভূত হওয়া উচিত। অন্যদিকে, কিছু সম্ভাবনারও সৃষ্টি হতে পারে। চীন থেকে কিভাবে আরো বেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যায়, সে বিষয়ে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হবে, যেটা ভিয়েতনাম অতীতে করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে বলে অনুমান করা যায়।

৫.৮ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক সম্পর্কিত উদ্বেগের প্রতিফলন

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রধান উপদেষ্টার পত্রে এবং বাণিজ্য উপদেষ্টার বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রেক্ষিতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে। ২০২৫ সালের ২ জুন অন্তবর্তীকালীন সরকার কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে এ বিষয়কে সামনে রেখে নিম্নরূপ বেশ কিছু প্রস্তাব রাখা হয়েছে: ধাপে ধাপে আমদানি শুল্ক হ্রাস, ১১০টি পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার, ৬৫টি পণ্যে শুল্ক হ্রাস, ৯টি পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, এবং ৪৪২টি পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক হ্রাস। এসব পণ্যের অনেকগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির স্বার্থ নিহিত আছে। তবে কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে বাজেটে শুল্ক হ্রাস না করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্ভাব্য এফটিএ আলোচনায় দর কষাকষির জন্য এসব পদক্ষেপ রেখে দেয়াই সমীচীন ছিল। যেমন, আগেই বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত যে তিনটি পণ্যের ওপর বাংলাদেশে আমদানি শুল্ক সবচেয়ে বেশি সেগুলির শুল্ক হার শূন্যে নামিয়ে আনা হলে বাংলাদেশের শুল্ক ক্ষতি হবে প্রায় ৬১.৬ মিলিয়ন ডলার; আর যদি এমএফএন ভিত্তিতে এই সুবিধা সব দেশের জন্যই প্রযোজ্য হয়, তাহলে শুল্ক ক্ষতি দাঁড়াবে প্রায় ১৬৮.১ মিলিয়ন ডলার। তাই যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত বা রেয়াতি প্রবেশাধিকার প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, এবং এগুলিকে বরং ভবিষ্যতে দরকষাকষির কাজে ব্যবহার করতে হবে।

৫.৯ যুক্তরাষ্ট্র থেকে এফ.ডি.আই. আকর্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে তা (ক) যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করতে তা সহায়ক হবে এবং (খ) প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাহী আদেশে ঘোষিত উচ্চতর মার্কিন কন্টেন্ট'র নিরিখে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি (বাইল্যটারেল ইনভেস্টম্যান্ট এগ্রিম্যান্ট বা বিআইএ) স্বাক্ষর করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে তার আগে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক

সময়ে বিডা কর্তৃক ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে সেগুলির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১০ মেধাস্বত্ব আইনের প্রয়োগ শক্তিশালী করা

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ দূর করতে বাংলাদেশের মেধাস্বত্ব আইনের (আইপিআর) বাস্তবায়ন শক্তিশালী করতে হবে। নকল পণ্য ও মেধাস্বত্ব আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শূন্য-সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী ও বিদেশী রপ্তানিকারকরা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিকারক ও বিনিয়োগকারীরা, এসব বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এসব উদ্যোগ-উদ্যম অবশ্য বাংলাদেশের সাধারণ নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসাবেই দেখা উচিত, কারণ এগুলি বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক।

৫.১১ আঞ্চলিক সহযোগীতা বৃদ্ধিকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে

বিশ্ব বাণিজ্যে উদ্ভূত অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে বিমসটেক'র মতো আঞ্চলিক সহযোগিতার প্ল্যাটফর্মসমূহে আরো সক্রিয় হতে হবে। পরিবহন, বিনিয়োগ, বাণিজ্য, এবং রপ্তানি বাজার ও পণ্য বহুমুখীকরণে আঞ্চলিক পর্যায়ে নিবিড় সহযোগীতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ ও লক্ষনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই লক্ষ্যে আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রতিবেশি দেশ ও বাণিজ্য ব্লকের সাথে এফটিএ ও সেপা জাতীয় চুক্তি স্বাক্ষরের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। এগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প পথ অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে দেখতে হবে। স্মর্তব্য, দক্ষিণ এশিয়া, আসিয়ান ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চলসমূহে বাংলাদেশের মোট বৈশ্বিক রপ্তানির মাত্র ১২ শতাংশ রপ্তানি হয়, যার বিপরীতে এসব অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের মোট আমদানির প্রায় ৬০ শতাংশ আসে। বাজার বৈচিত্র্যকীকরণ ও পণ্য বহুধাকরণকে গুরুত্ব দিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তা হলে ট্রাম্প আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা বাংলাদেশের জন্য সহজতর হবে।

৫.১২ দর কষাকষির শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে

বাংলাদেশের দর কষাকষির সক্ষমতা জোরদার করা এখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছ। বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র নেগোশিয়েটিং উইং স্থাপন করা যেতে পারে, যেখানে পর্যাপ্ত জনবল ও অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এটা ইতিবাচক যে, ইতোমধ্যে একটি নেগোশিয়েটিং পুল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং পুলের সদস্যদের বর্তমানে নিবিড় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

৫.১৩ এমএমএফ জাতীয় তৈরী পোশাকের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত তৈরী পোশাক মূলত দুই ভাগে বিভক্ত -- তুলা-ভিত্তিক এবং ম্যান-মেড ফাইবার (এমএমএফ বা কৃত্রিম আঁশ) ভিত্তিক। যুক্তরাষ্ট্রের মোট পোশাক আমদানির প্রায় ৭০ শতাংশই এমএমএফ ভিত্তিক পণ্য, যেমন সিন্থেটিক, পলিয়েস্টার, নাইলন, এক্রিলিক, স্পেনড্যাক্স ইত্যাদি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের প্রায় ৬০ শতাংশের বেশি তুলা নির্ভর। তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানিতে এমএমএফ নির্ভর অংশ সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারা বিশ্বের তৈরি পোশাক বাজারের প্রবণতাও একই ধরণের। এটা ঠিক যে, বিগত দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তুলা-ভিত্তিক রপ্তানির অংশ মোট পোশাক রপ্তানিতে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে (৭৫.০ শতাংশ থেকে ৬০.০ শতাংশে)। তুলনামূলকভাবে চীনের অংশ আরও দ্রুত হারে হ্রাস পেয়েছে (৪৬.০ শতাংশ থেকে ১৯.০ শতাংশ); ভিয়েতনামের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দৃশ্যমান (৫৮.০ শতাংশ থেকে ৩৬.০ শতাংশ)। যেহেতু এমএমএফ ভিত্তিক তৈরী পোশাকের বাজার দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীন ও ভিয়েতনাম বাংলাদেশের তুলনায় কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। বাংলাদেশকে তৈরি পোশাক শিল্পের আরও বৈচিত্র্যকীকরণের কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আর্থিক-রাজস্ব প্রণোদনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫.১৪ চীন থেকে বর্ধিত বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে

দেখা গেছে যে, যখনই যুক্তরাষ্ট্র চীনের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে তখন চীন ভিয়েতনামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পুনঃরপ্তানির (রি-

এক্সপোর্ট) উদ্যোগ গ্রহণ করে। একই সাথে সাম্প্রতিককালে চীন বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর কৌশল হিসাবে ভিয়েতনামে তার বিনিয়োগ দ্রুত হারে বৃদ্ধি করেছে। ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনামে চীন ও হংকং থেকে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬১.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভিয়েতনামের মোট এফডিআই স্টকের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ)। ২০২৩ সালে এ দুই সূত্র থেকে ভিয়েতনামে মোট বিনিয়োগ ছিল ১০.৪ বিলিয়ন ডলার। এ প্রেক্ষাপটেই যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক প্রাথমিকভাবে বেশি হারে আরোপ করেছিল (৪৬%) এবং রুলস অব্ অরিজিনও আরো কঠিন করে ছিল। বাংলাদেশও ভিয়েতনামের মত চীনা বিনিয়োগ আকর্ষণ করে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করতে পারে। এটা তৈরী-পোশাক ও তৈরী পোশাক-বহির্ভূত উভয় খাতের জন্যই প্রযোজ্য। বলাবাহুল্য, অনেক কিছু যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দরকষাকষির ওপর নির্ভর করবে। যেমন, ভিয়েতনাম পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে অতিরিক্ত শুল্ক ৪৬% থেকে ২০% এ (বাংলাদেশের সমপর্যায়ে) নামিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু এজন্য ভিয়েতনামকে বেশ কিছু ছাড়ও দিতে হয়েছে। বাংলাদেশকে নির্ধারণ করতে হবে কোন কৌশল অবলম্বন করে পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অনুকূল সিদ্ধান্ত আদায় করা যায়। তবে বিষয়টি কোন অর্থেই সহজ নয়। যারা মনে করে থাকেন যে, চীনের ওপর উচ্চ শুল্ক মানেই বাংলাদেশের জন্য বাড়তি সুবিধা প্রাপ্তি তাদের উচিত হবে নিম্নোক্ত সম্ভাবনার আলোকে বিষয়টিকে সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটে বিচার করা: প্রথমত, ভিয়েতনামে বিনিয়োগের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনের রপ্তানির কৌশল; দ্বিতীয়ত, চীনের তৈরী পোশাক রপ্তানি মূলত অ-তুলাজাত (এমএমএফ) পণ্যের ওপর তুলনামূলকভাবে বেশি নির্ভরশীল (যেখানে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক রপ্তানি মূলত তুলাজাত); তৃতীয়ত, চীন মুদ্রার বিনিময় হার ও রপ্তানি খাতে প্রদত্ত প্রণোদনার সমন্বয় করে এসব নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার কৌশল অতীতে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে। এগুলিকে বিবেচনায় রেখেই বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগ কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

৫.১৫ ট্রাম্প শুল্ক মোকাবেলার কৌশলকে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক বাংলাদেশের জন্য আগামীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেরই ইংগিতবাহক। এ ধরণের চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন দিক থেকে আরো

আসতে থাকবে। বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রেক্ষিতে স্মুথ ট্রাঞ্জিশন স্ট্র্যাটেজি (এসটিএস)'র আওতায় এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বৈশ্বিক বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত কৌশল প্রয়োজন, যা বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের ফাঁদ এড়িয়ে টেকসইভাবে এলডিসি থেকে উত্তরণে সহায়তা করবে। বর্তমানে বাংলাদেশ একটি চ্যালেঞ্জিং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ট্রাম্প আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক তার সাথে সম্পৃক্ত করেই দেখতে হবে। আগেই উল্লেখিত হয়েছে, বাংলাদেশকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে এমন এক সময়ে যখন বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ উত্তরণকে টেকসই করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ, যথাযথ কৌশল। যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক আসন্ন এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী অবস্থান থেকে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়টিকে আরো জরুরীভাবে সামনে নিয়ে এসেছে।

উপসংহার

এ প্রবন্ধের প্রথমেই মন্তব্য করা হয়েছে যে, ট্রাম্প প্রশাসন আরোপিত রেসিপ্রোকাল শুল্কের সাথে 'পাল্টাপাল্টিতা'র কোন সম্পর্ক নেই, এ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে নিতান্তই একতরফাভাবে। ,ট্রাম্প প্রশাসন আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক এবং সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের বিভিন্ন রপ্তানিকৃত পণ্যের তুলনামূলক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, রপ্তানি আয়, আমদানী কার্যক্রম ও আমদানি শুল্ক বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখবে। বাংলাদেশের বিনিয়োগ-বাণিজ্য নীতিমালার ওপর আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক ও তৎপরবর্তী দরকষাকষির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

এই প্রবন্ধে ইউএনএসকাপ'র টিনা মডেল ব্যবহার করে বাংলাদেশের রপ্তানির ওপর পারস্পরিক শুল্কের সম্ভাব্য প্রভাব কি হতে পারে তার প্রাক্কলিত ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের মূল প্রতিযোগী দেশ যেমন, চীন, ভিয়েতনাম, ভারত, কেম্বোডিয়ার জন্য অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের অভিঘাতের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের ওপর প্রারম্ভিকভাবে আরোপিত বিভিন্ন মাত্রার অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক, ও নব্বই দিনের জন্য সাময়িকভাবে

সমহারে, অর্থাৎ ১০% হারে, আরোপিত শুল্ককে বিবেচনায় রেখে এ মডেলের অভিক্ষেপগুলো করা হয়েছে। এ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন আসতে পারে তার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে।

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এবং এ ধরণের আলোচনা কিভাবে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক, এবং দেশের স্বার্থানুকূলভাবে করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রবন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত 'গোপনীয়তা ধারা'-র সমালোচনা করা হয়েছে। মন্তব্য করা হয়েছে যে, এই গোপনীয়তার শর্ত বাংলাদেশকে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আটকে ফেলেছে । উচিত ছিল স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টীম গঠন করে আলোচনায় যাওয়া। তা করা হলে বাংলাদেশের অবস্থান আরো শক্ত হত। প্রবন্ধে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক আলোচনার পাশাপাশি অন্যান্য দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, এবং মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মন্তব্য করা হয়েছে যে এসব করতে হবে বাংলাদেশের নিজস্ব ভূ-রাজনৈতিক ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ ও অগ্রাধিকারসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)'র সদস্য হিসেবে বহুপাক্ষিক দায়বদ্ধতার বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশকে তার নিজস্ব বাণিজ্য কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

বাংলাদেশের করণীয় সম্বন্ধে প্রবন্ধে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা এসব পরামর্শ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবেন বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের সামনে রপ্তানি পণ্য বৈচিত্র্যকীকরণ, বাজার বহুধাকরণ, এবং বাজার সুবিধা-নির্ভর প্রতিযোগীতা সক্ষমতা থেকে উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা-নির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় উত্তরণের বিকল্প নেই। এ অতিরিক্ত শুল্ক এমন এক সময়ে আরোপিত হচ্ছে যখন ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বরের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে এবং এই উত্তরণকে টেকসই করার জন্য বাংলাদেশ স্মুথ ট্রানজিশান স্ট্রাটেজি বাস্তবায়ন করছে। ট্রাম্প প্রশাসন আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক

এলডিসি গ্রুপ থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাকে নিঃসন্দেহে আরো কঠিন করবে। বাংলাদেশকে এসব কিছু সামলে নিয়েই আগামীতে অগ্রসর হতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় হোমওয়ার্ককে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

তথ্যসূত্র

Bangladesh Bank. (n.d.). Foreign direct investment and external debt. Bangladesh Bank, Dhaka.

Export Promotion Bureau. (n.d.). Export data. Government of the People's Republic of Bangladesh. https://epb.gov.bd/site/view/epb_export_data/

Fitch Ratings. (2025, April 15). US trade war carries risks for many APAC sovereign ratings. https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/us-trade-war-carries-risks-for-many-apac-sovereign-ratings-15-04-2025

Gourinchas, P.-O. (2025, April 22). The global economy enters a new era. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2025/04/22/the-global-economy-enters-a-new-era

Moodz's. (2025, April 9). Banking: Asia-Pacific banks in Vietnam, Thailand, and Bangladesh would be the worst hit in APAC from US import tariffs. https://events.moodzs.com/banking-asia-pacific-

Rahman, M., Arpita, A.T., Chowdhury, T.A. (2025). Trump Reciprocal Tariffs and Bangladesh: Implications and Response. Centre for Policy Dialogue (CPD). https://cpd.org.bd/resources/2025/07/Trump-Reciprocal-Tariffs-and-Bangladesh-Implications-and-Response.pdf

Raihan, S., and Sen, K. (2025, April 4). How Trump's tariffs could hit developing economies—even those not involved in the trade war. The Conversation. https://theconversation.com/how-trumps-tariffs-could-

hit-developing-economies-even-those-not-involved-in-the-trade-war-255435

Razzaque, M., Islam, S., & *Zaman*, R. (2025). U.S. Reciprocal Tariffs: Implications for Bangladesh. Dhaka: Research and Policy Integration for Development (RAPID). Retrieved November 3, 2025, from https://www.rapidbd.org/wp-content/uploads/2025/09/RAPID-Policy-Brief_October-2025_U.S.-Reciprocal-,,

The White House. (2025, April 3). Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectifz Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectifz-trade-practices-that-contribute-to-large-and-persistent-annual-united-states-goods-trade-deficits/

Tyagi, H. (2025, April 7). US stock market crash: $6 trillion wiped out, Nasdaq in bear market: How are Tesla, Apple, Nvidia valued after correction? INDmoney. https://www.indmoney.com/blog/us-stocks/nasdaq-in-bear-market

USITC. (2025). Dataweb. https://dataweb.usitc.gov/trade/search/TotExp/HTS

USTR. (2025). Presidential Tariff Actions. https://ustr.gov/issue-areas/presidential-tariff-actions

World Trade Organization. (2025, April 23). Universal and Country-Specific Additional Duties on Imports from China - Communication from the United States. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/638-3.pdf&Open=True

World Trade Organization. (2025, April 8). Universal and Country-Specific Additional Duties on Imports from China - Request for consultations by China. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S00

9-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=314965,314964,314858,314812,314792,314572&CurrentCatalogueIdIndex=4&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True

বাংলাদেশে নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি কী হওয়া উচিত: রাজনৈতিক অর্থনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিশ্লেষণ

সেলিম রায়হান*

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত' ধারণাকে রাজনৈতিক অর্থনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, মানব উন্নয়ন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এক ধরনের 'উন্নয়ন-সাফল্য' অর্জন করলেও, এই সাফল্যের নীচে কাঠামোগত সংকট, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং বৈষম্যমূলক প্রবণতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে। প্রচলিত আলোচনা যেখানে প্রধানত 'রাজনৈতিক বন্দোবস্ত' বা ক্ষমতা-বণ্টনের আপোষকাঠামোকে কেন্দ্র করে, এই প্রবন্ধ সেখানে 'অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত'–অর্থাৎ উৎপাদন, বিনিয়োগ, শ্রম, বাণিজ্য, আর্থিক খাত, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় কারা কী ধরনের সুযোগ পাচ্ছে এবং কোন প্রণোদনা কাঠামোর মধ্যে পাচ্ছে–এই প্রশ্নকে কেন্দ্রে আনে। যুক্তি হলো, টেকসই ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক বন্দোবস্তের স্থিতিকে এমন এক নতুন অর্থনৈতিক সমাজ চুক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যেখানে রেন্টবণ্টন নয়, বরং উৎপাদনশীলতা, উদ্ভাবন, ন্যায্যতা ও পরিবেশ-সহনশীলতা প্রণোদিত হয়। প্রবন্ধে প্রথমত বিনিয়োগ ও উৎপাদন কাঠামোতে তৈরি পোশাকনির্ভর একমুখী প্রবৃদ্ধির ঝুঁকি এবং এলিট-ব্যবসা-রাষ্ট্র জোটের কারণে রেন্ট-সন্ধানী বিনিয়োগের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে 'উৎপাদনশীল রাষ্ট্রবাদ' ও লক্ষ্যনির্ভর প্রণোদনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়ত নিম্ন কর-জাতীয় আয়ের অনুপাত, কর-ছাড়-নির্ভর রাজনীতি এবং দুর্বল রাজস্ব প্রশাসনকে রেন্ট-বণ্টনমূলক রাজনীতির লক্ষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করে নিয়মভিত্তিক, স্বচ্ছ ও প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা এবং স্বাধীন রাজস্ব-পরিষদের প্রস্তাব করা হয়েছে। তৃতীয়ত শ্রমবাজারে ক্ষমতার বৈষম্য, অনানুষ্ঠানিকতা ও নারী শ্রমিকের বঞ্চনার প্রেক্ষিতে সংগঠনের স্বাধীনতা, শ্রম-আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা-মেঝের ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থত এলিট বন্দি আর্থিক খাত, খেলাপি ঋণ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সীমিত স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে প্রবন্ধটি শক্তিশালী তদারকি, 'যোগ্য ও উপযুক্ত' পরিচালনা-ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন-অর্থায়নের স্বচ্ছ কাঠামোর ওপর জোর দিয়েছে। পঞ্চমত এলডিসি-উত্তর বিশ্বে কঠোর শ্রম-পরিবেশ-মানদণ্ড ও কার্বন-বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে সমন্বিত বাণিজ্য-শিল্প স্থাপত্য, মান-অবকাঠামো এবং সময়বদ্ধ শিল্প-প্রণোদনার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠত নির্বাচিত প্রাতিষ্ঠানিক

*অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নির্বাহী পরিচালক, *সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ইকনমিক মডেলিং (সানেম)*।

দুর্বলতা ও সীমিত প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মভিত্তিক শাসন, শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক এবং বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় সরকারকে নতুন বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। সপ্তমত পরিবেশ ও জলবায়ু-সংকটকে ন্যায্যতার প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরে জলবায়ু-অর্থায়নের জবাবদিহি, স্থানীয় অংশগ্রহণ এবং সবুজ রূপান্তরকে অর্থনৈতিক কৌশলের কেন্দ্রভাগে আনার যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সবশেষে প্রবন্ধটি দেখায় যে নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত মূলত একটি প্রকল্প–যা ঝুঁকি-মানচিত্রায়ন, ধাপে ধাপে সংস্কার, ক্ষতিপূরণ ও রূপান্তর-সহায়তা, উন্মুক্ত তথ্য এবং জ্ঞানজোট গঠনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্য দিয়েই প্রবৃদ্ধি, ন্যায়বিচার, উদ্ভাবন ও জবাবদিহি-নির্ভর এক নতুন সমাজ চুক্তির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার সম্ভাব্য রূপরেখা এই প্রবন্ধ প্রস্তাব করে।

ভূমিকা: রাজনৈতিক বন্দোবস্ত থেকে অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে রূপান্তরের প্রয়োজন

বাংলাদেশের উন্নয়নের পথচলা এখন এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে শুধু প্রবৃদ্ধির হার, দরিদ্রতার হার বা মানব উন্নয়ন সূচকের অগ্রগতি দিয়ে জাতীয় সাফল্যের মূল্যায়ন আর যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতার পর গত পাঁচ দশকে গড়ে ওঠা উন্নয়ন নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য: মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি বৃদ্ধি, গড় আয়ু বৃদ্ধি, শিশুমৃত্যু হ্রাস, নারীর কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্পে রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন-এসব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক উন্নয়ন আলোচনায় এক ধরনের 'সফলতার কাহিনি' হিসেবে দেখা হচ্ছে (World Bank, 2022; Murshid, 2022)। কিন্তু এই সাফল্যের নীচে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ কাজ করছে, তার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট কাঠামোগত বৈষম্য, উৎপাদনশীলতার সীমাবদ্ধতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে (Raihan and Bourguignon, 2024)।

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি মূলত কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতনির্ভর যেমন: তৈরি পোশাক, প্রবাসী আয় এবং সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামোগত বিনিয়োগ। এই সীমিত উৎসের ওপর দাঁড়িয়ে একদিকে যেমন প্রাথমিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অর্থনীতি ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ ও ভঙ্গুর হয়ে উঠেছে। উৎপাদন কাঠামোতে বৈচিত্র্য সীমিত থাকায় বিশ্ববাজারে চাহিদার সামান্য পরিবর্তন, বৈশ্বিক মূল্যশৃঙ্খল-এর নতুন মানদণ্ড, শ্রম ও পরিবেশ-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কিংবা প্রযুক্তিনির্ভর স্বয়ংক্রিয়তার ঢেউ

সহজেই সামগ্রিক অর্থনীতিতে আঘাত হানতে পারে। একই সঙ্গে কর কাঠামোর দুর্বলতা, আর্থিক খাতে ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ, রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর নির্ভরতা এবং রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে নীতিগত সুবিধা বণ্টন-এসব মিলিয়ে উন্নয়নের গুণগত ভিত্তি দুর্বল হয়ে আছে (Khan, 2018; IMF, 2023)।

এই প্রেক্ষাপটে 'রাজনৈতিক বন্দোবস্ত' বা রাজনৈতিক সমঝোতা (political settlement) ধারণাটি বাংলাদেশের বাস্তবতা বিশ্লেষণের এক শক্তিশালী পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মুশতাক খান এবং অন্যান্য লেখকরা দেখিয়েছেন, কোনো দেশের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বলতে বোঝায় ক্ষমতার বণ্টন, প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক আপস এবং রেন্ট (rent অর্থাৎ সম্পদ সৃষ্টি না করে সুবিধা আদায়) বণ্টনের এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সমীকরণ, যা রাজনৈতিক স্থিতি নিশ্চিত করে (Khan 2010; North et al., 2009)। বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতি, ব্যবসায়ী রাজনৈতিক জোট, আমলাতান্ত্রিক কাঠামো এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি করেছে– যেখানে কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাতে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত।

তবে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা প্রায়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রাকে আড়াল করে রাখে, আর তা হলো 'অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত'–অর্থাৎ, বাস্তব অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন উৎপাদন, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, শ্রম, আর্থিক খাত এবং বাণিজ্যে কাদের হাতে সিদ্ধান্তের ক্ষমতা এবং কাদের জন্য কী ধরনের সুযোগ ও প্রণোদনা সৃষ্টি হচ্ছে। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত রাষ্ট্রক্ষমতার স্থিতি ব্যাখ্যা করলেও অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত ব্যাখ্যা করে উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় প্রকৃত মূল্য সৃষ্টি এবং মূল্য বণ্টনের প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্য। এক অর্থে বলা যায়, রাজনৈতিক বন্দোবস্ত যদি হয় ক্ষমতার 'উপরের তলা' তবে অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত হলো সেই ভবনের 'ভিত্তি ও কাঠামো'– যার ওপর দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকে।

রাষ্ট্র, বাজার ও সমাজের সম্পর্ক যে কাঠামোর ওপর গড়ে ওঠে, তা নির্ধারণ করে কোন ধরনের বিনিয়োগকে পুরস্কৃত করা হবে, কোন পেশা ও শ্রেণির জন্য কী ধরনের সামাজিক সুরক্ষা থাকবে, কীভাবে শ্রমিকদের কণ্ঠ ও সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, আর কোন ধরনের প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে

রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রবাহিত হবে। যদি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদি স্থিতি রক্ষার লক্ষ্যে রেন্ট বণ্টনকে বৈধতা দেয় কিন্তু তা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, শ্রমিকের অধিকার এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতার সঙ্গে যুক্ত না হয়, তবে উন্নয়ন একসময় 'সংখ্যার গল্প' হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে গুণগত রূপান্তর অনুপস্থিত থাকে। তাই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের আলোচনাকে অতিক্রম করে একটি সুস্পষ্ট 'নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত' বা নতুন 'অর্থনৈতিক-সামাজিক চুক্তি' গড়ে তোলার রূপরেখা নির্ধারণ।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সেই রূপরেখা অন্বেষণ করা। আমরা বিনিয়োগ ও উৎপাদন কাঠামো, রাজস্ব ও আর্থিক শৃঙ্খলা, শ্রমবাজার ও সামাজিক সুরক্ষা, আর্থিক খাতের শাসনব্যবস্থা, বাণিজ্য ও শিল্পনীতি, সামগ্রিক শাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, পরিবেশ ও জলবায়ুর রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং বাস্তবায়ন রাজনীতির প্রশ্নগুলোকে পরস্পর সংযুক্তভাবে বিশ্লেষণ করব। আলোচনায় একদিকে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, চীনসহ কিছু সফল উন্নয়ন রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার নানা সমস্যা-জর্জর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা থাকবে (Amsden 1992; Evans 1995; Wade 1990)। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের আলোকে আমরা দেখাতে চাই, বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের পুনর্গঠন মানে কেবল নতুন নীতিপত্র নয়, বরং প্রণোদনা কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক নকশা এবং রাজনৈতিক ভাগাভাগির এক গভীর পুনর্বিন্যাস।

১. বিনিয়োগ ও উৎপাদন কাঠামো: রাষ্ট্র-বাজার সম্পর্কের পুনর্গঠন

বাংলাদেশের উৎপাদন কাঠামোয় তৈরি পোশাকশিল্পের আধিপত্য এখন এক ধরনের 'এক ইঞ্জিনের প্রবৃদ্ধি মডেল তৈরি করেছে। পোশাকশিল্পে বিপুল কর্মসংস্থান ও রপ্তানি আয়ের সাফল্য অপরিসীম; বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের নগরের শ্রমবাজারে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের পথ কিছুটা হলেও উন্মুক্ত হয়েছে (Raihan and Bidisha, 2018)। কিন্তু যখন অর্থনীতির একটি বড় অংশ তুলনামূলকভাবে কম মজুরি, কম প্রযুক্তি এবং নিম্ন-মধ্যমানের পণ্য রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল থাকে, তখন বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতার কাঠামো পাল্টে গেলে পুরো অর্থনীতি গভীর ঝুঁকির মুখে পড়ে (Gereffi, 2018)। তৈরি পোশাকের

বাইরে চামড়া, ওষুধশিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি সেবা, কৃষিজাত প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হালকা প্রকৌশল, ইলেকট্রনিক সামগ্রী ইত্যাদি খাতে কিছু উন্নতি দেখা গেলেও এগুলোর বিস্তার ও গভীরতা এখনও সীমিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই নীতিগত সহায়তা বিচ্ছিন্ন, অস্থায়ী এবং 'কারবার-নির্ভর' (deal-based)।

এই সংকীর্ণতা ব্যাখ্যা করার জন্য রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোচনায় 'কারবার পরিসর' (deals space) কিংবা এলিট-ব্যবসা-রাষ্ট্রের পারস্পরিক সমঝোতার কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ (Pritchett et al., 2018; Khan, 2010)। বাংলাদেশের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নতুন শিল্পখাত বা প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগের তুলনায় এমন খাতগুলো বেশি সুবিধা পায়, যাদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর গভীর যোগসূত্র আছে। ফলে বিনিয়োগ প্রবাহিত হয় এমন জায়গায় যেখানে রেন্ট আহরণের সুযোগ বেশি কিন্তু প্রযুক্তি শেখা, মানোন্নয়ন বা বিশ্ববাজারে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। এই পরিস্থিতিকে 'শেখাহীন রেন্ট' বলা যায়, যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা উৎপাদনশীলতার উন্নয়নকে নয় বরং সংগঠিত রেন্ট-সন্ধানী গোষ্ঠীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়।

তাই নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে রাষ্ট্রবাজার সম্পর্কের পুনর্গঠনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত 'উৎপাদনশীল উন্নয়নবাদী রাষ্ট্র'। আমসডেন, ওয়েড এবং ইভান্স-এর বিশ্লেষণ দেখায়, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং কিছু পরিমাণে মালয়েশিয়ায় রাষ্ট্র কখনো শুধুমাত্র "রাত্রিকালীন প্রহরী" বা সীমিত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং শিল্পায়নের কৌশলগত রূপরেখা প্রণয়ন, লক্ষ্যনির্ভর প্রণোদনা প্রদান, টেকসই রপ্তানিনির্ভরতা তৈরি এবং কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে রাষ্ট্র এক ধরনের 'উন্নয়নমুখী পরিশাসনব্যবস্থা' গড়ে তোলে (Amsden, 1992; Wade, 1990; Evans, 1995)। সেখানে প্রণোদনা ও সুরক্ষার প্রতিটি ইউনিট কেবল রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার বিনিময়ে নয় বরং নির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের শর্তে দেওয়া হয়েছে-যদি ফল না আসে, প্রণোদনা তুলে নেওয়া হয় অথবা অন্তত পুনর্মূল্যায়ন করা হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই শিক্ষা প্রয়োগ করতে হলে প্রয়োজন প্রণোদনা কাঠামোর গভীর পুনর্বিন্যাস। শিল্পখাতকে দেওয়া নগদ সহায়তা, শুল্ক সুরক্ষা, কর ছুটি, রেয়াতি ঋণ ইত্যাদির প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিমাপযোগ্য

সূচক-যেমন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রপ্তানি বৃদ্ধির হার, স্থানীয় মূল্য সংযোজনের পরিমাণ, নতুন প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ, গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের অংশ, ব্র্যান্ডিং ও নকশায় অবদান এবং পরিবেশ মান মেনে চলার অগ্রগতি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। এমনকি বৃহৎ বিনিয়োগ প্রকল্পে স্থানীয় উপাদান ব্যবহারের হার, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং শ্রমিকদের ন্যূনতম মান নিশ্চিত করার বিষয়গুলোকে প্রণোদনা পাওয়ার শর্ত হিসেবে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

অন্যদিকে শিল্পায়নের ভৌগোলিক কেন্দ্রীকরণ ঢাকাকেন্দ্রিক মহানগরের অর্থনীতিকে অতিরিক্ত চাপের মুখে ফেলেছে এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলকে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রেখেছে। নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে তাই আঞ্চলিক শিল্প-বাস্তুসংস্থান গঠনের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। জেলার পর্যায়ে বা 'আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধি মেরু'ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-কেন্দ্র, জ্ঞান-উদ্ভাবন কেন্দ্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প-সরকারের যৌথ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হলে স্থানীয় উদ্ভাবন, শ্রমবাজারের গতিশীলতা এবং বাজার সংযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। নারী ও যুব উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ, অতীতে ঋণ ব্যবহারে পারদর্শিতার ভিত্তিতে নতুন ঋণ প্রদান এবং উন্নয়ন-অর্থায়ন যোগানোর বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রারম্ভিক ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা থাকলে ব্যবসা-উদ্যোগ শুধু শহরকেন্দ্রিক না থেকে বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিসরে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বিনিয়োগ প্রশাসনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন। বাস্তবে 'ওয়ান-স্টপ সেবা' বা বিনিয়োগবান্ধব প্রশাসনিক কাঠামোর কথা দীর্ঘদিন শোনা গেলেও, উদ্যোক্তার অভিজ্ঞতায় তা এখনো 'বহু ধাপের জটিলতা' হিসেবেই কাজ করছে। অনুমোদন, নিবন্ধন, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিদ্যুৎ-গ্যাস সংযোগ, জমি বরাদ্দ এবং কর-নিবন্ধনের মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে সময়সীমা নির্ধারণ, নীরব-অনুমোদনের নীতি, অনলাইন অনুসরণ ও নজরদারি, আপিল-ব্যবস্থা কার্যকর না হলে বিনিয়োগ পরিবেশে আস্থা সৃষ্টি করা কঠিন (World Bank, 2025)। তাই বিনিয়োগ-প্রশাসনে স্বচ্ছতা, পূর্বানুমেয়তা এবং জবাবদিহি নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত।

২. কর, রাজস্ব ও আর্থিক শৃঙ্খলা: রেন্ট-সন্ধানী রাজনীতির রূপান্তর

রাজস্ব কাঠামো কোনো রাষ্ট্রের উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষার আর্থিক ভিত্তি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে কর জাতীয় আয়ের অনুপাত স্থবির, যা উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং মৌলিক জনসেবার প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের তুলনায় স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত (IMF, 2023)। এই দুর্বল রাজস্ব কাঠামোর পেছনে রয়েছে কর-নীতি ও কর-প্রশাসনের রাজনৈতিক অর্থনীতি, যা অনেক সময় কর সংগ্রহের দক্ষতা বাড়ানোর বদলে রেন্ট-বণ্টন, কর-ছাড় এবং বিশেষ সুবিধার মাধ্যমে রাজনৈতিক নেটওয়ার্ককে পুরস্কৃত করার ভূমিকা পালন করেছে।

করের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো সংকুচিত কর-ভিত্তি। তুলনামূলকভাবে অল্প সংখ্যক আনুষ্ঠানিক খাত ও মধ্যম আকারের প্রতিষ্ঠানের কাঁধে করের মূল বোঝা বর্তায়, অথচ উচ্চ আয়ের অনেক ব্যক্তি, বড় অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসা, সম্পদশালী গোষ্ঠী বিভিন্ন আইনি ও অনিয়মিত পথ ব্যবহার করে করের বাইরে থেকে যেতে পারে। এই বাস্তবতা শুধু রাজস্ব সংগ্রহের সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয় না, বরং কর-ব্যবস্থার ন্যায়বিচার ও বৈধতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে (Khan, 2018)। কর মওকুফ, কর ছাড়, শুল্ক সুবিধা এবং ভর্তুকি-প্রণোদনার বড় অংশ কখনো কখনো উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যের চেয়ে বেশি কাজ করে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও পেট্রোন-ক্লাইন্ট ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার হাতিয়ার হিসেবে (North et al. 2009; Acemoglu & Robinson, 2012)।

নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে কর ও রাজস্ব সংস্কারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নিয়মভিত্তিক, স্বচ্ছ এবং কর্মদক্ষ রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা একদিকে আয় বৈষম্য কমাতে ভূমিকা রাখবে, অন্যদিকে উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য স্থিতিশীল আর্থিক ভিত্তি নিশ্চিত করবে। এই প্রেক্ষিতে স্বাধীন রাজস্ব-পরিষদ-এর ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্বাধীন কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংহত রাজস্ব পরিষদ যদি নিয়মিতভাবে রাজস্ব পূর্বাভাস, মাঝারি মেয়াদি রাজস্ব কৌশল, কর-ব্যয়ের তালিকা এবং কর-ছাড় ও প্রণোদনার ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ প্রকাশ করে তাহলে বাজেট ও কর-নীতির উপর সংসদ, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে (IMF, 2023)।

কর-প্রশাসনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি এবং ঝুঁকি-ভিত্তিক নিরীক্ষা কর ফাঁকি ও প্রশাসনিক ইচ্ছাধীনতা দুটিই কমানোর সুযোগ তৈরি করতে

পারে। ইলেকট্রনিক চালান, অনলাইন রিটার্ন এবং ডিজিটাল মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রশাসন শুধু প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে না বরং করদাতা ও কর-প্রশাসনের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ কমিয়ে দুর্নীতি করার সুযোগ হ্রাস করে। একই সঙ্গে করদাতার অধিকার ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে একটি 'করদাতা সনদ' প্রণয়ন করলে কর ব্যবস্থায় বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়তে পারে।

করনীতির পুনর্গঠনে প্রধান গুরুত্ব পাওয়া উচিত আয় ও সম্পদের শীর্ষ স্তরে করের প্রগতিশীলতা বৃদ্ধি এবং কর-ভিত্তি বিস্তৃত করার ওপর। সম্পত্তি কর, পুঁজি-লাভ কর, উচ্চ-মূল্যের পরিষেবা ও বিলাসী ভোগে যুক্তিসঙ্গত কর আরোপ, কর ফাঁকি রোধে তথ্য-বিনিময় কাঠামো শক্তিশালী করা হলে রাজস্ব সম্ভাবনা বাড়ে এবং আয়ের শীর্ষ স্তরের রেন্ট-সন্ধানী সক্ষমতা কিছুটা হলেও সীমিত হয়। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষি-সংলগ্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা ও নিম্ন-মধ্য আয়ের গোষ্ঠীর ওপর করের অসামঞ্জস্যপূর্ণ চাপ না বাড়িয়ে একটি 'সমতাপূর্ণ রাজস্ব চুক্তি' গড়ে তোলা জরুরি।

প্রণোদনা বা কর-ছাড়ের ক্ষেত্রে সময়াবদ্ধতা এবং কর্মদক্ষতার সঙ্গে সংযোগ রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রকৃতি বদলাতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশে শিল্প-প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা হেলাফেলা করে নয়; নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ না হলে প্রণোদনা ধীরে ধীরে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণের জন্য স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে (Amsden 1992; Wade 1990)। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও শিল্প ও রপ্তানি-প্রণোদনাকে 'রেন্ট-বণ্টন' থেকে 'রেন্ট-ব্যবস্থাপনা'র দিকে নিয়ে যেতে হলে সময়াবদ্ধতা, ফলাফল এবং স্বচ্ছ মূল্যায়ন কাঠামো অপরিহার্য।

অবশেষে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সমন্বয়ের প্রশ্নটি নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের অন্যতম ভিত্তি। বাজেট ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নির্বিচারে ব্যবহার করা হলে মূল্যস্ফীতি, সুদের হার এবং বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে; পরোক্ষভাবে 'মুদ্রাস্ফীতি-কর'-এর মাধ্যমে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয় (IMF, 2022)। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর রাজনৈতিক চাপ কমিয়ে, ঋণ-স্থিতিশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে ঋণ-নিয়ম বা রাজস্ব-নিয়ম প্রবর্তন,

এবং বাজেট ঘাটতি মেটাতে স্বচ্ছ ঋণ-ব্যবস্থাপনা নতুন বন্দোবস্তের অপরিহার্য উপাদান।

৩. শ্রমবাজার ও সামাজিক সুরক্ষা: ক্ষমতার ভারসাম্য ও অন্তর্ভুক্তি

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে একদিকে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে দুর্বল কর্মপরিবেশ, কম মজুরি, অনানুষ্ঠানিক নিয়োগ এবং সংগঠনের সীমাবদ্ধতা-এই দ্বৈত বাস্তবতা দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। শ্রমবাজারে ক্ষমতার ভারসাম্য সুস্পষ্টভাবে নিয়োগকর্তা ও পুঁজির পক্ষে ঝুঁকে রয়েছে। শ্রমিকদের সংগঠন, দর-কষাকষির ক্ষমতা এবং আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ সীমিত, বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে। নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা, অসম মজুরি, গৃহস্থালি দায়িত্বের একক বোঝা এবং সামাজিক রীতিনীতি বড় বাধা হিসেবে রয়ে গেছে (ILO, 2021)।

রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে, এই শ্রমবাজার কাঠামোকে অনেক সময় 'উন্নয়নহীন নিয়ন্ত্রণমূলক পুঁজিবাদ' বলা হয়, যেখানে শ্রমিকের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন দমন করে স্বল্পমেয়াদি স্থিতি বজায় রাখা হয়, কিন্তু প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, প্রক্রিয়া-নবায়ন এবং দক্ষতার উন্নয়নের মতো দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না (Selwyn, 2016)। এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা 'নিম্নমানের প্রতিযোগিতা'র মধ্যে আটকে থাকে, যেখানে কেবল কম মজুরি ও কম মানের পণ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা করা হয়, কিন্তু 'উচ্চমানের প্রতিযোগিতা' অর্থাৎ উচ্চ দক্ষতা, উদ্ভাবন ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা অর্জনের পথে অগ্রগতি ধীর থাকে।

নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে শ্রমবাজারকে শুধু 'উৎপাদনের উপকরণ' হিসেবে নয়, বরং উন্নয়নের কৌশলগত অংশীদার হিসেবে দেখতে হবে। শ্রমিককে অবদমিত ও সংগঠনবিমুখ রাখলে স্বল্পমেয়াদে উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব হতে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সেই শ্রমবাজার প্রযুক্তি গ্রহণ, গুণগত উন্নয়ন এবং 'কাজের মাধ্যমে শেখা'র প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। এর পরিবর্তে যদি শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা, আইনের ন্যায্য প্রয়োগ এবং সামাজিক সুরক্ষার একটি ন্যূনতম পাটাতন নিশ্চিত করা যায়, তবে শ্রমিকের নিরাপত্তাহীনতা কমবে, দক্ষতা উন্নয়নে অংশগ্রহণের আগ্রহ

বাড়বে এবং এক ধরণের 'সহযোগিতামূলক উৎপাদনশীলতা'র ভিত্তিতে শ্রমবাজার গড়ে ওঠবে।

এই প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অপদখল থেকে শ্রমিক ইউনিয়নের মুক্তি, ইউনিয়ন গঠনে অতিরিক্ত বাধা কমানো, শিল্পখাতে সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল ও পেশাদার ইউনিয়ন গড়ে তোলার সুযোগ তৈরির প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে। একই সঙ্গে শ্রম আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ, শ্রম পরিদর্শনকে ঝুঁকি-ভিত্তিক ও তথ্যনির্ভর করার মাধ্যমে শ্রম-আইনকে বাস্তব প্রভাবশালী করা যেতে পারে। কেবল আইনের বইয়ে থাকার বদলে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকার নিশ্চিত হয়, তবে শ্রমবাজারে ক্ষমতার ভারসাম্য কিছুটা হলেও সংশোধিত হবে।

সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রেও একটি 'সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা পাটাতনে'র ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সুপারিশ অনুযায়ী ন্যূনতম আয়ের নিরাপত্তা, শিশুসেবা, মাতৃত্ব সুরক্ষা, অক্ষমতা ও বার্ধক্যকালে মৌলিক সুরক্ষা, কর্মবিমা-এসব উপাদান যদি ধীরে ধীরে সর্বজনীন করা যায় তবে শুধু দারিদ্র-ঝুঁকি কমবে না, বরং শ্রমবাজারে পেশা বদল, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনে রূপান্তরও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী শিশু যত্ন ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি প্রতিরোধ, সমান মজুরি নিশ্চিতকরণ, গর্ভধারণ ও মাতৃত্বকালীন ছুটির ন্যূনতম মান অর্জন করা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে 'ত্রিমাত্রিক অংশীদারিত্ব মডেল' বা ত্রি-সূত্র -অর্থাৎ শিল্প, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের যৌথ উদ্যোগ-বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য বিশেষ সম্ভাবনাময় (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000)। দক্ষতা উন্নয়নের পাঠক্রম তৈরিতে শিল্পের সুনির্দিষ্ট চাহিদা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ধারা বিবেচনা করা, ইন্টার্নশিপ ও শিক্ষানবিশতা-ভিত্তিক কর্মসূচির বিস্তৃতি, ফলাফল-ভিত্তিক অর্থায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি বাড়ানো গেলে দক্ষতার উন্নয়নে শুধু প্রজেক্ট-নির্ভর খণ্ডিত উদ্যোগ থাকবে না; বরং তা হবে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ।

৪. আর্থিক খাত: প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি ও এলিট বন্দিদশা থেকে মুক্তি

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত গত কয়েক দশকে ধারাবাহিকভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠী দ্বারা অধিকরণ, দুর্বল তদারকি এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণে গভীর সংকটে পড়েছে। উচ্চ মাত্রার খেলাপি ঋণ, ঋণ শ্রেণিকরণে শৈথিল্য, পুনঃঋণায়নে দুর্বল নীতি এবং সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংককে করদাতার অর্থ দিয়ে বারবার সহায়তা-এসব কিছু আর্থিক খাতকে 'চিরস্থায়ী দুর্বলতা'র মধ্যে রেখেছে (Hassan et al., 2024)। এই পরিস্থিতি এমন এক ধরনের নৈতিক ঝুঁকি তৈরি করে, যেখানে কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠী জানে যে তারা যদি ঝুঁকিপূর্ণ বা অনৈতিক ঋণ গ্রহণ করে ব্যর্থও হয় তবু রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে পুনঃতফসিলকরণ বা উদ্ধারের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

এই ধরনের এলিট অধিকরণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনগত ও কার্যকর স্বাধীনতা সীমিত, ব্যাংক পরিচালনায় 'যোগ্য ও উপযুক্ত' মানদণ্ড প্রায়শই উপেক্ষিত, বড় ঋণগ্রহীতা ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের ঋণ প্রদানে কড়াকড়ি নিয়ম থাকা সত্ত্বেও সেগুলো মানা হয় না বা রাজনৈতিক চাপের কারণে লঙ্ঘিত হয় (Hassan et al., 2024)। ফলে সৎ ও দক্ষ উদ্যোক্তারা তুলনামূলকভাবে উচ্চ সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়, আর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা-নির্ভর ব্যবসায়ীরা সহজ শর্তে বিপুল অংকের ঋণ নিয়ে খেলাপি হয়েও দায়মুক্ত থাকে। আর্থিক খাতের এই বিকৃত প্রণোদনা কাঠামো দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও উৎপাদনশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে আর্থিক খাতের প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন দুইটি স্তরে জরুরি: একদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনী ও কার্যকর স্বাধীনতা বৃদ্ধি, অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং ক্ষুদ্র পর্যায়ের ঝুঁকি-তদারকিকে নির্বাহী শাখার সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখতে হবে। এটি শুধুমাত্র আইন সংশোধনের প্রশ্ন নয়; বরং উপযুক্ত মানবসম্পদ, তথ্য-বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং ঝুঁকি মূল্যায়নের দক্ষতা গড়ে তোলার সঙ্গে সম্পর্কিত।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনায় 'যোগ্য ও উপযুক্ত' মানদণ্ড কঠোরভাবে প্রয়োগ করা, পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব ও জবাবদিহি স্পষ্ট করা জরুরি। বড় ঋণ-গ্রহণ, অপ্রদেয় ঋণের প্রকৃত চিত্র এবং আর্থিক চাপ-পরীক্ষার ফলাফল নিয়মিতভাবে জনগণের সামনে প্রকাশ করা গেলে বাজারের পক্ষ থেকে শাস্তি এবং পুরস্কারের প্রক্রিয়াও কিছুটা হলেও কার্যকর হতে পারে। সমস্যা-আক্রান্ত ব্যাংকগুলোকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডার, বড় ঋণগ্রহীতা, ব্যবস্থাপকদের ওপর প্রথমে দায়ভার চাপানো এবং করদাতার অর্থ ব্যবহারকে "শেষ অবলম্বন" হিসেবে দেখা উচিত– যাতে নৈতিক ঝুঁকি কমে।

উন্নয়ন-বিনিয়োগের কাঠামোও এখানে প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো, সবুজ প্রযুক্তি ও উচ্চ ঝুঁকির উদ্ভাবনী খাতে বিনিয়োগের জন্য বিশেষায়িত উন্নয়ন-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান, অবকাঠামো-বন্ড এবং ঋণ-বিমা/দায়-গ্যারান্টির প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বেড়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি আমানতের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি শিল্পঋণের অসামঞ্জস্য দূর করতে পারলে আর্থিক খাত বিনিয়োগ-বান্ধব রূপ নিতে পারে। তবে এইসব উদ্যোগকে অবশ্যই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ-মুক্ত, স্বচ্ছ এবং ফলাফল-ভিত্তিক কাঠামোর মধ্যে রাখতে হবে– যাতে উন্নয়ন-অর্থায়ন আবার নতুনভাবে এলিট অধিকরণের উৎসে পরিণত না হয়।

৫. বাণিজ্য, রপ্তানি ও শিল্পনীতি: কৌশলগত রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক অবস্থান

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে। এই উত্তরণ যেমন একটি প্রতীকী সাফল্য, তেমনি এটি বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের অবস্থানকে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করাবে। এলডিসি হিসেবে প্রাপ্ত শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধার অনেকাংশই ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে; একই সঙ্গে শ্রম মানদণ্ড, পরিবেশ সংরক্ষণ, কার্বন-নিঃসরণ, মূল্যশৃঙ্খলে স্বচ্ছতা ইত্যাদি বিষয়ে কঠোর শর্ত আরোপিত হবে (UNCTAD, 2023)। বৈশ্বিক বাণিজ্য দ্রুত বদলে যাচ্ছে; বহুপাক্ষিকতার জায়গায় আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি এবং জলবায়ু-সংক্রান্ত শুল্ক (যেমন কার্বন সীমান্ত-সমন্বয় কর) ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের জন্য 'কৌশলগত রাষ্ট্র'-এর ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ড্যানি রডরিক দেখিয়েছেন, সফল শিল্পনীতির মূল কাজ হলো

বাজারের ব্যর্থতা, তথ্য-ঘাটতি এবং সমন্বয় সমস্যার সমাধান করে নতুন শিল্পখাতের উত্থান এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা। তবে তা করতে গিয়ে রাষ্ট্র যেন নতুন করে শুধুই এলিটদের জন্য রেন্ট-এর সুযোগ তৈরি না করে সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে (Rodrik 2004)। এর জন্য প্রয়োজন একদিকে প্রযুক্তি, মানদণ্ড ও বাজারে প্রবেশের বাধা চিহ্নিত করা, অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লক্ষ্যনির্ভর প্রণোদনা প্রদান এবং ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি পুনর্গঠন করার সক্ষমতা।

বাংলাদেশের বিদ্যমান নীতি-কাঠামোতে বাণিজ্য, শিল্প, অর্থ, পরিকল্পনা, শ্রম ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়সহ অনেক সংস্থার ভূমিকা রয়েছে; কিন্তু তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) কাঠামো এমনভাবে গড়ে ওঠে যা দেশীয় উৎপাদনকে দীর্ঘমেয়াদে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তোলার বদলে আমদানিনির্ভর ভোগকে উৎসাহিত করে। আবার কখনো কখনো উচ্চ সুরক্ষা ও প্রণোদনা অকার্যকর বা অদক্ষ শিল্পকে টিকিয়ে রাখে কিন্তু প্রযুক্তি ও দক্ষতায় অগ্রগতির জন্য প্রণোদনা তৈরি করে না। তাই 'সংগ্রন্থিতবাণিজ্য-শিল্প কৌশল' গড়ে তোলা নতুন বন্দোবস্তের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান।

এই কৌশলে মূল্যশৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপ-কাঁচামাল উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সমাপ্ত পণ্য, সরবরাহ-ব্যবস্থা, মানদণ্ড নির্ধারণ এবং রপ্তানি-সমগ্রভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। রপ্তানি-প্রণোদনা ও শুল্ক কাঠামো এমনভাবে নকশা করা জরুরি, যাতে স্বল্প-প্রযুক্তি ও নিম্নমানের পণ্যে আটকে না থেকে ধীরে ধীরে উচ্চমান, নকশানির্ভর এবং প্রযুক্তিঘন পণ্যে উন্নীত হওয়া যায় (Gereffi, 2018)। এ ক্ষেত্রে মানদণ্ড, পরিমাপ ও স্বীকৃতি-ব্যবস্থাতে বিনিয়োগ অপরিহার্য; কারণ মানদণ্ড মানতে না পারলে উন্নত বাজারে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

উদীয়মান খাতগুলোতে-যেমন ওষুধশিল্প, চিকিৎসা-উপকরণ, তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল কনটেন্ট, কৃষিজাত প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হালকা প্রকৌশল, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি-রাষ্ট্র প্রাথমিক অবকাঠামো, গবেষণা ও উন্নয়ন, মানবসম্পদ গঠন এবং বাজার-সংযোগে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এই সহায়তা সময়াবদ্ধ এবং ফলাফল-নির্ভর হওয়া জরুরি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি লক্ষ্য পূরণ না

হয় তবে সুরক্ষা ও ভর্তুকি ধীরে ধীরে কমিয়ে অথবা পুনর্গঠন করে আরও সম্ভাবনাময় খাতে সম্পদ স্থানান্তরের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতিতে আরেকটি কৌশলগত প্রশ্ন হলো আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংযোগ। দক্ষিণ এশিয়ার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্ভাবনার তুলনায় অনেক কম; আবার বিস্তৃত এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বহুখাতীয় মূল্যশৃঙ্খল গড়ে উঠছে, যেখানে বাংলাদেশ এখনও পর্যাপ্তভাবে যুক্ত হতে পারেনি। আঞ্চলিক বাণিজ্য-চুক্তি, পরিবহন করিডোর, সীমান্ত বাণিজ্যের বাধা কমানো এবং উৎপাদন-সংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ যদি কিছু নির্দিষ্ট শিল্পখাতে আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, তবে নতুন বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি আকর্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে (World Bank 2021)। তবে এগুলো সম্ভব হবে তখনই, যখন দেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বচ্ছ ও পূর্বানুমেয় নিয়মে পরিচালিত হবে এবং ব্যবসা করার খরচ ও ঝুঁকি সীমিত থাকবে।

৬. প্রতিষ্ঠান ও শাসন: নিয়মভিত্তিক অর্থনীতি গঠনের রাজনীতি

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে একটি মৌলিক বৈপরীত্য দেখা যায়। কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন কর-প্রশাসন বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী-রাজস্ব আহরণ বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী; অন্যদিকে প্রতিযোগিতা কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন অথবা পরিবেশ অধিদপ্তরের মতো প্রতিষ্ঠান প্রায়শই সীমিত বাজেট, দুর্বল মানবসম্পদ এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। ফলে নিয়মভিত্তিক শাসনের যে ন্যূনতম কাঠামো প্রয়োজন তা গড়ে ওঠে না; বরং কিছু বাছাইকৃত ক্ষেত্রে বিধান প্রয়োগ শক্তিশালী, আর অন্য ক্ষেত্রে 'ছাড় দেওয়া' ও 'সমঝোতা-ভিত্তিক সুবিধা'র মাধ্যমে রেন্ট আহরণের সুযোগ থাকে।

নর্থ ও সহ-লেখকদের 'সীমিত প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা' শীর্ষক ধারণা এই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করে (North et al., 2009)। তারা দেখিয়েছেন, বহু উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এলিটদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ এবং স্বল্পমেয়াদি স্থিতি নিশ্চিত করা হয়; এর বিনিময়ে এলিটদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক রেন্ট-এর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এই কাঠামোয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কখনো কখনো

ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল রাখা হয়, যাতে নিয়মের অস্পষ্টতা এবং প্রয়োগের স্বেচ্ছাচারিতা বজায় থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতির অভিযোগ, টেন্ডারবাজি, বেআইনি উপায়ে সরকারি ঠিকাদারি এবং বিচার-প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা-এসব প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার প্রতিফলন হিসেবে দেখা যেতে পারে।

নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে নিয়মভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নকশায় কিছু মৌলিক রূপান্তর প্রয়োজন। প্রথমত নীতি নির্ধারণ, নীতির প্রয়োগ এবং আপিল-প্রক্রিয়াকে আইনগত সময়সীমা, স্বচ্ছ মানদণ্ড এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার মধ্যে আনতে হবে। কোনো বিনিয়োগ, লাইসেন্স বা প্রশাসনিক অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিতে হবে; নতুবা নীরব-অনুমোদনের নীতি কার্যকর হবে-এমন বিধান প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা সীমিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত বড় সরকারি ব্যয় এবং অবকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে 'গণমূল্য নিরীক্ষার' ধারণা প্রয়োগ করে কেবল আর্থিক ব্যয়ের হিসাব নয় বরং সামাজিক, পরিবেশগত এবং বিকল্প ব্যবহারের ব্যয়-সুবিধা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এতে প্রকল্প-নির্বাচন প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে জবাবদিহিমূলক হবে।

তৃতীয়ত নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বাড়ানো জরুরি। প্রতিযোগিতা কমিশন, টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বিদ্যুৎ-শক্তি নিয়ন্ত্রক এবং আর্থিক তদারকি সংস্থাগুলোর ওপর নির্বাহী বিভাগের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও ঘন ঘন হস্তক্ষেপ থাকলে তারা কার্যকর নীতি প্রয়োগ করতে পারে না। আইনগতভাবে নির্ধারিত মেয়াদ, অপসারণের সীমিত কারণ এবং বাজেটের ওপর নির্বাহী নিয়ন্ত্রণ কমানো-এসব পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রকদের স্বাধীনতা বাড়াতে সহায়ক।

চতুর্থত স্থানীয় সরকারকে অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের অংশীদার হিসেবে ভাবতে হবে। স্থানীয় স্তরে কর আহরণ, উন্নয়ন প্রকল্প-নির্বাচন এবং সামাজিক সেবা প্রদানের ক্ষমতা বাড়ালে একদিকে দায়বদ্ধতা মানুষের কাছাকাছি আসে, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ওপর চাপ কমে। কর্মসম্পাদনের সঙ্গে সংযুক্ত অনুদান, উন্মুক্ত বাজেট, এবং উন্মুক্ত চুক্তি-ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডে নাগরিক অংশগ্রহণ বাড়ানো গেলে শাসনের বিকেন্দ্রীকরণ বাস্তব রূপ পেতে পারে।

সবশেষে, নিয়মভিত্তিক শাসন কেবল প্রযুক্তিগত বা প্রক্রিয়াগত বিষয় নয়; এটি ক্ষমতার সম্পর্ক পুনর্গঠনের প্রশ্ন। যখন নীতি ও প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি-নির্ভরতা অতিক্রম করে এবং আইন সমানভাবে প্রয়োগ হয়, তখনই অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে ন্যায়বিচার এবং পূর্বানুমেয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতা, সামাজিক আন্দোলনের চাপ এবং জ্ঞান-সম্পদ-ক্ষমতার বহুমাত্রিক সমন্বয়কে একত্রে কাজ করতে হয়।

৭. পরিবেশ, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সম্পদের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি (IPCC, 2022)। ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদী-ভাঙন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি-এসবের সম্মিলিত প্রভাব শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরনকে নয়, বরং কৃষি উৎপাদন, খাদ্য-নিরাপত্তা, গ্রামীণ জীবিকা এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের গতিপথকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। একই সঙ্গে দ্রুত শিল্পায়ন, ইটভাটা, নদী দখল ও দূষণ, বন উজাড় এবং শহুরে বায়ুদূষণ-এসব স্থানীয় পরিবেশ-সংকটকে ঘনীভূত করছে।

এই সমগ্র প্রেক্ষাপটকে শুধুমাত্র পরিবেশ-ব্যবস্থাপনা বা 'প্রকৃতি সংরক্ষণ'র প্রথাগত ভাষায় বোঝা যাবে না; বরং এটি ক্ষমতা, সম্পদ ও ন্যায়বিচারের প্রশ্ন হিসেবে দেখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে বড় অবকাঠামো প্রকল্প, নদী খনন বা বাঁধ নির্মাণ, বনভূমিতে শিল্প বা পর্যটন প্রকল্প কিংবা নগর এলাকায় নদীতীর দখল-এই সব ক্ষেত্রেই প্রশ্ন আসে, কার ভূমি, জল বা জীবিকা, কে হারাচ্ছে এবং কারা লাভবান হচ্ছে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং সরকারি সংস্থাগুলো অনেক সময় একই সঙ্গে এই প্রকল্পগুলোর সুবিধাভোগী; অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, আদিবাসী বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যাদের রাজনৈতিক কণ্ঠ তুলনামূলকভাবে দুর্বল (UNFCCC, 2021)।

নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে তাই পরিবেশ-নীতি ও জলবায়ু-নীতিকে 'প্রকৃতির প্রতি সুবিচারভিত্তিক হতে হবে। অর্থাৎ, জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন, সবুজ শক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা-এসব ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, অধিকার এবং ক্ষতিপূরণের প্রশ্নকে কেন্দ্রে রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেসব জলবায়ু অর্থায়ন, 'ক্ষতি ও অবক্ষয় প্রতিকার তহবিল', কিংবা 'সবুজ

জলবায়ু তহবিল' থেকে বাংলাদেশ আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে বা পাবে, সে অর্থের ব্যবহারে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি– যাতে প্রকৃত ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীই এর প্রধান উপকারভোগী হয় (UNFCCC, 2021; IPCC, 2022)।

বড় অবকাঠামো প্রকল্প বা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে 'স্বাধীন, পূর্বচিন্তিত ও অবহিত সম্মতি' গ্রহণের নীতিকে আইনি বাধ্যবাধকতা হিসেবে গ্রহণ করলে একদিকে আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমি ও সম্পদ রক্ষা, অন্যদিকে প্রকল্পের সামাজিক বৈধতা নিশ্চিত করা সম্ভব হতে পারে। 'পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন' প্রক্রিয়াকে কেবল কাগুজে প্রতিবেদন থেকে সরিয়ে বাস্তব সামাজিক পরামর্শ, মাঠভিত্তিক গবেষণা এবং বিকল্প বিন্যাস বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

শিল্প দূষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের বেপরোয়া ব্যবহার সীমিত করতে পরিবেশ-আদালত, দূষণ-জরিমানা এবং দূষণ-বিমা কার্যকর হতে পারে। দূষণকারী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিকভাবে দায়বদ্ধ করা গেলে দূষণ ব্যয় সমাজের ওপর চাপানোর প্রবণতা কমানো যায়। একই সঙ্গে সবুজ শিল্পনীতির অংশ হিসেবে জ্বালানি-দক্ষতা, পুর্নব্যবহার, বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা এবং কার্বন নিঃসরণ সম্পর্কে অবহিতকরণ ইত্যাদিকে ধীরে ধীরে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। রপ্তানি বাজারে ক্রমবর্ধমান কার্বন-সংক্রান্ত মানদণ্ডকে শুধু বাণিজ্য-বাধা হিসেবে নয়, বরং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সবুজ রূপান্তরের সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে (UNCTAD 2023)।

সবশেষে, জলবায়ু-রাজনীতি হলো এক ধরনের আন্তঃপ্রজন্ম ন্যায়বিচারের রাজনীতি। আজকের উন্নয়ন-পথ নির্বাচন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। তাই নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রশ্নকে 'বাড়তি' বা 'পার্শ্ব বিষয়' নয় বরং অর্থনৈতিক রূপান্তরের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত।

৮. নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের বাস্তবায়ন রাজনীতি

যেকোনো বৃহৎ অর্থনৈতিক সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবে সফল হবে কি না, তা নির্ভর করে কেবল নীতির তাত্ত্বিক সৌন্দর্য বা কারিগরি নকশার ওপর নয়, বরং বাস্তবায়নের রাজনৈতিক অর্থনীতির ওপর। হ্যাগার্ড ও ওয়েব

দেখিয়েছেন, উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক সংস্কারের সবচেয়ে বড় বাধা প্রায়শই সংগঠিত স্বার্থগোষ্ঠী, যারা বিদ্যমান রেন্ট-সন্ধানী কাঠামোর সুবিধাভোগী (Haggard & Webb, 1993)। সংস্কার যদি তাদের ভবিষ্যৎ আয় বা প্রভাব কমিয়ে দেয়, তবে তারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কর রেয়াতনির্ভর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা নির্ভর কিছু শিল্পখাত, এলিট-অধিকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা নির্ভর আমলাতন্ত্রের একটি অংশ-এসব গোষ্ঠী নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের অনেক উপাদানের বিরুদ্ধে নীরব কিংবা প্রকাশ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

তাই বাস্তবায়ন রাজনীতিতে প্রথম কাজ হলো ঝুঁকি-মানচিত্র তৈরি করা। কোন খাত, অঞ্চল বা গোষ্ঠী সংস্কারের ফলে স্বল্পমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, কারা লাভবান হতে পারে এবং কারা নিরপেক্ষ থাকবে-এই বিষয়গুলো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে। এ ধরনের বিশ্লেষণ ছাড়া যদি হঠাৎ করে কোনো ভর্তুকি তুলে নেওয়া, শুল্ক-কাঠামো বদলানো বা কঠোর আর্থিক শৃঙ্খলা আরোপ করা হয় তবে শ্রমিক ছাঁটাই, দামের আকস্মিক বৃদ্ধি বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে অর্থনৈতিক স্থবিরতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে; যা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জনরোষ সৃষ্টি করতে পারে।

দ্বিতীয়ত স্বল্পমেয়াদে 'দ্রুত দৃশ্যমান সাফল্য' অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ। এমন কিছু সংস্কার আছে, যা তুলনামূলকভাবে কম রাজনৈতিক প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করা যায় এবং দ্রুত দৃশ্যমান ফল দেখাতে পারে-যেমন ডিজিটাল চালান, অনলাইন লাইসেন্সিং, করদাতার সেবা সরলীকরণ, ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতার জন্য তথ্যভিত্তিক ঋণমান-ব্যবস্থা ইত্যাদি। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে যদি সাধারণ ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও নাগরিকেরা বাস্তব জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করে, তবে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি কঠিন সংস্কারে সমাজে সমর্থন পাওয়া কিছুটা সহজ হবে।

তৃতীয়ত ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও উত্তরণ-সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো সুরক্ষিত শিল্পখাতে শুল্ক কমানো বা ভর্তুকি কমানোর পরিকল্পনা থাকে, তবে সেই খাতের শ্রমিক ও উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃপ্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং সময়াবদ্ধ সহায়তার প্যাকেজ থাকতে হবে। একইভাবে, আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে নতুন শিল্প ও

অবকাঠামো প্রকল্পের অবস্থান নির্ধারণে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

চতুর্থত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগত লক্ষ্য নির্ধারণ, উন্মুক্ত তথ্য, এবং নিয়মিত মূল্যায়ন এক ধরনের 'প্রমাণ-ভিত্তিক জবাবদিহি' তৈরি করতে পারে। যদি নাগরিকেরা দেখতে পান যে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য-যেমন কর-জাতীয় আয়ের অনুপাত বৃদ্ধি, খেলাপি ঋণ হ্রাস, সামাজিক সুরক্ষা-বলয়ের বৃদ্ধি, অথবা শ্রম মানদণ্ড উন্নয়ন-ধীরে ধীরে অর্জিত হচ্ছে এবং ব্যর্থতার জন্য কেউ না কেউ দায় নিচ্ছে, তাহলে সংস্কারের ওপর আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

পঞ্চমত জ্ঞান-জোট গঠনও বাস্তবায়ন রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা-কেন্দ্র (থিংক ট্যাঙ্ক), পেশাজীবী সংগঠন এবং গণমাধ্যমের একটি অংশ যদি প্রমাণ-ভিত্তিক বিশ্লেষণ, নীতি-ব্যাখ্যা এবং জন-আলোচনার মাধ্যমে নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের ধারণাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তাহলে ভুল তথ্য, গুজব বা স্বার্থান্বেষী ব্যাখ্যার প্রভাব কিছুটা হলেও কমবে। জ্ঞান-উৎপাদন এবং নীতি-আলোচনার এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের উপস্থিতি ও তৎপরতা সংস্কারের স্থায়িত্ব ও অন্তর্নিহিত গ্রহণযোগ্যতাকে শক্তিশালী করে।

একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে 'নকশা-পরীক্ষা-পরিধি' চক্র। কোনো নতুন নীতি প্রথমে ছোট পরিসরে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা, তার ফলাফল পরিমাপ করা, অভিজ্ঞতা থেকে শিখে নীতি-নকশা উন্নত করা এবং পরে প্রয়োগের পরিধি ধাপে ধাপে বিস্তৃত করা-এভাবে নীতি সংস্কারের ঝুঁকি ও প্রতিরোধ দুটোই নিয়ন্ত্রণযোগ্য থাকে। ভিয়েতনাম, রুয়ান্ডা, এমনকি ভারতের কিছু রাজ্যের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পরীক্ষামূলক নীতি-প্রয়োগ দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের পথ প্রশস্ত করতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তকে কেবল 'নীতিপত্রের অনুচ্ছেদসমষ্টি' হিসেবে নয় বরং এক দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক প্রকল্প কিংবা প্রয়াস হিসেবে ভাবতে হবে। এতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক যন্ত্র, ব্যবসায়িক এলিট, শ্রমিক সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং জ্ঞান-সমাজ-সবাই বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেবে। এ ধরনের বহুপাক্ষিক অংশগ্রহণ না থাকলে কোনো বড় সংস্কারই স্থায়ী হয় না; বড়জোর কিছু সময়ের জন্য কেবল 'প্রদর্শনমূলক অভিঘাত' সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু কাঠামোগত রূপান্তর ঘটাতে পারে না।

উপসংহার: এক নতুন সমাজচুক্তির পথে

উপরের আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন-পর্বে কেবল রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট নয়; তার সঙ্গে সমান্তরালে বা আরও গভীরভাবে অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত নিয়ে ভাবা জরুরি। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত রাষ্ট্রক্ষমতার ভারসাম্য ও স্থিতি ব্যাখ্যা করলেও অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত ব্যাখ্যা করে কীভাবে উৎপাদন, বিনিয়োগ, শ্রমবাজার, আর্থিক খাত, বাণিজ্য, পরিবেশ-নীতি এবং সামাজিক সুরক্ষা-এই সবগুলো ক্ষেত্র একসঙ্গে মিলেমিশে একটি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তোলে।

নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের সারকথা হলো ক্ষমতার ভারসাম্য, উৎপাদনশীলতার উল্লম্ফন এবং নিয়মভিত্তিক শাসনের সমন্বয়। রাষ্ট্র-বাজার-সমাজের সম্পর্ক এমনভাবে পুনর্গঠিত হতে হবে, যা প্রণোদনা উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষকে পুরস্কৃত করে; ভর্তুকির রাজনীতি সংগঠিত রেন্ট-এর বদলে উৎপাদনশীল বিনিয়োগকে এগিয়ে দেয়; শ্রমবাজারে কণ্ঠ ও নিরাপত্তা উৎপাদনশীলতার জ্বালানি হিসেবে কাজ করে; আর্থিক খাতে তথ্য ও জবাবদিহি আস্থা পুনর্গঠন করে; এবং বাণিজ্য-নীতিতে কৌশলগত রাষ্ট্র জ্ঞান, সবুজ প্রযুক্তি ও মানদণ্ডের নতুন ভাষা শেখে। পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রশ্ন যদি উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং শাসনে নিয়ম ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার ওপরে উঠে যেতে পারে, তবে প্রবৃদ্ধি কেবল সংখ্যা বৃদ্ধির কাহিনী থাকবে না; তা হবে মানবিক সক্ষমতার বিস্তার, ভৌগোলিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং প্রজন্মান্তরের ন্যায়সঙ্গত সমৃদ্ধির এক সমন্বিত মঞ্চ।

এই যাত্রা অবশ্যই সহজ নয়। সংগঠিত স্বার্থের প্রতিরোধ, প্রশাসনিক জড়তা, দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা-সব মিলিয়ে পথ কণ্টকাকীর্ণ। তবু উন্নয়ন-ইতিহাস আমাদের শেখায়, সংকটের মুহূর্তেই সমাজ বড় রূপান্তরের সুযোগ পায়। আজ বাংলাদেশের সামনে যে জানালা খুলেছে-স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ, বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং মধ্যম আয়ের ফাঁদে আটকে যাওয়ার আশঙ্কা-তার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এতে নতুন ধরনের সমাজচুক্তি গড়ার এক বিরল সুযোগ আছে। এই সুযোগ

কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন সাহসী রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, প্রমাণ-ভিত্তিক নীতিনির্মাণ এবং জনসম্পৃক্ত সংস্কার-জোটের সমন্বিত প্রচেষ্টা।

যদি আমরা এই অভিমুখে অগ্রসর হতে পারি, তবে বাংলাদেশের উন্নয়ন কেবল সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের সংখ্যাগত উন্নতি নয়; বরং তা হয়ে উঠবে এক ন্যায়ভিত্তিক, টেকসই এবং ভবিষ্যতমুখী সমাজের গভীর রূপান্তর। এই রূপান্তরেরই ফলশ্রুতি নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত-যেখানে প্রবৃদ্ধি, ন্যায়বিচার, উদ্ভাবন এবং জবাবদিহি একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহযাত্রী।

তথ্যসূত্র

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012): *Why Nations Fail*. Crown Publishers.

Adhikari, R., & Yamamoto, Y. (2020): *Industrial transformation and GVC participation in Asia*. ADB Working Paper.

Amsden, A. (1989): *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization.* Oxford University Press.

Evans, P. (1995): *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton University Press.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000): "The dynamics of innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university–industry–government relations". *Research Policy*, 29(2), 109–123.

Gereffi, G. (2018): *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism.* Cambridge University Press.

Haggard, S., & Webb, S. (1993): "What do we know about the political economy of economic policy reform?" *World Bank Research Observer*, 8(2), 143–168.

Hassan, M.M., Bidisha, S.H., Mahmood, T.I., and Raihan, S. (2024): Political Economy of Private Bank Governance in Bangladesh. In: Raihan S, Bourguignon F, Salam U, eds.

Is the Bangladesh Paradox Sustainable?: The Institutional Diagnostic Project. Cambridge University Press:146-178.

ILO (2021): *Bangladesh Labour Market Update*. International Labour Organization.

IMF (2023): *Bangladesh: Selected Issues*. International Monetary Fund.

IPCC (2022): *Sixth Assessment Report*. Intergovernmental Panel on Climate Change.

Khan, M. H. (2010): Political settlements and the governance of growth-enhancing institutions. SOAS Working Paper.

Khan, M. H. (2018): "Political settlements and the analysis of institutions." *African Affairs*, 117(469), 636–655.

Murshid K.A.S. (2022): *The Odds Revisited: Political Economy of the Development of Bangladesh*. Cambridge University Press.

North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009): *Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*. Cambridge University Press.

Pritchett, L., Sen, K., & Werker, E. (eds.) (2018): *Deals and Development: The Political Dynamics of Growth Episodes.* Oxford University Press.

Raihan, S., Bourguignon, F. (2024): Bangladesh's Development: Achievements and Challenges. In: Raihan S, Bourguignon F, Salam U, eds. Is the Bangladesh Paradox Sustainable?: The Institutional Diagnostic Project. Cambridge University Press; 29-70.

Raihan, S. and Bidisha, S.H. (2018): "Female employment stagnation in Bangladesh". EDIG Research Paper. London: ODI, The Asia Foundation and UKaid.

Rodrik, D. (2004): *Industrial policy for the twenty-first century*. Harvard University, John F. Kennedz School of Government.

Selwyn, B. (2016): *The Struggle for Development*. Polity Press.

UNCTAD (2023): *The Least Developed Countries Report*. UN Conference on Trade and Development.

UNFCCC (2021): *Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows*. United Nations Framework Convention on Climate Change.

Wade, R. (1990): *Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization*. Princeton University Press.

World Bank (2022): *Bangladesh Development Update*. World Bank.

World Bank (2025): *Bangladesh: Country Private Sector Diagnostic*. World Bank.

বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের বৈদেশিক এবং ও ভারতীয় সংযোগ সম্পর্কে 'নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্যা'র বয়ান – একটি পর্যালোচনা'

নজরুল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক ইতিহাসকে নিছক বর্ণনাধর্মী বিদ্যার পরিবর্তে অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত এবং 'উপপাদ্য-প্রমাণ' কাঠামোতে ঢেলে সাজানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯৮০'র দশকে 'নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্যা'র আবির্ভাব ঘটে। প্রায় একই সময়ে সংঘটিত নব-ধ্রুপদী অর্থনীতির পুনরুত্থানের সাথে এই প্রয়াস সম্পর্কিত ছিল। অর্থনৈতিক ইতিহাসের ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন অভিমতকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে এই ইতিহাস বিদ্যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ইতিহাসের কিছু বিষয়ের পর নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রবক্তারা প্রথম শিল্প বিপ্লবের ইতিহাস নিয়েও কিছু বিতর্কের জন্ম দেন। বিশেষত, তাঁরা এই বিপ্লবে চাহিদা বৃদ্ধির কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা এবং সেইসূত্রে বৃটিশ শিল্প বিপ্লবে বৃটেন কর্তৃক অধিকৃত উপনিবেশসমূহের ভূমিকা অস্বীকার করেন। এই প্রবন্ধে নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসের এসব অভিমতের পরীক্ষা করা হয়েছে। বিশেষত, শিল্প বিপ্লবে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পুনরায় তুলে ধরা হয়েছে। নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্যা কর্তৃক বৃটিশ শিল্প বিপ্লবে বৃটিশ উপনিবেশসমূহের ভূমিকা অস্বীকারের জ্ঞানগত কারণ হিসেবে এই বিপ্লবের সংযোগের পরিধি সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ধারণা এবং সংযোগের কালাক্রমের প্রতি মনোযোগের অভাব কে চিহ্নিত করা যায়। এর সাথে আরও যোগ করা যায় উপনিবেশের অধিকর্তা-সঞ্জাত অপ্রকাশ্য অহংবোধ। অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চায় অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং পরিসংখ্যান ও গাণিতিক বিশ্লেষণের প্রয়োগ নিশ্চয়ই উপকারী হতে পারে, তবে এই প্রয়োগ যদি জ্ঞানগত সমস্যা এবং শ্রেণিগত পক্ষপাতিত্ব দ্বারা দুষ্ট হয় তবে তা অবাঞ্ছনীয় ফলাফলেরও জন্ম দিতে পারে।

---

*হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক জেফ্রি উইলিয়ামসন 'নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্যা'র অন্যতম প্রবক্তা। প্রথম শিল্প বিপ্লবে উপনিবেশসমূহের, বিশেষত ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর তথ্যের ঘাটতি এবং ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটি ইংরেজিতে রচিত হয়েছিল। তিনি এটি পড়ে অনেককিছু জানতে পেরেছেন এবং উপকৃত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। আশা করা যায় অন্যরাও যারা হয় সাধারণভাবে 'নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্যা' কিংবা ভারতের উপর বৃটিশ শাসনের অর্থনৈতিক অভিঘাত সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক তাঁরাও উপকৃত হবেন। এই প্রবন্ধের সকল ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতার দায় কেবলমাত্র লেখকের।

ভূমিকা

অর্থনৈতিক ইতিহাসের আলোচনায় গত শতাব্দীর সত্তর দশকে 'নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাস' (সংক্ষেপে, ন-অ-ই) বলে একটি স্বতন্ত্র ধারার উদ্ভব ঘটে। অর্থনৈতিক ইতিহাস সংক্রান্ত ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে ন-অ-ই বেশ চমক ও উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। মূলত, যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক হওয়ার কারণে ন-অ-ই'র প্রাথমিক প্রয়োগসমূহ আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রতিই নিবদ্ধ হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ন-অ-ই গবেষকদের দাবি যে, আমেরিকার দাস-প্রথা লাভজনক ছিল না। একইভাবে ন-অ-ই'র অনেকে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, আমেরিকার শিল্পায়নে সেদেশের রেলওয়ের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না। আমেরিকার অনেক ইতিহাসবিদ ন-অ-ই'র এসব দাবির প্রত্যুত্তর দিয়েছেন এবং বহুলাংশে খণ্ডন করেছেন।

তবে ন-অ-ই'র আলোচনা আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। সময়ে তাঁদের অনেকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি প্রসারিত করেন। তারমধ্যে একটি হলো প্রথম তথা বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের ইতিহাস। এই শিল্প বিপ্লব নিয়ে এমনিতেই আলোচনার শেষ নেই। এ বিষয়ে আলোচনার আধিক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে সেই ১৯১০ সালেই ইতিহাসবিদ ক্লাপহ্যাম মন্তব্য করেন যে, 'প্রথম শিল্প বিপ্লবের ইতিহাস অনেকটা তিনবার কচলানো লেবুর মতো (Clapham 1910, পৃ. 195)'। তবে সাথে তিনি যোগ করেন যে, তা সত্ত্বেও 'এতে আশ্চর্যজনক পরিমাণ রস রয়ে গেছে (ঐ)'। সুতরাং, অবাক হওয়ার নয় যে, ন-অ-ই'র অনেকে প্রথম শিল্প বিপ্লবকে তাঁদের গবেষণার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এ বিষয়ে বেশকিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ন-অ-ই'র অন্যতম প্রতিভূ, আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ, জোয়েল মোকির, ১৯৮৫ সালে এগুলোর একটি সংকলন প্রকাশ করেন (Mokyr, ed., 1985)। এই সংকলনের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন যে, যেহেতু 'নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাস নতুন নতুন বিষয়ে তার হাতিয়ার প্রয়োগ করতে আগ্রহী, সেহেতু (প্রথম) শিল্প বিপ্লবকে একটি সহজ লক্ষ্যবস্তু হিসাবে দেখেছিল (ঐ, পৃ. ২)'। প্রথম শিল্প বিপ্লব নিয়ে ন-অ-ই গবেষকদের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য

প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে মোকির সম্পাদিত উপরিল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলো ১৯৮১ সালে প্রকাশিত ফ্লাউড ও ম্যাকক্লস্কী সম্পাদিত আরেকটি গ্রন্থ (Floud and McCloskey, eds., 1981)।

অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার নতুন ধারা হিসেবে ন-অ-ই'র শ্রেষ্ঠত্বের দাবীসমূহ নিয়ে ফ্লাউড ও ম্যাকক্লস্কী তাঁদের সম্পাদিত সংকলনের ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য ঐ, pp. xi-xv)। মোকির নিজেও তাঁর উপরিল্লিখিত সম্পাদিত গ্রন্থে এ বিষয়ে তাঁর নিজের লেখা একটি পৃথক প্রবন্ধ সংযোজিত করেন (দ্রষ্টব্য Mokyr, ed., 1985, পৃ. ১-২০)। যারা এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানতে আগ্রহী তাঁরা এসব সূত্রের ব্যবহার করতে পারেন। সংক্ষেপে এখানে যেটুকু বলা যায় তা হলো, ন-অ-ই'র প্রবক্তারা অর্থনৈতিক ইতিহাসকে একটি বর্ণনাধর্মী বিদ্যার পরিবর্তে 'সুনির্দিষ্ট উপপাদ্য → অকাট্য প্রমাণ'র কাঠামোতে সাজানোর চেষ্টা করেন। এদিক থেকে বলা যেতে পারে যে, অর্থনীতি শাস্ত্রকে গাণিতিক শাস্ত্রে পরিণত করার লক্ষাভিমুখী নয়াধ্রুপদী অর্থনীতির সাধারণ যে প্রয়াস, অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ন-অ-ই তারই প্রসারণ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছে। সেলক্ষ্যে ন-অ-ই'র প্রবক্তারা অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে 'চাহিদা-যোগান,' 'আপেক্ষিক সুবিধা', ইত্যাদি তত্ত্বের আলোকে বিভিন্ন উপপাদ্যের প্রস্তাব করেন এবং তারপর গাণিতিক-পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেসব উপপাদ্য প্রমাণে সচেষ্ট হন। তাঁদের আশা ছিল যে, এই পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁরা অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে অকাট্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেন।

তবে তাঁদের এই আশা পূরিত হয় না। মোকির শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন যে, 'যারা সুনির্দিষ্ট উত্তর খুঁজছেন তাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসে প্রবেশ করা উচিত নয় (Mokyr, ed., 1985, পৃ. ৭০)'। তবে হতাশাকর এই পরিণতি ন-অ-ই প্রবক্তাদের নিরাশ করে না। তাঁরা মনে করেন যে, অকাট্যভাবে প্রমাণিত করা সম্ভব না হলেও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ধারণার বিপরীতমুখী বিভিন্ন উপপাদ্যের প্রস্তাবনা এবং গাণিতিক-পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের প্রয়াস ইতিহাসের আলোচনাকে সজীব রাখে এবং আরও অগ্রসর করে। মোকিরের ভাষায়, 'বিতর্ক তৈরির যে প্রবণতা ন-অ-ই'র রয়েছে তা সমস্যার নয়। শাস্ত্র হিসেবে অর্থনৈতিক ইতিহাসের মূল শত্রু ভুল উপসংহারে উপনীত হওয়া নয়। মূল শত্রু হলো একঘেঁয়েমি।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই শাস্ত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও ইতিহাস বিভাগের সেরা শিক্ষক এবং গবেষকদের মধ্যে জোরালো আলোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিতে সক্ষম হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই শাস্ত্রটি জীবন্ত এবং সুস্থ থাকতে পারবে (ঐ, পৃ. ২)'।

বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো, প্রথম শিল্প বিপ্লবের বহির্বৈশ্বিক সংযোগ সম্পর্কে ন-অ-ই'র কিছু বিশিষ্ট প্রবক্তা তাঁদের গবেষণা ও প্রকাশনার মাধ্যমে যে বিতর্ক তৈরি করেছেন তার পর্যালোচনা করা এবং প্রত্যুত্তর দেওয়া। বহির্বিশ্ব বলতে আমরা এখানে ইউরোপ-বহির্ভূত বিশ্বকে বোঝাতে চাই, যার মধ্যে একদিকে রয়েছে উত্তর, মধ্য, ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ও নিউজিল্যান্ড নিয়ে গঠিত 'নতুন আবিষ্কৃত বিশ্ব' (সংক্ষেপে 'নয়া বিশ্ব') এবং অন্যদিকে রয়েছে এশিয়া ও আফ্রিকা নিয়ে গঠিত 'পুরাতন বিশ্ব'। প্রথম শিল্প বিপ্লবে পুরাতন বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে সন্দেহ নেই। তবে এই ভূমিকার সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে বিতর্ক আছে, এবং সাধারণভাবে ন-অ-ই মনে করে যে, এই ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই প্রবন্ধে এই বিষয়টির প্রতি আমরা বিশেষ মনোযোগ দিব।

এই প্রবন্ধ মূল তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অনুচ্ছেদে আমরা উপরের বিষয়সমূহ সম্পর্কে ন-অ-ই ধারার গবেষকেরা যেসব মতামতে পৌঁছেছেন সেগুলো তুলে ধরব। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমরা এসব মতামতকে পূর্ববর্তী এবং মূল ধারার বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের আলোচনার আলোকে পরীক্ষা করব। এ উদ্দেশ্যে আমরা দক্ষিণের কিছু ইতিহাসবিদের আলোচনার প্রতিও মনোযোগ দিব। এই পরিবীক্ষণ ন-অ-ই ধারার গবেষকদের মতামতের সঠিকতা যাচাই করার সুযোগ দিবে। তৃতীয় অনুচ্ছেদ প্রথম শিল্প বিপ্লবের সাথে ভারতবর্ষের সংযোগের বিষয়টি আলোচনা করা হবে। বলাবাহুল্য, শিল্প বিপ্লবের ভারতবর্ষীয় সংযোগের প্রশ্নটি এই বিপ্লবের বহির্বৈশ্বিক সংযোগের অন্তর্গত একটি প্রশ্ন। অন্যদিকে, প্রথম শিল্প বিপ্লবের একটি শক্তিশালী ভারতবর্ষীয় সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে তা এই বিপ্লবের সাধারণভাবে বহির্বৈশ্বিক সংযোগের প্রস্তাবকেই প্রতিষ্ঠিত করবে।

১. বৃটিশশিল্প বিপ্লবে বহির্বিশ্বের ভূমিকা সম্পর্কে নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্যার কিছু অভিমত

নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্যায় প্রথম শিল্প বিপ্লবের বহির্বৈশ্বিক সংযোগের বিষয়টি যেসব বিতর্কের অধীনে আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে:

(ক) প্রথম শিল্প বিপ্লব সংঘটনে চাহিদা বনাম সরবরাহের ভূমিকা;
(খ) বহির্বাণিজ্য প্রথম শিল্প বিপ্লবের 'ইঞ্জিন' নাকি 'সন্তান'; এবং
(গ) শিল্প বিপ্লবে উপনিবেশের ভূমিকা।

প্রথম শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে ন-অ-ই গবেষকদের পরিবেশিত নতুন অভিমতসমূহ বোঝার একটি উপযোগী পন্থা হলে এসব বিতর্ক অনুসরণ করা। পরবর্তী তিনটি অনুচ্ছেদে আমরা তারই চেষ্টা করব।

১.১ প্রথম শিল্প বিপ্লবের কারণ হিসেবে চাহিদা বনাম যোগান

আগেই উল্লেখিত হয়েছে, ন-অ-ই ধারার গবেষকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনৈতিক ইতিহাসের আলোচনায় নবধ্রুপদী অর্থনীতির বিভিন্ন মডেলের প্রয়োগ। সুতরাং, আশ্চর্যের নয় যে, শিল্প বিপ্লবের কারণের আলোচনাতেও এই গবেষকেরা নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতির চাহিদা-যোগান কাঠামোর অবতারণা করবেন। গিলবয়ের একটি প্রবন্ধে এই বিতর্কের উৎস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে (Gilboy 1932)। এই প্রবন্ধে গিলবয় প্রথম শিল্প বিপ্লব সংঘটনে চাহিদার সম্প্রসারণের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বলাবাহুল্য, চাহিদার সম্প্রসারণের উৎস হতে পারে দুটি: অভ্যন্তরীণ (তথা দেশীয়) এবং বৈদেশিক। গিলবয়ের আলোচনা মূলত অভ্যন্তরীণ চাহিদার সম্প্রসারণের উৎস এবং প্রক্রিয়াসমূহের উপর সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি লক্ষ্য করেন যে নোলস, হবসন, এবং হ্যামন্ডসের মতো লেখকরা চাহিদা সম্প্রসারণের গুরুত্ব লক্ষ করলেও এটিকে মূলত বিদেশে খুঁজে পেয়েছেন। তবে, গিলবয় অভ্যন্তরীণ চাহিদার সাথে বৈদেশিক চাহিদার আলোচনাকে পরস্পর বিরোধী বলে গণ্য করেননি। তিনি বরং প্রথম শিল্প বিপ্লবের সাথে ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ চাহিদার সংযোগ এবং এই চাহিদার মোট পরিমাণ এবং কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনার একটি ভাল সূচনা করেন।

'শিল্প বিপ্লবে চাহিদা বনাম সরবরাহ' শীর্ষক স্বীয় প্রবন্ধে মোকির গিলবয়ের উত্থাপিত শিল্প বিপ্লবে চাহিদার গুরুত্ব সংক্রান্ত প্রস্তাবনাকে জোরালোভাবে চ্যালেঞ্জ করেন (Mokyr 1985)। তার এই চ্যালেঞ্জের মূল ভিত্তি হলো ফরাসি অর্থনীতিবিদ জ্যাঁ বাপ্তিয়াঁ সে'র আইন: 'যোগান নিজেই চাহিদা সৃষ্টি করে!' এই অবস্থান থেকে অগ্রসর হয়ে মোকির প্রথম শিল্প বিপ্লব সংঘটনে চাহিদাকে কোনও বহিঃস্থ (*এক্সোজেনাস*) ভূমিকা দিতে অস্বীকৃত হন।

লক্ষণীয়, আমাদের আগ্রহের বিষয় হলো শিল্প বিপ্লবে বৈদেশিক চাহিদার ভূমিকা। তা সত্ত্বেও কেন আমরা এখানে শিল্প বিপ্লবে দেশীয় চাহিদার ভূমিকা নিয়ে গিলবয়ের সাথে মোকিরের বিতর্কের আলোচনা করছি তা শীঘ্রই স্পষ্ট হবে। লক্ষণীয়, দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধিও বহিঃস্থ (স্বয়ম্ভূ) এবং অন্তঃস্থ (*এনডোজেনাস*) উভয় সূত্রের হতে পারে। চাহিদা সংক্রান্ত গিলবয়ের প্রস্তাবনার বিভিন্ন ব্যাখ্যাকেই মোকির পরীক্ষা করে দেখতে প্রয়াসী হন। প্রথমে তিনি ধরে নেন যে, চাহিদা বৃদ্ধির চরিত্র ছিল বহিঃস্থ। সেক্ষেত্রে তিনি প্রশ্ন করেন, এই বহিঃস্থ বৃদ্ধির কারণ কী ছিল? এ প্রসঙ্গে তিনি নিম্নরূপ তিন সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করেন: (ক) কৃষির প্রবৃদ্ধি, (খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এবং (গ) বৈদেশিক চাহিদার সম্প্রসারণ। আমরা এখানে কেবল বৈদেশিক চাহিদার সম্প্রসারণের ভূমিকা খণ্ডনের জন্য মোকির যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেন সেগুলো পরীক্ষা করে দেখবো [২]।

এই আলোচনার সাধারণত দু'টি দিক থাকে। একটি হলো তথ্য-পরিসংখ্যান এবং অন্যটি হলো ব্যাখ্যা। প্রথমটির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, আমরা আলোচনা করছি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিষয় নিয়ে, যখন মোট উৎপাদন, বিনিয়োগ, ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহের কোনও পদ্ধতিগত অনুশীলন (*প্র্যাকটিস*) গড়ে ওঠেনি। ফলে এ ক্ষেত্রে সমস্যা প্রচুর। দ্বিতীয় হলো, দেখতে হবে যে, তথ্য-পরিসংখ্যান যাই সংগ্রহ এবং উদ্ধৃত করা হোক না কেন, তার ব্যাখ্যা সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা। লক্ষণীয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থনীতির অন্যান্য বিষয়ে পরিসংখ্যানের মারাত্মক ঘাটতি থাকলেও, বৈদেশিক বাণিজ্য একটি ব্যতিক্রম ছিল। আমদানি এবং রপ্তানির পরিসংখ্যান তখনও বেশ ভালভাবেই সংগ্রহ করা হতো। বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের লভ্যতার কারণেই গবেষকদের পক্ষে ইতিপূর্বে শিল্প বিপ্লব সংঘটনে রপ্তানি সম্প্রসারণের ভূমিকা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছিল (Mantoux 1928, Hammonds 1925, Habakkuk and Deane 1967)। পরবর্তীতে,

শিল্প বিপ্লবে বৈদেশিক চাহিদার ভূমিকার সমালোচকরা বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যানের অধিকতর লভ্যতাকেই স্বীয় অবস্থানের পক্ষে একটি যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁরা বলেন যে, যেহেতু অর্থনীতির অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য লভ্য ছিল না, পক্ষান্তরে বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য লভ্য ছিল, সেহেতু শিল্প বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধানে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছিল।

তথ্য-পরিসংখ্যান এবং তার ব্যাখ্যা উভয় বিষয়েই মোকির বক্তব্য রাখেন। প্রথমে তিনি রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তন থেকে সরবরাহের পরিবর্তনকে আলাদা করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি লক্ষ করেন যে, শিল্প বিপ্লবের ফলে বৃটিশ শিল্পে এবং আন্তর্জাতিক পরিবহনে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে বৃটেন যেসব পণ্য রপ্তানি করছিল সেগুলোর দাম বিদেশে কমে যায় এবং চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, বৃটিশপণ্যের বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি কোনো স্বাধীন বিষয় ছিল না, তার পেছনেও কাজ করেছে বৃটেনে সংঘটিত উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন যে, সম্ভবত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবহন এবং লেনদেন খরচ হ্রাসের কারণে বিভিন্ন দেশের আপেক্ষিক সুবিধা আরও ভালভাবে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ পায় এবং তার ফলে বিশ্বব্যাপী মোট উৎপাদন এবং রপ্তানি উভয়ই বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, মোট আয়ের তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধির হার বেশী হওয়ায় দেশসমূহের মোট আয়ের অনুপাত হিসেবে রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়[৩]। এভাবে মোকির প্রথম শিল্প সংঘটনে বৈশ্বিক চাহিদা বৃদ্ধির বহিঃস্থ চরিত্রের দাবী খণ্ডন করেন বলে মনে করেন।

মোকিরের বাকি যুক্তিগুলি ছিল তথ্য-পরিসংখ্যানগত। তিনি স্বীকার করেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামষ্টিক অর্থনীতি সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি থাকতে পারে (Mokyr 1985, পৃ. ১০০)। কিন্তু তারপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, ম্যাকফারসন প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মোট অভ্যন্তরীণ ভোগের অনুপাত হিসাবে রপ্তানির পরিমাণ ছিল স্বল্প (McPherson 1805)। তিনি মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে শিল্পোৎপাদনের অনুপাত সংক্রান্ত শ্লোটে'র সূচকের বরাত দিয়ে জানান যে, এই সূচকের মান অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ৫০-এর সামান্য উপরে ওঠে এবং ১৭৬০-এর দশকে লাফ দিয়ে ৬৫তে পৌঁছায় (ভিত্তি বছর ১৯১৩ সালে এই সূচকের মান ছিল ১০০)। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর বাকী সময় ধরে এই সূচকের গড় মান হয় ৫৪ এবং নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ (১৮০৩) থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত এর গড় মান হয় ৫৫ (Schlote

1952, পৃ. ৫১)। লক্ষণীয় যে, মোকির অস্বীকার করতে পারেন না যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশকে – যখন কিনা বৃটেনের বস্ত্রশিল্পে মৌলিক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হয়েছিল তখন – বৃটেনের রপ্তানি সূচকে নাটকীয় উল্লম্ফন ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও মোকির পরবর্তী সময়কালে শ্লোটের সূচকের স্থিতিশীলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বৃটিশ শিল্প বিপ্লব সংঘটনে রপ্তানি বৃদ্ধির ভূমিকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন (Mokyr 1985, পৃ. ১০০)[৪]।

চিত্তাকর্ষক যে, মোকির এমনকি সুনির্দিষ্টভাবে বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের বিকাশেও রপ্তানি বৃদ্ধির কোনো প্রভাব খুঁজে পান না। তাঁর ভাষায়, 'এমনকি বস্ত্রের ক্ষেত্রেও বৃটেনে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে রপ্তানির সম্পর্ক তেমন জোরালো নয় (ঐ)'। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি জানান যে, রপ্তানি-সঞ্জাত প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রতিপাদ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের একটি মোটা দাগের মানদণ্ড হলো বস্ত্রশিল্পের প্রবৃদ্ধির সাথে মোট উৎপাদনে রপ্তানির অংশের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্কের উপস্থিতি। কিন্তু তাঁর মতে ১৭৫০-১৮২৯ সময়কালের জন্য বস্ত্র উৎপাদন (বস্ত্রের মোট ভোগ দ্বারা অনুমিত) বৃদ্ধির পঞ্চবার্ষিক হারের সাথে মোট উৎপাদনের রপ্তানিকৃত অংশের 'সহসম্পর্কের সহগ' (*কোররিলেশান কোএফিশিয়েন্ট*) পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয় (ঐ)[৫]।

মোকির স্বীকার করেন যে, চাহিদা-তত্ত্বের গতিশীল ব্যাখ্যায় (উদ্ভাবন, উৎপাদনশীলতার উন্নতি, ইত্যাদি দ্বারা সংঘটিত) সরবরাহ রেখার স্থান-পরিবর্তন (*শিফট*)-কেই চাহিদা বৃদ্ধির একটি ফলশ্রুতি (অথবা প্রভাবিত পরিণতি) হিসাবে দেখা যেতে পারে। তবে, এ প্রসঙ্গে তিনি আবারও 'আদি কারণ' (*প্রাইমাম মোবাইল*, অর্থাৎ, চাহিদার আদি বৃদ্ধি ব্যাখ্যা)'র সমস্যাটি সামনে আনেন। চাহিদার কিছু বৃদ্ধি হলেও তা মোকিরের দৃষ্টিতে বৃটেনের বস্ত্রশিল্পে সংঘটিত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলি (শিল্প বিপ্লবের মূল কথা) ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট ছিল না[৬]। অধিকিন্তু, তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমের সাথে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, চাহিদা-সঞ্জাত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রস্তাবটি সত্য হলেও তা বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের জন্য কাজ করেনি, কারণ হয় এসব উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজার ছিল না (এ ধরণের অভিযোগ রয়েছে) অথবা এই বাজার গুরুতরভাবে 'বহির্প্রভাব' (*এক্সটারনালিটি*), অনিশ্চয়তা, অথবা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনসমূহের দ্রুতই

সকলের জন্য লভ্য হয়ে ওঠা, ইত্যাদি 'বাজার-ব্যর্থতা' দ্বারা আকীর্ণ ছিল (ঐ)।

সব মিলিয়ে, মোকির শিল্প বিপ্লব সংঘটনে চাহিদাকে যোগানের সমপর্যায়ের ভূমিকা দিতেও প্রস্তুত নন। তাঁর মতে, শিল্প বিপ্লবে চাহিদা এবং যোগান সমান ভূমিকা রেখেছে বলে প্রচলিত যে ধারণা রয়েছে তা ভিত্তিহীন। শিল্প বিপ্লব 'কখন,' 'কোথায়' এবং 'কত দ্রুত' সংঘটিত হয়েছিল তা নির্ধারণ করার জন্য প্রথমে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যোগান সংক্রান্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন, চাহিদা সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলি নয় (ঐ)।

শিল্প বিপ্লবে চাহিদার ভূমিকা সম্পর্কে মোটামুটি একই ধরণের মতামত প্রকাশ করেন ম্যাকক্লোস্কি। তিনি সেটা করেন তাঁর '*দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন ১৭৮০-১৮৬০: এ সার্ভে*' শীর্ষক প্রবন্ধে (McCloskey 1981)। ম্যাকক্লোস্কির আলোচনাও চাহিদা-যোগান কাঠামোতে সংগঠিত হয়েছিল এবং শুরুতেই তিনি রায় ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ শিল্প বিপ্লব আর যাই হোক চাহিদা বৃদ্ধির ফলশ্রুতি ছিল না (ঐ, পৃ. ৬৮)। এই উপসংহার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ম্যাকক্লোস্কি মোটামুটি সেসব বিষয়েরই আলোচনা করেন যা আমরা উপরে মোকিরকে করতে দেখেছি (যেমন, বিদেশী চাহিদার পরিমাণগত তাৎপর্যের ঘাটতি, শিল্পায়ন-পূর্ব বৃটেনে সম্পদ ব্যবহারের শিথিলতার সম্ভাবনা, চাহিদা-সঞ্জাত উদ্ভাবন, অর্থনীতির আকারজনিত অভিঘাত (*ইকনমিজ অফ স্কেল*), ইত্যাদি)। ম্যাকক্লোস্কির উপসংহারসমূহও মোটামুটি মোকিরের উপসংহারের অনুরূপ ।

সুতরাং, আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে উদীয়মান যোগান-নির্ভর অর্থনীতি শাস্ত্রধারার প্রভাব অর্থনৈতিক ইতিহাসেও বিস্তৃত হয়। এই তরঙ্গে প্রথম শিল্প বিপ্লবে চাহিদা বৃদ্ধির কোনো ধরনের সূচনাকারী ভূমিকা অস্বীকার করা হয়। বলাবাহুল্য, একইসাথে বৈদেশিক চাহিদার কোনো সূচনাকারী ভূমিকাও অস্বীকৃত হয়েছিল। এসব প্রস্তাবনা কতখানি সঠিক তা আমরা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পরীক্ষা করবো।

১.২ বাণিজ্য – শিল্পায়নের 'ইঞ্জিন' নাকি 'সন্তান'?

উপরিল্লিখিত তিনটি বিতর্ক যে পরস্পর সম্পর্কিত তার কিছু প্রতিফলন আমরা উপরের উপঅনুচ্ছেদে ইতিমধ্যেই পেয়েছি। সেখানে আমরা

বর্তমান অনুচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়ের কিছু পূর্বারম্ভেরও সাক্ষাৎ পেয়েছি। তবে, এ বিষয়ে সবচেয়ে জোরালো আলোচনা উপস্থাপন করেন থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি (১৯৮১)। মোকিরের বিপরীতে, থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি সুনির্দিষ্ট শিল্পের (বিশেষ করে, বস্ত্র শিল্পের)[৮] প্রবৃদ্ধির জন্য বিদেশী বাণিজ্যের গুরুত্ব স্বীকার করেন, তবে তাদের লক্ষ্য হয় শিল্প বিপ্লবের সময় অর্থনীতির সম্প্রসারণে বৈদেশিক বাণিজ্যের 'কেন্দ্রীয় গুরুত্ব' (Dean and Cole 1967, পৃ. ৮৩) সংক্রান্ত প্রস্তাবনাকে খণ্ডন করা ।

উপরের অনুচ্ছেদের মতো পুনরায় আমরা মূলত দুই দিকের আলোচনা দেখি। একটি হলো তথ্য-পরিসংখ্যানগত এবং অন্যটি হলো এগুলোর ব্যাখ্যা সম্পর্কিত[৯]। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ বিবেচনা করার পর থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি একমত হন যে, এই শতাব্দীর শুরুর তুলনায় শেষের দিকে বৈদেশিক বাণিজ্য অনেক দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল (ঐ, পৃ. ৯০)। এ প্রসঙ্গে তাঁরা ডিন এবং কোলের অনুমান উদ্ধৃত করে জানান যে, এ সময়ে রপ্তানিমুখি শিল্পসূচক ১০০ থেকে ১৫২-তে বৃদ্ধি পেয়েছিল (ঐ)[১০]। থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি উল্লেখ করেন যে, দেশে শিল্পের এবং বিদেশে বাণিজ্যের সমান্তরাল সম্প্রসারণ এই ধারণার জন্ম দিয়েছে যে, বাণিজ্য ছিল 'প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন'। তাঁরা এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করতে চান[১১]।

থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি লক্ষ্য করেন যে, বাণিজ্য দু'টি উপায়ে প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করে বলে ধারণা করা হয়। একটি হলো যে, বাণিজ্য শিল্পপণ্যের জন্য বাজার সরবরাহ করে[১২]। এই ভূমিকার মূল্যায়নে থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি নিম্নরূপ কয়েকটি যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করেন যে; 'বৈদেশিক বাণিজ্য বৃটিশ শিল্পের বিকাশের জন্য তেমন মুনাফা সৃষ্টি করে না'। প্রথমত, তাঁরা দাবি করেন যে, উপনিবেশগুলি উপনিবেশ-অধিকারী দেশসমূহের জন্য আদৌ লাভজনক কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে (ঐ, পৃ. ৯৯)[১৩]। দ্বিতীয়ত, তাঁরা দাবি করেন যে, এমনকি দাস ব্যবসাও লাভজনক ছিল না, কারণ, আগ্রহী ক্রেতারা প্রতিযোগিতার প্রতিটি পর্যায়ে দাসদের বাজার দামকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেত যে, দাস কিনে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হতো। তাঁদের মতে দাস বাণিজ্য-সৃষ্ট অর্থনৈতিক (স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত) লাভ মূলত আফ্রিকায় নষ্ট হত, এবং বৃটেনের শিল্পে ফিরিয়ে আনা হতো না (ঐ, পৃ. ৯৯-১০০) [১৪]।" তৃতীয়ত,

তারা যুক্তি দেন যে, বিভিন্ন যুদ্ধ বিভিন্ন দেশের সাথে বৃটেনের বাণিজ্য ব্যাহত কিংবা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তা বৃটেনের অগ্রগতির জন্য এসব দেশের বাণিজ্যের অপরিহার্যতা যাচাইয়ের এক ধরনের প্রাকৃতিক পরীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিল। যেমন, আমেরিকান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমেরিকার সাথে বৃটেনের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে, নেপোলিয়নের যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ইউরোপের সাথে বৃটেনের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কির মতে এসব অভিজ্ঞতা দেখায় যে, বৃটেনের শিল্পের উত্থানের জন্য এসব বাণিজ্যের কোনোটিই অপরিহার্য ছিল না। চতুর্থত, সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করার জন্য তাঁরা তৃতীয় যুক্তিটি আরও সম্প্রসারিত করেন। অর্থনীতি শাস্ত্রে যে 'প্রতিস্থাপনের নীতি' রয়েছে সেটাকে তাঁরা অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান। তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, সবকিছুই প্রতিস্থাপনযোগ্য। যেমন বৃটিশ রপ্তানির ক্ষেত্রে ইউরোপ এবং নতুন বিশ্বের মধ্যে বিভাজন প্রতিস্থাপনযোগ্য। এমনকি বৃটিশ উৎপাদনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে রপ্তানি এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবহার প্রতিস্থাপনযোগ্য। ফলে রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য আকর্ষণীয়, কিন্তু তা বৃটিশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ নয় (ঐ, পৃ. ১০০)। থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি এই যুক্তিটিকে প্রায় দর্শনের পর্যায়ে নিয়ে যান এবং অভিমত প্রকাশ করেন যে, রপ্তানি আপনা থেকেই একটি ভাল জিনিস নয়। তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সমাপ্তি উৎপাদনে নয় বরং ভোগে (ঐ, পৃ. ১০১)। এই আলোচনার শেষে তাঁরা এই বলে উপসংহার টানেন যে, বৃটিশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে রপ্তানির কোনো সূচনামূলক ভূমিকা ছিল না। এখানে তারা রপ্তানির বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে চাহিদা এবং যোগান রেখার স্থান পরিবর্তনকে পৃথক করার পূর্বোল্লিখিত প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করে লক্ষ করেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ বাণিজ্যের শর্তাবলীর (*টার্মস অফ ট্রেড*) অবনতি ঘটেছে এবং তা প্রমাণ যে, রপ্তানি বৃদ্ধি বহুলাংশে যোগান বৃদ্ধির দ্বারাই অর্জিত হয়েছিল[১৫]।

পরিশেষে, থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি কিছু গাণিতিক সূত্র প্রদান করে দেখান যে, প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে বাণিজ্যের শক্তি তেমন বেশি ছিল না। তাঁদের মতে, বিদেশ থেকে বর্ধিত চাহিদার কারণে কিছু লাভ হয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বিশাল বৃদ্ধির তুলনায় – ছয় দশকে দ্বিগুণ হওয়া – সেগুলো ছিল খুবই কম। বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত লাভ

কখনোই জাতির অর্থনৈতিক শক্তিতে বিপ্লব আনেনি। অবশেষে, তারা এই বলে তাঁদের উপসংহার ঘোষণা করেন যে, 'শিল্পায়নে বাণিজ্যিক বিপ্লবের কিছু ভূমিকা ছিল, তবে খুবই নগণ্য। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে স্পষ্ট হতে শুরু করে যে, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং দেশে শিল্পের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রভাব ছিল শিল্পায়ন থেকে বাণিজ্যের উপর, বিপরীত দিকে নয়। বাণিজ্য শিল্প বিপ্লবের জন্ম দেয় নি; বরং, বাণিজ্য ছিল শিল্পের সন্তান (ঐ, পৃ. ১০২)'। আমরা শীঘ্রই থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কির এই যুক্তিগুলিতে ফিরে আসব।

১.৩ প্রথম শিল্প বিপ্লবে সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশের ভূমিকা: গুরুত্বপূর্ণ নাকি নগণ্য?

প্রথম শিল্প বিপ্লবে উপনিবেশসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে সবচেয়ে বিতর্ক-উদ্রেককারী সিদ্ধান্তও এসেছে থমাস এবং ম্যাকক্লস্কির (১৯৮১) কাছ থেকে। আমরা ইতিপূর্বে নতুন বিশ্বের দাস-ভিত্তিক খামার (*প্ল্যানটেশন*) সমূহের লাভজনকতা সম্পর্কে তাদের মতামতের সাথে পরিচিত হয়েছি। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বৃটিশ শিল্প বিপ্লবে উপনিবেশের ভূমিকা সংক্রান্ত থমাস এবং ম্যাকক্লস্কির আলোচনা শুধুমাত্র আমেরিকান মহাদেশ এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ উপনিবেশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। শিল্প বিপ্লবের আলোচনায় ভারতীয় উপমহাদেশ, যার অনুসন্ধানে ইউরোপীয়রা আমেরিকান মহাদেশ আবিষ্কার করেছিল, তাকে অন্তর্ভুক্ত করার যেন কোনো প্রয়োজন নেই বলে মনে হয়! যেহেতু এই প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদের আলোচনা শিল্প বিপ্লবে ভারতের ভূমিকার উপর নিবদ্ধ হবে, সেহেতু এখানে আমরা সে বিষয়ে যেতে চাই না। তার পরিবর্তে আমরা প্রথম শিল্প বিপ্লবে নতুন বিশ্বে বৃটিশ অধিকৃত উপনিবেশসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে থমাস এবং ম্যাকক্লস্কি যেসব বক্তব্য উত্থাপন করেছেন শুধু তার প্রতি নজর দেব।

প্রথমত, থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কিকে লক্ষ করতে হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূগোলের মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যের পরিবর্তে তা ধাবিত হয় দূরে অবস্থিত দেশ এবং উপনিবেশের দিকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে বৃটেনের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনসূত্রের রপ্তানির প্রায় ৮৫

শতাংশের গন্তব্যস্থল এবং বৃটেনের অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্য আমদানির প্রায় ৬৭ শতাংশের উৎপত্তিস্থল ছিল ইউরোপ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ এই সূচকগুলি যথাক্রমে মাত্র ৩০ এবং ৪২ শতাংশে হ্রাস পায়। বৃটেন ইউরোপে তার পুনঃরপ্তানি অব্যাহত রেখেছিল, তবে এগুলো ছিল বহুলাংশে ঔপনিবেশিক দেশসমূহ থেকে সংগৃহীত পণ্যের পুনঃরপ্তানি, যা থেকে অর্জিত লাভ বৃটেন ইউরোপ থেকে তার আমদানির অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করতো। বলাবাহুল্য, উপনিবেশগুলির সাথে বৃটেনের বাণিজ্য কোনভাবেই 'মুক্ত বাণিজ্য' ছিল না এবং থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি নিজেরাই বর্ণনা করেন কীভাবে জটিল শুল্কহার এবং বিভিন্ন নৌপরিবহণ (*নেভিগেশন*) আইন এই বাণিজ্যকে এমন রূপ দেয় যা স্পষ্ট করে যে, 'গোটা আটলান্টিক সাম্রাজ্য মাতৃভূমি বৃটেনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত'।

শিল্প বিপ্লবে উপনিবেশের ভূমিকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি নিম্নলিখিত দু'টি করণীয় গ্রহণ করেন: (ক) নৌপরিবহণ আইন দ্বারা উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলির উপর যে অর্থনৈতিক বোঝা আরোপিত হয়েছিল তা পরিমাপ করা এবং (খ) বৃটেনের জন্য উপনিবেশগুলি (যার দ্বারা থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি ক্যারিবিয়ান সাগরে এবং এর তীরে অবস্থিত বৃটিশ অধিকৃত এলাকাসমূহকে বোঝান) বাবদ খরচ এবং এগুলো থেকে অর্জিত সুবিধাগুলি পরিমাপ করা। উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলি সম্পর্কে ইতিপূর্বে সম্পাদিত বিকল্পঅনুমাননির্ভর (*কাউন্টারফ্যাকচুয়াল*) অনুশীলনের ফলাফলের ভিত্তিতে থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি উত্তর আমেরিকান উপনিবেশসমূহের জন্য উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কারণ হয়নি (ঐ, পৃ. ৯৫)'। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, তাঁদের মতে, বৃটিশ শাসনসূত্রে প্রাপ্ত সুরক্ষা (প্রতিরক্ষা) এবং পরিশাসনের সুবিধাগুলি যদি আদায়কৃত কর ও অন্যান্য আর্থিক আয় থেকে বিয়োগ করা হয় তাহলে উপনিবেশগুলির জন্য নিট বোঝা ছিল খুব কম – সম্ভবত, ১৭৭০ সালে এসব উপনিবেশের মোট আয়ের ০.২৫ শতাংশের মতো এবং কোনোভাবেই এক শতাংশের বেশি নয় (ঐ, পৃ. ৯৬-৯৭)। থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি'র হিসাব অনুযায়ী উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলি থেকে বৃটেন যে আর্থিক সুবিধা পেয়েছিল তার পরিমাণ ছিল বার্ষিক সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ পাউন্ড। পক্ষান্তরে, উপনিবেশগুলির প্রতিরক্ষার জন্য বৃটিশ করদাতাদের খরচ ছিল বার্ষিক প্রায় ৪,০০,০০০ পাউন্ড, অর্থাৎ সর্বোচ্চ

লাভের প্রায় পাঁচ গুণ। এর সাথে ফরাসিদের হাত থেকে এই উপনিবেশগুলিকে রক্ষা করার জন্য 'সাত বছরের যুদ্ধে' এবং অবশেষে 'আমেরিকান স্বাধীনতা যুদ্ধে' বৃটেনকে যে বিশাল খরচ বহন করতে হয়েছিল তা যোগ করা যেতে পারে। এই সমস্ত কিছু থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কিকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে, 'উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলি বৃটেনের জন্য কোনো লাভজনক বিষয় ছিল না (ঐ, পৃ. ৯৭)'।

ক্যারিবিয়ান সাগরের উপনিবেশসমূহ সম্পর্কে থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি এ বিষয়ে থমাস (Thomas 1965) এবং কোয়েলহোর (Coelho 1973) বিকল্পঅনুমানভিত্তিক অনুশীলনের উল্লেখ করেন। থমাসের মতে, বৃটেনের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ লাভের উৎস হওয়ার পরিবর্তে বছরে ৬,০০০ পাউন্ডেরও বেশি ক্ষতির কারণ হয়েছিল (Thomas and McCloskey 1981, পৃ. ৯৮)। একইভাবে, কোয়েলহোর গণনা দেখায় যে, একদিকে, বিশ্বমূল্যের চেয়ে বেশি দামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে আমদানির কারণে ইংরেজ ভোক্তাদের বছরে ১৫ লক্ষ পাউন্ডের বেশি খরচ হয়েছিল (কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে আমদানিতে অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল)[১৬], অন্যদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজে তার রপ্তানি থেকে বৃটেন কোনও অতিরিক্ত সুবিধা পায়নি কারণ বৃটিশ শিল্প 'পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতামূলক' ছিল। অধিকন্তু, বৃটিশ সরকারকে এই উপনিবেশগুলিকে সুরক্ষা প্রদান ও পরিশাসনের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় করতে হয়েছিল। থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কির ভাষ্য অনুযায়ী, এর ফলে ক্যারিবিয়ান সাগরের অধিকৃত উপনিবেশগুলির জন্য ইংল্যান্ডের বার্ষিক দশ লক্ষ পাউন্ডেরও বেশি খরচ হয়েছিল, যা বৃটিশ সরকারের মোট রাজস্বের দশ শতাংশেরও বেশি ছিল (ibid)[১৭]। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা অন্যান্য বিষয়ের সাথে শিল্প বিপ্লবে উপনিবেশসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্যার এসব বিতর্ক-উদ্রেককারী উপসংহার ও মতামতের যথার্থতা পরীক্ষা করব।

২. শিল্প বিপ্লবের বৈদেশিক সংযোগ সম্পর্কে 'নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসে'র দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন

শিল্প বিপ্লবের বৈদেশিক সংযোগ সম্পর্কে প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন উপসংহার বিশ্লেষণের জন্য আমরা নিম্নরূপে

অগ্রসর হব। প্রথমত, আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত তিন-প্রশ্নের কাঠামো (*ফরম্যাট*) অনুসরণ করবো। দ্বিতীয়ত, প্রথম অনুচ্ছেদের মতো এই অনুচ্ছেদেও আমরা বহুসংখ্যক গবেষকের কাছ থেকে তথ্য এবং উদ্ধৃতি সংগ্রহ করার পরিবর্তে কিছু মৌলিক গবেষকের প্রতি মনোযোগী হবো এবং অন্যদের কথা কেবল প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করব। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম অনুচ্ছেদে যেমন ছিলেন মোকির, ম্যাকক্লোস্কি, এবং থমাস, তেমনি এই অনুচ্ছেদে থাকবেন ম্যান্টোক্স, হবসবউম, এবং কোল। সুবিদিত যে, এদের মধ্যে কোল (ডিনের সহযোগে) পরিসংখ্যানগত কাজের মাধ্যমে নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসের অনেকের আলোচনার জন্য মৌলিক তথ্যভাণ্ডার সরবরাহ করেছিলেন (Dean and Cole 1969)।

বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে ম্যান্টক্সের (Mantoux 1928) গ্রন্থকে এই বিপ্লবের 'সবচেয়ে বিস্তারিত' (Hartwell 1965, পৃ. ৫) এবং 'সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং চিন্তাশীল' (Flin 1967, পৃ. ৪) বর্ণনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ম্যান্টক্সের বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় ইতিহাসবিদ টি. এস. অ্যাশটন উপর্যুক্ত মূল্যায়নের সাথে একমত পোষণ করে লিখেন যে, স্থাপত্য কাঠামো এবং বিশদতা উভয় দিক থেকেই (ম্যান্টক্সের) গ্রন্থটি বৃটিশ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে যেকোনো ভাষায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাথমিক পরিচয়দানকারী (Ashton 1948, পৃ. ৫)। হবসবয়ম বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের বৈদেশিক সংযোগের প্রশ্নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার কৃতিত্বের অধিকারী (Hobsbawm 1968, 1962)। তবে কোল, ডীন, ম্যান্টক্স, এবং হবসবয়মের উপর মূলত নির্ভর করলেও এই অনুচ্ছেদের আলোচনাক্রমে আমরা অন্যান্য লেখকদেরও শ্মরণাপন্ন হবো। এছাড়া, আমরা দক্ষিণের গবেষকদের আলোচনারও উল্লেখ করবো। তাদের মধ্যে রয়েছেন যেমন উইলিয়ামস (Williams 1944), ইনিকোরি ফনি (Inikori 2005) এবং ফ্রাঙ্ক (Frank 2005)।

২.১ বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের কারণ হিসেবে চাহিদা এবং যোগানের ভূমিকার পুনর্বিবেচনা

শিল্প বিপ্লব সংঘটনে বৈদেশিক চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, এই অভিমতের (সংক্ষেপে 'চাহিদা-তত্ত্বে'র) বিরুদ্ধে যথেষ্ট সংশয় সৃষ্টি

করেছেন বলে মোকিরের দাবীর প্রেক্ষিতে এ প্রসঙ্গে কোল (১৯৮১)-এর আলোচনা স্মরণ করা যেতে পারে। কোলের এই আলোচনার মূল অংশটি ১৭০০-৮০ সময়কালে বৃটেনের অভ্যন্তরীণ বাজারের কাঠামো এবং বিবর্তনের বিশ্লেষণের উপর নিবদ্ধ ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, কোলের এই গবেষণা ইতিপূর্বে গিলবয় কর্তৃক সূচনাকৃত এবং প্রস্তাবিত কাজের ধারায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ছিল। সাধারণভাবে চাহিদার ভূমিকার উপর জোর দেওয়া এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদার বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করতে যেয়ে কোল শিল্প বিপ্লবে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক চাহিদার আপেক্ষিক গুরুত্ব সংক্রান্ত বিতর্কের উপর মনোযোগ না দিয়ে পারেননি। তাঁর এই আলোচনা প্রথম অনুচ্ছেদে আলোচিত তথ্য-প্রমাণ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। দেখা যায় যে, প্রথমত, অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটিশ জাতীয় আয়ের অনুমানের সংশোধন সত্ত্বেও, বৈদেশিক বাণিজ্য অবশ্যই সামগ্রিক অর্থনীতির তুলনায় অনেক দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে[১৮]। বিশেষত, এই শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে বৃটেনের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল[১৯]। দ্বিতীয়ত, এই দশকগুলিতে বৃটেনের বাণিজ্যের শর্তাবলীর (অর্থাৎ, বৃটেনের আমদানিকৃত পণ্যের দামের তুলনায় রপ্তানিকৃত পণ্যের দামের) পতন ঘটেনি। বরং, এই সময়কালে বাণিজ্যের শর্তাবলী বৃটেনের পক্ষে চলে গিয়েছিল। অতএব, এই পর্যায়ে রপ্তানি বৃদ্ধির পিছনে সরবরাহের পরিবর্তনের ভূমিকা প্রধান ছিল না[২০]। তৃতীয়ত, যদিও মোট জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসাবে সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্য এবং রপ্তানি বড় নাও হতে পারে (বর্তমান রপ্তানি-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশগুলির তুলনায়), বৃটেনে শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাতকারী শিল্পের বিকাশের জন্য বৈদেশিক চাহিদার বৃদ্ধি নির্ধারক গুরুত্বের অধিকারী ছিল[২১]। চতুর্থত, বৃটিশ রপ্তানির জন্য বিদেশী চাহিদা বৃদ্ধির একটি বহিঃস্থ (*এক্সোজেনাস*) চরিত্র ছিল এবং তা কেবল 'অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি শৃঙ্খলের একটি সংযোগ (*লিংক*)' কিংবা 'আমদানি-প্রসূত অগ্রগতি' ছিল না। পঞ্চমত, এই 'নেতৃস্থানীয়' শিল্প থেকে উদ্ভূত সংযোগসমূহই বৃটেনে শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং জায়মান রেখেছিল[২২]।

এ সমস্ত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে কোল এই দ্বিধাহীন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, বৃটেনের শিল্প বিপ্লবের জন্য বৈদেশিক চাহিদার সম্প্রসারণ নির্ধারক প্রেরণা জোগায়। তিনি একটি বিপরীতমুখী কাল্পনিক প্রশ্নও উত্থাপন করেন:

যদি বৃটেন ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং সুদূর প্রাচ্যের বাজার এবং সরবরাহের উৎস থেকে বঞ্চিত একটি বদ্ধ-অর্থনীতি হতো, তাহলে কি হতো? তাঁর মতে এই প্রশ্নের উত্তর হলো: 'একটি শিল্পায়িত দেশ হওয়ার পরিবর্তে এই পথে ইংল্যান্ডের যাত্রাই শুরু হতো না' (Cole 1981, পৃ. ৪২)। কোল আরও উল্লেখ করেন যে, বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত লাভ হিসাবে না নিয়েই এই উপসংহারে উপনীত হতে হয় এবং যোগ করেন যে, বিদেশে বিক্রয়ের সুযোগ কেবল বৃটেনের শিল্পপণ্যের বাজারই বৃদ্ধি করে না, এমনকি বৃটেনের অভ্যন্তরীণ বাজারও এই লাভজনক রপ্তানি বাণিজ্যের দ্বারা স্ফীত হয় (ঐ)। সুতরাং, কোলের মতে, বৈদেশিক বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির একটি সংযোগ ছিল না; বরং, অভ্যন্তরীণ চাহিদাই বৈদেশিক চাহিদার উপর নির্ভরশীল এবং এর দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল। বিষয়টি আরও পরীক্ষার পর কোল এই উপসংহারে পৌঁছান যে, 'বৃটেনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বাণিজ্যের গুরুত্ব যাই হোক না কেন, শিল্পায়িত দেশ হিসেবে তার আদি উত্থানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্য যে একটি প্রধান এবং সম্ভবত নির্ধারক কারণ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করার খুব কম কারণ আছে (ঐ)'।

উপরের আলোচনায় বৈদেশিক চাহিদার বিষয়টি বরাবর বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়াজড়ি করে বিরাজ করেছে এবং কোলের সদ্যউদ্ধৃত উপসংহারটি আমাদের পূর্বোল্লিখিত দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রসঙ্গে সরাসরিভাবে নিয়ে এসেছে। আমরা পরবর্তী উপ-অনুচ্ছেদে এই বিতর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনা করবো, তবে এখানে আমরা লক্ষ করতে পারি যে, বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের অনুঘটক হিসেবে বৈদেশিক চাহিদার গুরুত্বকে অস্বীকার করার জন্য মোকির যেসব যুক্তি দিয়েছিলেন তার বেশিরভাগই কোলের আলোচনার আলোকে সঙ্গত মনে হয় না।

২.২ 'বাণিজ্য শিল্পের ইঞ্জিন নাকি সন্তান' বিতর্কের পুনর্বিবেচনা

বিস্ময়কর যে, আমরা এখন যে প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করছি ম্যানটক্স প্রায় এক শতাব্দী আগে সেগুলো শুধু সঠিকভাবে সূত্রবদ্ধই করেননি বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলোর সঠিক উত্তরও দিতে পেরেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি দেখান যে, বাণিজ্য শিল্পের ইঞ্জিন নাকি সন্তান, এই বিতর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কালাক্রম (*ক্রোনোলজি*)। এর সাথে সমান্তরালভাবে সম্পর্কিত হলো বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের 'সূচনা' এবং

'পরবর্তী প্রভাব ও বিস্তৃতি'র মধ্যকার পার্থক্য। থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সময় এই পার্থক্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এমন নয়। তবে তাঁরা দাবি করছিলেন যে, বৃটেনের শিল্পায়ন সূচিত করার ক্ষেত্রেও বাণিজ্যের ভূমিকা ছিল না। কিন্তু এই দাবির সমর্থনে তারা যে প্রমাণ পেশ করছিলেন তা হলো মূলত ঊনিশ শতকে বৃটিশ বৈদেশিক বাণিজ্য শর্তাবলীর পতন। অথচ আমরা জানি যে, মোকির এবং ম্যাকক্লোস্কি কর্তৃক বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত 'ভালো গ্যাজেটে'র আবিষ্কার এবং 'উদ্ভাবনা শক্তির প্রস্ফুরণ' সংঘটিত হয়েছিল মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। আমরা কোল উপস্থাপিত তথ্য-প্রমাণ থেকে দেখেছি যে, সে সময় বৈদেশিক বাণিজ্যের শর্তাবলী (আমদানিকৃত পণ্যের দামের তুলনায় রপ্তানিকৃত পণ্যের দাম) বরং বৃটেনের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়।

বাণিজ্য এবং শিল্পায়নের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের গতিময়তা সম্পর্কে ম্যানটক্সের খুব প্রখর ধারণা ছিল। তিনি জোর দিয়েছিলেন এবং বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, শিল্পায়ন সংঘটিত হওয়ার পর শিল্প বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। তবে তিনি খুব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, শিল্পায়নের আগে উপযুক্ত বাজার, চাহিদা, এবং বাণিজ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলে শিল্পায়নের সূচনা সম্ভব ছিল না। ম্যানটক্স সেজন্য জোর দেন যে, বাণিজ্য বিপ্লব (যা বাস্তবে শিল্প বিপ্লবের আগে সংঘটিত হয়ছিল) 'একটি ছোট ভূমিকা' পালন করেনি, যেমনটা থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি দাবী করেন। বরং, বাণিজ্য বিপ্লব ছিল শিল্প বিপ্লবের একটি 'প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত'। ম্যান্টক্সের ভাষায়, 'সে সময় বাণিজ্যিক বিকাশ সংঘটিত হওয়ার আগে শিল্পের অগ্রগতি প্রায় অসম্ভব ছিল' (Mantoux 1928, পৃ. ৯১)। বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেন, 'শিল্পের পীঠস্থান হওয়ার অর্ধ শতাব্দী আগে ইংল্যান্ড একটি বড় বাণিজ্যিক দেশ হয়ে উঠেছিল। সে দেশে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ আগে সংঘটিত হয় এবং পরে তা শিল্প বিপ্লবকে সম্ভব করে তোলে' (ঐ, পৃ. ৯২)[২৩]।

ম্যানটক্স সচেতন ছিলেন যে, বাণিজ্যিক বিপ্লব সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য তখনও বৃটেনের মোট অর্থনীতির একটি তুলনামূলকভাবে ছোট অংশ ছিল। সুতরাং, পাটিগণিতের ভিত্তিতে (যেমনটি আমরা থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কিতে দেখেছি) যুক্তি উত্থাপন করা সম্ভব ছিল যে, শিল্পায়নে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকা নগণ্য ছিল। কিন্তু

এই যুক্তির খণ্ডনেও ম্যানটক্স বেশ আধুনিকতার পরিচয় দেন। স্পষ্টতই, ১৯১০ সালে তিনি কেইন্স কর্তৃক ১৯৩৭ সালে প্রবর্তিত 'গুণক' (*মাল্টিপ্লায়ার*) এবং পঞ্চাশের দশকে হার্শম্যান কর্তৃক প্রবর্তিত 'সংযোগ প্রভাব' (*লিংকেজ এফেক্ট*), ইত্যাকার ধারণা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাননি, তবে তাঁর মতো করে এবং তাঁর কাছে সেসময় লভ্য ধারণা এবং ভাষা ব্যবহার করে, ম্যানটক্স মূলত এই ধারণাগুলিই তুলে ধরেছিলেন যা আমরা কোলকেও করতে দেখি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখি যে, শিল্প বিপ্লব সংঘটনে স্বীয় আকারের স্বল্পতা সত্ত্বেও বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্যাখ্যায় ম্যানটক্স নিম্নরূপ রূপকটি ব্যবহার করেন: 'একটি বড় পদার্থে আমূল পরিবর্তন আনার জন্য স্বল্প পরিমাণ গাঁজনই যথেষ্ট' (ঐ, পৃ. ১০৪)।

বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের পূর্বশর্ত হিসেবে বাণিজ্য বিপ্লবের ভূমিকার উপর জোর দেওয়ার জন্য ম্যানটক্স একদিকে বন্দর-নগরী লিভারপুল এবং অন্যদিকে শিল্প-নগরী ম্যানচেস্টার এবং সাধারণভাবে ল্যাঙ্কাশায়ারের অর্থনৈতিক বিকাশের একটি বিশদ ইতিহাস উপস্থাপন করেন (ibid, পৃ. ১০৪-১০৮)। এই তুলনামূলক ইতিহাসের মাধ্যমে ম্যানটক্স বাণিজ্য ও শিল্প বিকাশের মধ্যকার সম্পর্কের গতিময়তার একটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি দেখান কীভাবে লিভারপুল ইতিমধ্যেই বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি সমৃদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়েছিল যখন এর সংলগ্ন অঞ্চলে শিল্প বিকাশের কোনো লক্ষণ ছিল না (ibid, পৃ. ১০৬)। কিন্তু শিল্পায়নের পরে ম্যানচেস্টার অর্থনীতির 'কেন্দ্র এবং হৃদয়' হয়ে ওঠে এবং লিভারপুল হয় সেই বন্দর যার মাধ্যমে ম্যানচেস্টারের শিল্পাঞ্চল বিদেশে তার উৎপাদন বাজারজাত করত এবং বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করত। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, ভূমিকার এই পরবর্তী পরিবর্তন লিভারপুলের সূচনাকারী ভূমিকাকে নাকচ করে না। ম্যানটক্সের অভিমত অনুসারে, 'যে শক্তি এই গোটা প্রক্রিয়ার (অর্থাৎ শিল্পায়নের) সূচনা করে তা এসেছিল বাইরে থেকে। ইংল্যান্ডের সকল কাউন্টির মধ্যে কারখানা-ব্যবস্থার জন্মস্থান হিসেবে সঠিকভাবেই পরিচিত যে ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি, তার বিকাশ নির্ভর করেছিল প্রধানত লিভারপুল বন্দর এবং তার মাধ্যমে সংঘটিত বাণিজ্যের উপর' (ibid, পৃ. ১০৮)।

বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের পেছনে যেসব প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন কাজ করেছিল সেগুলো কীভাবে আবিষ্কৃত হলো তা ব্যাখ্যা করার বিষয়েও ম্যানটক্স গভীর

অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর রাখেন। আগের অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি কিভাবে মোকির বাজারের অনুপস্থিতি, বহিঃস্থ-প্রভাব, ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে বিদগ্ধ যুক্তির ভিত্তিতে গিলবয়ের থিসিসের একটি গতিশীল ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছিলেন। ম্যানটক্স দেখান যে, শিল্প বিপ্লবের সময় পরিদৃষ্ট প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি ছিল 'সম্পূর্ণত অভিজ্ঞতা-নির্ভর এবং অনিশ্চিত-প্রয়াস,' যেগুলো অর্থনৈতিক চাহিদা এবং তা পূরণের লক্ষ্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। কেবল দ্বিতীয় পর্যায়েই 'বিজ্ঞান তার যথাযথ ভূমিকায় আবির্ভূত হয়' (ibid, পৃ. ২০৬)[২৪]। প্রথম পর্যায়ের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের উপর্যুক্ত বিশেষ চরিত্রের কারণে এতে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্ভাবনের মধ্যে সংযোগ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হতে পারে[২৫]। চাহিদার কারণে এই প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব ঘটেছিল। শিল্পযুগের সূচনাকারী তুলা শিল্পের বিখ্যাত উদ্ভাবনসমূহের ইতিহাস খুব ঘনিষ্টভাবে পর্যালোচনা করে ম্যানটক্স দেখান কিভাবে প্রতিটি পর্যায়ে চাহিদার চাপই উদ্ভাবনসমূহের জন্ম দিয়েছিল এবং সেগুলোকে ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে পরিচালিত করেছিল (ibid, পৃ. ২০৬-২৫৭)। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি এবং শীঘ্রই আরও দেখার সুযোগ হবে যে, এই চাহিদার বড় অংশই ছিল বৈদেশিক সূত্রের।

২.৩ বৃটিশ শিল্প বিপ্লবে উপনিবেশের ভূমিকার প্রশ্নের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত

সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের বৈশ্বিক চরিত্রটির প্রতি সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ এরিক হবসবয়ম। তাঁর স্পষ্ট অভিমত হলো, 'বৃটেনের স্ব-আবদ্ধ (*ইনসুলার*) ইতিহাস লেখা হয়েছে ঢের, কিন্তু এগুলো খুবই অপর্যাপ্ত (Hobsbawm 1968, পৃ. ২০)[২৬]। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি জানান যে, প্রথমত, বৃটেন বিশ্ব অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিকশিত হয়েছিল, এবং বিশেষত বৃটেন ছিল বিশাল এক আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক 'সাম্রাজ্যের' কেন্দ্র, যে সাম্রাজ্যের উপর তার ভাগ্য নিতান্তই নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ভারত, আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে কিছু না বলে এই দেশের ইতিহাস লেখা অবাস্তব। সংক্ষেপে, 'শিল্প বিপ্লবকে সম্পূর্ণরূপে বৃটেনের বিষয় হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় না' (ঐ, পৃ. ৩৫)।

এর অর্থ এই নয় যে, বৃটেনে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার জন্য কেবল বাইরের কারণগুলি দায়ী ছিল। হবসবয়ম স্পষ্টভাবে জানান যে, শিল্পায়নের মূল পূর্বশর্তগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটেনে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ছিল অথবা সহজেই তা বাস্তবায়িত হওয়ার মতো ছিল (ibid, পৃ. ৩৮)। কিন্তু এই পূর্বশর্তগুলি যথেষ্ট ছিল না। তাঁর মতে, 'শিল্প বিপ্লবের উৎপত্তির প্রশ্নটি বিস্ফোরণের জন্য উপাদান কীভাবে জমা হয়েছিল তা নিয়ে নয়, বরং এটি কীভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তার মধ্যে নিহিত' (ibid)[২৭]। হবসবয়ম জানান যে, বৈদেশিক চাহিদার সম্প্রসারণ এই প্রজ্জ্বলন ঘটিয়েছিল। দেশীয় বনাম বিদেশী চাহিদা সম্পর্কে বিতর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন যে, উভয়ই নিজ নিজ উপায়ে অপরিহার্য ছিল[২৯]। বৈদেশিক বাজারের সম্প্রসারণের সাথে বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র দেখানোর জন্য তিনি নিম্নরূপ পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করেন: ১৭০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে বৃটেনের অভ্যন্তরীণ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৭ শতাংশ; পক্ষান্তরে এই সময়ে রপ্তানির জন্য শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৬৭ শতাংশ। তিনি আরও লক্ষ করেন যে, ১৭৫০ থেকে ১৭৭০ সাল সময়কালে (যেটাকে বৃটেনের উড্ডয়নের 'রানওয়ে পর্যায়' (Rostow 1960) হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে) এই বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৭ শতাংশ এবং ৮০ শতাংশ। সুতরাং, স্পষ্ট যে, অভ্যন্তরীন চাহিদা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল তারচেয়ে বহুগুণ বেশি। হবসবয়মের ভাষায়, 'যদি একটি স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে সেটি নিঃসন্দেহে সেখান (অর্থাৎ, বৈদেশিক চাহিদা) থেকেই এসেছে (ibid, পৃ. ৪৮)'।

বৈদেশিক চাহিদার এই অভাবনীয় সম্প্রসারণের পেছনে কারণ কী ছিল? উপরে প্রদত্ত পরিসংখ্যানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হবসবয়ম মন্তব্য করেন যে, এটি বৃটিশ অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির শৃঙ্খলের একটি সংযোগ (*লিংক*) হতে পারে না। কিন্তু এটি কি বিদেশের দেশগুলির জনসংখ্যা এবং অর্থনীতির স্বাভাবিক কিন্তু বিশেষভাবে উচ্চহারে বৃদ্ধির কারণে হয়েছিল? এই প্রশ্নের চিন্তাশীল উত্তরে হবসবয়ম জানান যে, এরূপ বিস্ফোরণমূলক সম্প্রসারণ ঘটতে পেরেছিল কারণ তা এসব দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার 'স্বাভাবিক' বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভরশীল ছিল না। বরং, দুটি উপায়ে এই সম্প্রসারণ অর্জিত হয়েছিল। একটি হলো, অন্যান্য দেশের রপ্তানি বাজার দখল করা। দ্বিতীয় হলো, বিদেশের বাজারে অভ্যন্তরীন প্রতিযোগিতা

নির্মূল করা, অর্থাৎ যুদ্ধ এবং উপনিবেশ স্থাপনের মতো রাজনৈতিক বা আধা-রাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করা (ibid, পৃ. ৪৮)। সুতরাং, উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে বিদেশী বাজারের দখল বৃটেনের শিল্প বিপ্লবের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল[৩০]। এই প্রসঙ্গে হবসবয়ম লক্ষ করেন যে, বৃটেনে অভ্যন্তরীণ চাহিদার যে সম্প্রসারণ দেখা গিয়েছিল তা শুধু বৃটেনের জন্যই প্রযোজ্য ছিল না। বরং ইউরোপের অন্যান্য কিছু দেশের জন্যও তা সত্য ছিল এবং তা বিভিন্ন পণ্যের দামের ওঠানামা সংক্রান্ত তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। এসব দেশের একটি উদাহরণ হলো ফ্রান্স, যে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করার সুযোগ পাব[৩১]। কিন্তু এসব দেশের মধ্যে বৃটেনেই শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল, কারণ বৃটেন প্রধানত উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে বিদেশের বাজারের একটি বড় অংশ দখল করার জন্য তার আন্তর্জাতিক সুযোগগুলি কাজে লাগিয়েছিল[৩২]।

২.৪ বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের বৈদেশিক সংযোগের ভূমিকা - তুলাশিল্পের ইতিহাস কি বলে?

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায় সম্পর্কে রোস্টোর তত্ত্বের (Rostow 1960) সাথে একমত না হয়েও বৃটিশ উত্থানের সময় তুলাবস্ত্র খাতকে 'নেতৃস্থানীয় খাত' হিসেবে স্বীকার করতে অসুবিধা নেই। কীভাবে তুলাশিল্প থেকে উদ্ভূত বহুমুখী সংযোগ-প্রভাব বৃটিশ অর্থনীতিকে শিল্পায়নের পথে টেনে নিয়ে যায় তার যে বর্ণনা কোল এবং ম্যানটক্স দিয়েছেন সেটা আমরা পূর্ববর্তী উপ-অনুচ্ছেদে ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি। সুতরাং, স্পষ্ট যে, বৃটেনের তুলা শিল্পের বিকাশের সাথে বৈদেশিক চাহিদার খুব বেশি সংযোগ ছিল না বলে মোকিরের যে দাবি তা স্পষ্টতই তথ্যনিষ্ঠ ছিল না। আমরা দেখেছি যে, এমনকি থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কিকেও এই সংযোগ স্বীকার করতে হয়েছিল এবং কোল, ম্যানটক্স, এবং হবসবয়ম প্রদত্ত পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এই সংযোগটি নিশ্চিত হয়েছে। এই উপ-অনুচ্ছেদে আমরা এই সংযোগটিকে আরও একটু বিশদভাবে দেখার চেষ্টা করবো; এর কার্যকারণের প্রণালী বোঝার চেষ্টা করবো; এবং এর কিছু প্রভাব বিবেচনা করবো। এই প্রবন্ধের পরবর্তী, তৃতীয় অনুচ্ছেদের জন্য এই আলোচনা একটি ভূমিকা হিসেবেও কাজ করবে।

প্রথমে, আমরা উপর্যুক্ত লেখকরা তাদের নিজ নিজ দাবির সমর্থনে যেসব যুক্তি এবং প্রমাণ পেশ করেন তা পর্যালোচনা করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ,

তুলাশিল্পের ইতিহাসে যাওয়ার আগেও ম্যানটক্স উল্লেখ করেন যে, ইংল্যান্ডে তুলা শিল্পের উৎপত্তির গভীর অধ্যয়ন দেখায় যে, এই শিল্পটি প্রাচ্যের উৎপাদনের অনুকরণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছিল। ফলে বলা যেতে পারে যে, ইংল্যান্ডে এই শিল্পের বীজ প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজের মাধ্যমে উপনীত হয়েছিল (Mantoux 1928, পৃ. ১০৪)[৩৩]। অন্যত্র এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট করে ম্যানটক্স জানান যে, তুলাশিল্পের সূচনার ইতিহাসটি বিভিন্ন দিক থেকে আকর্ষণীয়। শিল্প বিকাশের উপর বাণিজ্যের প্রভাবের এটি একটি স্পষ্ট উদাহরণ। 'এই নতুন শিল্পটি ছিল ভারতের সাথে বাণিজ্যের সন্তান' (ঐ, পৃ. ২০৩)।

আমরা জানি যে, এই ধরনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রশ্ন হবে, 'এই দাবীর পক্ষে পরিমাণগত প্রমাণ কোথায়?' কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা প্রমাণের প্রসঙ্গে আসবো, কিন্তু আপাতত লক্ষ করা যেতে পারে যে, প্রায় এক শতাব্দী আগে, শিল্প বিপ্লবের তুলনামূলক ভাবে কাছাকাছি সময়ে ম্যানটক্সের মতো একজন প্রতিভাবান ঐতিহাসিক বিষয়টিকে কীভাবে দেখেছেন। একই দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা হবসবয়মের নিম্নরূপ মতামত লক্ষ করতে পারি। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, তুলাবস্ত্র উৎপাদন, যা প্রথমে শিল্পায়িত হয়েছিল, তা মৌলিকভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল। এর কাঁচামালের প্রতিটি আউন্স উপক্রান্তীয় বা গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশসমূহ থেকে আমদানি করতে হতো এবং এর দ্বারা প্রস্তুত পণ্যসমূহ ব্যাপকভাবে বিদেশে বিক্রি করতে হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে এটি ইতিমধ্যেই এমন একটি শিল্পে পরিণত হয়েছিল যার মোট উৎপাদনের বৃহত্তর অংশ (১৮০৫ সালের মধ্যে সম্ভবত দুই-তৃতীয়াংশ) রপ্তানি করতে হতো (Hobsbawam 1917, পৃ. ৪৮)। তিনি আরও যোগ করেন যে, তুলাবস্ত্র শিল্প ছিল সেই ত্বরান্বিত আন্তর্জাতিক এবং বিশেষ করে ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের একটি সাধারণ উপজাত ফল, যা ছাড়া, যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, শিল্প বিপ্লব ব্যাখ্যা করা যায় না (ঐ, পৃ. ৫৭)। এই অভিমতের সমর্থনে হবসবয়ম নিম্নরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন: ১৭৫০ সালের পর রপ্তানির বিশাল সম্প্রসারণ এই শিল্পকে তার গতি দেয়। তখন থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে তুলাবস্ত্র রপ্তানি দশগুণ বৃদ্ধি পায় (ঐ) এবং ঐ বছর পর্যন্ত বৃটিশ রপ্তানির ৯০ শতাংশেরও বেশি ঔপনিবেশিক বাজারে, প্রধানত আফ্রিকায়, বিক্রি করা হতো। তিনি আরও যোগ করেন যে, সময়ে এই শিল্পকে বৃটিশ অভ্যন্তরীণ বাজারে ফিরে যেতে

হয়েছিল, যেখানে ক্রমবর্ধমানভাবে লিনেনের পরিবর্তে সুতিবস্ত্র ব্যবহৃত হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৭৯০ সাল থেকে প্রতি বছর বৃটেন তার উৎপাদনের বৃহত্তর অংশ রপ্তানি করতো। ঊণবিংশ শতকের শেষের দিকে এই অনুপাত ছিল প্রায় ৯০ শতাংশ। তুলাবস্ত্র শিল্প মূলত একটি রপ্তানিমুখি শিল্প ছিল এবং বহুকাল তাই রয়ে যায় (ঐ, পৃ. ৫৮)[৩৪]। এসব পরিসংখ্যান স্পষ্টভাবেই বৃটেনের তুলাবস্ত্র শিল্পের বিকাশের জন্য বৈদেশিক এবং ঔপনিবেশিক চাহিদার গুরুত্ব তুলে ধরে।

হবসবয়ম তুলাবস্ত্র শিল্পের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা এবং সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কে কিছু প্রমাণও উপস্থাপন করেন। তিনি লক্ষ করেন যে, বৃটিশ শিল্পায়নের প্রথম পর্যায়ে গুরুত্বের দিক থেকে তুলাবস্ত্র শিল্পের সাথে অন্য কোনও শিল্পের তুলনা করা যায় না। ওয়াটারলু যুদ্ধের (অর্থাৎ ১৮১৫ সালের) পরের ২৫ বছর তুলাবস্ত্র শিল্প বছরে ৬ থেকে ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ফলে এ সময়ে বৃটিশ শিল্প সম্প্রসারণ তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। পরে যখন তুলাবস্ত্র শিল্পের সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যায় – যেমন উনিশ শতকের শেষ প্রান্তিকে, যখন এর প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক ০.৭ শতাংশে হ্রাস পায় – তখন সমস্ত বৃটিশ শিল্পে অধোগতি পরিলক্ষিত হয়[৩৫]। তিনি আরও যোগ করেন যে, বৃটেনের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে তুলাবস্ত্র শিল্পের অনন্য অবদান ছিল। মোটা দাগে বললে, নেপোলিয়ন-পরবর্তী দশকগুলিতে বৃটেনের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় অর্ধেক তুলাবস্ত্র শিল্পের পণ্যের রপ্তানি দ্বারা অর্জিত হতো। এই শিল্পের বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে (অর্থাৎ, ১৮৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে) কাঁচা তুলার আমদানির জন্য মোট নিট আমদানি খরচের প্রায় ২০ শতাংশ ব্যয়িত হয়। বস্তুত, বৃটেনের বৈদেশিক দায় পরিশোধ ভারসাম্য (*ব্যাল্যান্স অফ পেমেন্টস*) এককভাবে তুলাবস্ত্র শিল্পের ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। একই কথা প্রযোজ্য ছিল বৃটেনের জাহাজ চলাচল এবং সাধারণভাবে গোটা বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য (ঐ, পৃ. ৬৮)।

হবসবয়ম সে সময়ের বৃটিশ পুঁজি সঞ্চয়নে তুলাবস্ত্র শিল্পের অবদানের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জানান যে, প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়নে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় তুলাবস্ত্র শিল্প প্রায় নিশ্চিতভাবেই বেশি অবদান রেখেছিল, কারণ দ্রুত যান্ত্রিকীকরণ এবং সস্তা (মহিলা এবং কিশোরদের) শ্রমের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শ্রমজীবীদের পরিবর্তে পুঁজিপতিদের হাতে বিপুলভাবে আয়ের স্থানান্তর সম্ভব হয়েছিল। ১৮২০ সালের পরের ২৫

বছরে শিল্পের নিট উৎপাদন প্রায় ৪০ শতাংশ (বর্তমান মূল্যে) বৃদ্ধি পেয়েছিল; পক্ষান্তরে, এরজন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের মজুরি বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ৫ শতাংশ (ঐ, পৃ. ৬৯)। অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের উপর তুলাবস্ত্র শিল্পের সংযোগ-প্রভাব সম্পর্কে হবসবয়ম উল্লেখ করেন যে, তুলাবস্ত্র শিল্প যে সাধারণভাবে শিল্পায়ন এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে উদ্দীপিত করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষত, রাসায়নিক শিল্প এবং প্রকৌশল শিল্প উভয়ই তুলাবস্ত্র শিল্পের কাছে বিশেষভাবে ঋণী ছিল (ঐ)।

তুলাবস্ত্র শিল্পের ইতিহাস আরেক দিক থেকেও শিক্ষণীয়। এই ইতিহাস স্পষ্টভাবে এই সত্যটি সামনে এনে দেয় যে, বৃটিশ শিল্প বিপ্লব কেবল বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক লেনদেনের ফলাফল ছিল না। এর সাথে জড়িত ছিল নৃশংস শক্তির ব্যবহার। বৃটিশ শিল্প বিপ্লব মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে তুলনামূলক সুবিধার ব্যবহারের ফলশ্রুতি ছিল না; বরং, এটি ছিল নগ্ন বলপ্রয়োগ দ্বারা পরিচালিত, আধুনিক বাণিজ্য তত্ত্বের ভাষায় যাকে বলা হয়, 'কৌশলগত বাণিজ্য' (*স্ট্র্যাটেজিক ট্রেড*)-এর ফলাফল। এটি দক্ষিণ পৃথিবীর জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদদের দ্বারা উত্থাপিত কোনও বিতর্কিত অভিযোগ নয়; বরং, এটি সন্দেহাতীত এবং স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত একটি ঘটনা, যা অর্থনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়নকারীদের কারো পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়।

বৃটিশ তুলাবস্ত্র শিল্প কেবলমাত্র ভারতের তুলাবস্ত্র প্রস্তুতকারকদের বিরুদ্ধে একটি শক্ত এবং উঁচু সুরক্ষা প্রাচীরের (প্রকৃতপক্ষে, সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার) অধীনে বিকশিত হতে পারে। ম্যানটক্স লক্ষ করেন যে, ইংল্যান্ডের তুলাবস্ত্র শিল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে এই শিল্প দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের মান বেশ খারাপ ছিল এবং এর পরিমাণও ছিল নগণ্য। প্রধান শহরগুলিতে বিক্রি হওয়া প্রায় সমস্ত তুলাবস্ত্র পণ্য কমবেশি সরাসরিভাবে ভারত থেকে আসত (Mantoux 1928, পৃ. ১৯৯)। কিন্তু তারপর সকল পক্ষ থেকে অভিযোগের ঝড় ওঠে। তারা শোর তোলেন যে, এ ধরনের বিদেশী প্রতিযোগিতার অনুমতি দেওয়া হলে ইংল্যান্ডের প্রধান পণ্যের বাণিজ্যের কী হবে? অতএব, বৃটেনের সংসদ দ্রুত তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। ১৭০০ সালে ভারত, পারস্য, এবং চীন থেকে মুদ্রিতবস্ত্র (*ক্যালিকো*) আমদানি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা হয়। এই আদেশ লঙ্ঘনকারীদের কাছ থেকে জব্দ করা সমস্ত পণ্য বাজেয়াপ্ত, নিলামে বিক্রি এবং পুনঃরপ্তানি করার বিধান করা হয় (ঐ, পৃ. ২০০)। এই নিষেধাজ্ঞার

কারণেই বৃটিশ তুলাবস্ত্র শিল্প বিকশিত হতে পারে, কারণ ইংল্যান্ডেও সুতিবস্ত্রের চাহিদা ছিল[৩৬]।

এছাড়া, আফ্রিকার দাস শিকারীদের প্রণোদনা যোগানোর জন্য বৃটিশ দাস ব্যবসায়ীদের কাছে সুতির কাপড়ের চাহিদা ছিল। হবসবয়ম জানান যে, ১৭০০ সালের নিষেধাজ্ঞার ফলেই ভারতে প্রস্তুত সুতি কাপড়ের বিকল্প হিসেবে ইংল্যান্ডে তৈরি তুলাবস্ত্র শিল্পের সূচনা ঘটে (ঐ, পৃ. ২০৩)। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই 'কৌশলগত হস্তক্ষেপে'র ফলে গড়ে ওঠা ইংল্যান্ডের তুলাবস্ত্র শিল্প দ্রুত অভিজ্ঞতা-থেকে-শিক্ষা এবং উদ্ভাবনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে কারণ, বৃটিশ উৎপাদকেরা ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি বি-শিল্পায়িত ভারতের বাজার এবং আফ্রিকা ও নতুন বিশ্বের বন্দী বাজারের লভ্যতার সুযোগ ব্যবহার করতে পারে। এই প্রক্রিয়াটির সারসংক্ষেপ করে ম্যানটক্স জানান যে, বিদেশী প্রতিযোগিতার মুখে কোন রকম কৃত্রিম প্রতিরক্ষা ছাড়াই বৃটিশ সুতিবস্ত্র শিল্প বিকশিত হয় – এমন দাবির চেয়ে মিথ্যা দাবি আর কিছুই হতে পারে না। যেসব নিষেধাজ্ঞা এই শিল্পের প্রাথমিক বিকাশকে প্রায় থামিয়ে দিয়েছিল সেগুলো পরবর্তীতে এর সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়। বহির্বিশ্ব থেকে ছাপা সুতিবস্ত্র আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকে। ফলে, অভ্যন্তরীণ বাজারের উপর ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্প উদ্যোক্তাদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম হয়। তবে, প্রথমাবস্থায় এই নিষেধাজ্ঞা সুতা বা রঙ-না-করা উপকরণের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। তদুপরি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডে কিছু বিশেষায়িত বিদেশী পণ্য আমদানি করতে থাকে। তার মধ্যে ছিল ঢাকাই মসলিন, যা সূক্ষ্মতার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু ইংরেজ বস্ত্র শিল্পপতিরা শীঘ্রই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে, কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরীণ বাজার পরিপূর্ণভাবে নিজেদের জন্য সংরক্ষিত রাখা। সুতরাং, তারা পার্লামেন্টের কাছে বারবার আবেদন করে যাতে বিদেশী উৎসের সকল উপকরণের উপর শুল্ক আরোপ করা হয়। শেষ পর্যন্ত তারা এই দাবী আদায়ে সফল হয়। তবে শুধুমাত্র ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ বাজার সংরক্ষিত করে তারা সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের জন্য বৈদেশিক বাজার উন্মুক্ত করার পদক্ষেপও গৃহীত হয়। ছাপা সুতিবস্ত্র বা মসলিনের প্রতিটি রপ্তানিকৃত রোলের উপর একটি অনুদান দেওয়া হয়েছিল, যা হয়তো আদৌ প্রয়োজন ছিল না, কারণ প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ইংল্যান্ড ইউরোপের অন্যান্য প্রতিযোগী দেশগুলির চেয়ে ২৫ থেকে ৩০ বছর

এগিয়ে ছিল (ঐ, পৃ. ২৫৭)। এভাবে বৃটিশ সদ্যোদ্ভূত শিল্পপতিরা একদিকে অভ্যন্তরীণ বাজার সংরক্ষিত রাখে এবং অন্যদিকে বৈদেশিক বাজার বলপূর্বক দখল করে। বৃটেনের সুতিবস্ত্র শিল্পের এই ইতিহাস আমাদেরকে বৃটিশ শিল্প বিপ্লবে ভারতের ভূমিকার প্রশ্নে নিয়ে আসে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এই প্রশ্নের আলোচনা করবো।

৩. বৃটিশ শিল্প বিপ্লবে ভারতবর্ষের ভূমিকা

বৃটিশ শাসনের অধীনে ভারতের ইতিহাস বেশ পুরানো। ভারতীয়, ইংরেজ, এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ইতিহাসবিদরা এই বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন। এখানে এই বিপুল রচনাবলীর পর্যালোচনা এবং সারসংক্ষেপ করা সম্ভব নয় এবং তা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। ভারতের উপর বৃটিশ শাসনের অভিঘাতের বিষয়টি নিঃসন্দেহে বিশাল এবং বহুমুখী (Marx 1853a,b)। প্রায় দু'শ বছর ধরে বিস্তৃত এই ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। তবে ভারতের উপর বৃটিশ শাসন কেবল ভারতের জন্য নয়, বৃটেনের জন্যও মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ভারতের উপর বৃটেনের ঔপনিবেশিক শাসন বৃটিশ শিল্প বিপ্লব সংঘটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আমরা তার ইতিহাসের শুধুমাত্র একটি বিশেষ, যদিও গুরুত্বপূর্ণ, দিকের প্রতি আগ্রহী। কীভাবে ভারত এই ভূমিকা রেখেছিল সেটাই এই অনুচ্ছেদের আলোচনার বিষয়।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে, ভারতীয় সম্পদের প্রতি আকর্ষণই ইউরোপীয়দের ভারতে সরাসরি সমুদ্রপথ খুঁজে বের করার জন্য তাদের জীবনের ঝুঁকি নিতে প্ররোচিত করেছিল এবং এই অন্বেষার একটি অপ্রত্যাশিত ফল ছিল আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার। ইউরোপীয়রা যখন প্রথম ভারতে অবতরণ করে, তখন এটি ছিল সমৃদ্ধ কৃষি এবং কারুশিল্পসম্পন্ন প্রায় ২৫ কোটি জনসংখ্যার এক বিশাল দেশ। ভারতের কারুশিল্প কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের মান এবং ইউরোপীয় বাজারে তার চাহিদা এমনই উচ্চ ছিল যে, ইউরোপীয় বণিকেরা মধ্যস্থতাকারী আরবদের বাদ দিয়ে এই দূরবর্তী দেশের সাথে সরাসরি বাণিজ্য স্থাপনে উদগ্র হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় কৃষি কর্তৃক উৎপাদিত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের একটি প্রমাণ ছিল নগরায়নের মাত্রা। মূল তথ্য-আকর এবং সমসাময়িক ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণের সযত্ন পরীক্ষার ভিত্তিতে বিশিষ্ট

ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশই ছিল নগরবাসী[৩৭]। বিষয়টি আরও বিস্তারিত করে ইরফান হাবিব জানান যে, আকবরের আমলে (অর্থাৎ, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) ভারতে ১২০টি বড় শহর এবং ৩,০০০ ছোট শহর ছিল। ১৫৮৩-৮৬ সালে আগ্রা এবং ফতেহপুর উভয়ই লন্ডনের চেয়ে বড় শহর ছিল। আগ্রার তখনকার জনসংখ্যা ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ ছিল বলে অনুমিত হয়। দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে তা ইউরোপের বৃহত্তম শহর প্যারিসের মতো জনবহুল হয় বলে ধারণা করা হয়। সপ্তদশ শতকে পাটনার আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল ২,০০,০০০ এবং আহমেদাবাদের জনসংখ্যা (শহরতলিসমেত) লন্ডনের চেয়েও বড় ছিল বলে অনুমিত হয় (Habib 1963, পৃ. ৭৫-৭৬)[৩৮]।

সূচনায়, অর্থাৎ, সপ্তদশ শতাব্দী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারত এবং 'ঈস্ট ইন্ডিজ' তথা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (মূলত ইন্দোনেশিয়া) সাথে বৃটেনের বাণিজ্য সেসময়কার অতলান্তিক মহাসাগরস্থ 'ত্রিকোণ বাণিজ্যে'র সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ভারত থেকে যেসব পণ্য বৃটিশ বণিকেরা পণ্য ক্রয় করতো তারমধ্যে ছিল ছাপাবস্ত্র (*ক্যালিকো*), মসলিন, মশলা এবং অন্যান্য। কিন্তু ভারতে বিক্রি করার মতো তাদের তেমন কোনো পণ্য ছিল না। ফলে এসব পণ্য কেনার জন্য তাদেরকে নগদ অর্থ (স্বর্ণ বা রূপার আকারে মুদ্রা) নিয়ে আসতে হতো। এটাকে বলা হতো 'বিনিয়োগ'। এই বিনিয়োগের সূত্র ধরেই অতলান্তিক মহাসাগরের ত্রিকোণ বাণিজ্যের সাথে ভারতের সাথে বৃটিশদের বাণিজ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

ত্রিকোণ বাণিজ্যের উদ্ভবের মূল কারণ ছিল আমারিকায় দাসপ্রথার বিস্তার। আমেরিকায় নবপ্রতিষ্ঠিত উপনিবেশসমূহে, বিশেষত জামাইকা, ত্রিনিদাদসহ ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত ('ওয়েস্ট ইন্ডিজ' বলে অভিহিত) দ্বীপপুঞ্জে খামার (*প্ল্যানটেশন*) কৃষির প্রসারের জন্য অতিরিক্ত শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি হলে তা মেটানোর জন্য আফ্রিকা থেকে মানুষদের বন্দী করে নিয়ে সেখানে দাস হিসেবে নিয়োজিত করার প্রথা চালু হয়। যেভাবে ত্রিকোণ বাণিজ্য কাজ করতো তা নিম্নরূপ। প্রথমত, আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়া এবং সেখানকার জনগণের উপর ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম হওয়ার পর সেখানে লব্ধ স্বর্ণ এবং বিশেষত রূপা ইউরোপীয়দের হস্তগত হয় এবং তারা তা ইউরোপে পাচার করতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত, এই রূপা এবং রূপা দ্বারা কেনা বিভিন্ন পণ্য ইউরোপীয় দাস ব্যবসায়ীরা আফ্রিকায় প্রেরণ

করে। তৃতীয়ত, আফ্রিকায় ক্রীত এবং অন্যান্য উপায়ে সংগ্রহকৃত দাসদের আফ্রিকা থেকে অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় নিয়ে আসা হতো।

এই ত্রিকোণ বাণিজ্যের সাথে ভারতের সাথে বৃটিশদের বাণিজ্যের সম্পর্কের দু'টি দিক ছিল। প্রথমত, বৃটিশরাও নব-আবিষ্কৃত আমেরিকার রূপার অংশীদার হয়। যদিও আমেরিকা থেকে রূপা লুণ্ঠনে স্প্যানিয়রাই এগিয়ে ছিল, কিন্তু ১৫৮৮ সালে স্প্যানিশ নৌবাহিনীর উপর বিজয় লাভের পর সমুদ্রে বৃটিশদের আধিপত্য কায়েম হয় এবং স্পেনীয়দের কাছ থেকে আমেরিকা থেকে লুণ্ঠিত রূপার একটি অংশ নজরানা (*ট্রিবিউট*) হিসেবে সংগ্রহ করতে পারে। এই রূপা ভারতের সাথে বাণিজ্যে বৃটিশদের বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, যেটা আগেই উল্লেখিত হয়েছে, যদিও ভারতে সংগৃহীত পণ্যের (বিশেষত ছাপা কাপড়ের) প্রধান অংশ ইউরোপের বাজারে পুনরায় বিক্রি করা হতো; তবে এর একটি অংশ আফ্রিকাতেও দাস সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হতো। এভাবে ভারতের সাথে বাণিজ্য এবং অতলান্তিক সাগরকেন্দ্রিক ত্রিকোণ বাণিজ্য পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে পড়ে।

সাধারণভাবে ইউরোপীয়দের এবং বিশেষভাবে ইংরেজদের জন্য এটা সৌভাগ্যের ছিল যে, তাঁরা এমন সময় ভারবর্ষে পদার্পণ করে এবং ক্রমশ এই উপমহাদেশের উপর আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াসী হয় যখন এই উপমহাদেশের সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক চক্র বিকেন্দ্রীকরণ পর্বে প্রবেশ করেছিল। স্মরণযোগ্য, পুঁজিবাদের যেমন বাণিজ্য চক্র থাকে, তেমনি সামন্তবাদের একটি রাজনৈতিক চক্র থাকে। অর্থাৎ, সামন্তবাদী সমাজ একসময় রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবনের দিকে অগ্রসর হয়। পরে তা আবার বিকেন্দ্রীকরণের দিকে পতিত হয়। ১৫২৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে বাবুরের জয়লাভের মধ্য দিয়ে মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠার পর ভারতে রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়। সম্রাট আকবরের সময় তা একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। কিন্তু পরবর্তীতে রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ মোগল সম্রাটদের কেন্দ্রীয় শাসন যথেষ্টই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তা বৃটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্ণধারদের মনে রাজনৈতিক অভিলাষ জাগ্রত করে এবং তার চরিতার্থকরণকে সুগম করে। এই পটভূমিতেই ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনচেতা নবাব সিরাজোদৌল্লাহকে পরাজিত

করে কার্যত বাংলার শাসকে পরিণত হয়। পরবর্তীতে এই বাংলার উপর নির্ভর করেই ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের বাকী এলাকাসমূহকে দখল করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়। ১৮৫৭ সালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য অথবা প্রদেশের দেশীয় শাসকেরা দুর্বল এক মোগল সম্রাটের নেতৃত্বে বৃটিশদের দ্বারা ভারত দখল করার প্রয়াস প্রতিহত করার লক্ষ্যে ভারতের 'প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে' নিয়োজিত হন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। তবে এই যুদ্ধের প্রেক্ষিতে দখলকৃত ভারতের শাসনাভার ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে বৃটিশ সরকার নিজেই গ্রহণ করে এবং ভারত প্রায় আরও একশত বছর বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকে[৩৯]।

বৃটেনের উপনিবেশ সারা পৃথিবী জুড়েই বিস্তৃত ছিল। তবে ভারতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'মুকুটমনি' (*ক্রাউন জুয়েল*) বলা হয়। এটা আশ্চর্য্যের ছিল না, কারণ ভারত ছিল এক বিরাট জনসংখ্যাসম্পন্ন এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ উপমহাদেশ। বৃটেনের বাকী সকল উপনিবেশ যোগ করলেও তা ভারতের সমকক্ষ ছিল না। দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে এরূপ একটি উপনিবেশ যে বৃটেনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই ভূমিকার সুনির্দিষ্ট চরিত্রটি উপলব্ধি করা। উপনিবেশ হিসেবে ভারতবর্ষ বৃটেনে পৃথিবীর প্রথম শিল্প বিপ্লবের সংঘটনে মৌলিক অবদান রাখে। এই অবদানের বিভিন্ন দিক ছিল। তার মধ্যে যেগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ্য সেগুলো হলো: (ক) বৃটেনে শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রাথমিক মূলধন যোগান, (খ) বৃটিশ শিল্পের উৎপাদনের জন্য বাজার সরবরাহ, (গ) শিল্প বিপ্লবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল সরবরাহ এবং (ঘ) পরবর্তীতে বৃটিশ উদ্বৃত্ত মূলধনের জন্য বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান। নীচে আমরা এই দিকগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

৩.২ ভারতীয় অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পাচার

পলাশীর যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ বিজয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পূর্বাঞ্চলীয় বাংলা সুবাহ'র (যার মধ্যে বিহার এবং উড়িষ্যাও অন্তর্ভুক্ত ছিল) উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ দেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার শাসনাভার তখনও ভারতীয় শাসকের (নবাবদের) হাতে ছিল, কিন্তু তাঁরা আর আগের মতো স্বাধীন নবাব ছিলেন না। তাঁরা কোম্পানির সমর্থনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, এবং কোম্পানি এই নির্ভরশীলতা ব্যবহার করে

নবাবদের কাছ থেকে উপঢৌকন, নজরানা, এবং অন্যান্যরূপে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করা শুরু করে।

রমেশ দত্ত তাঁর ধ্রুপদী *ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া* (Dutt 1960a) গ্রন্থে এই প্রক্রিয়ার তথ্যসমৃদ্ধ বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশন করেছেন। তিনি জানান যে, মসনদে নতুন নবাবকে অধিষ্ঠিত করার প্রতিটি সুযোগকে কোম্পানি 'প্রাচ্যের প্রবাদপ্রতিম প্যাগোডা বৃক্ষকে ঝাঁকি দেওয়ার উপযুক্ত উপলক্ষ' হিসেবে বিবেচনা ও ব্যবহার করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর যখন মীর জাফরকে প্রথম নবাব করা হয়, তখন বৃটিশ অফিসার এবং সৈন্যরা মোট ১২,৩৮,৫৭৫ পাউন্ড 'উপঢৌকন' পেয়েছিল, যার মধ্যে রবার্ট ক্লাইভ নিজে একাই ৩১,৫০০ পাউন্ড এবং তার সাথে বাংলায় একটি সমৃদ্ধ জায়গীরও পেয়েছিল। ১৭৬০ সালে যখন মীর কাসেমকে নবাব করা হয়, তখন বৃটিশ অফিসারদের উপঢৌকনের পরিমাণ ছিল ২,০০,২৬৯ পাউন্ড, যার মধ্যে হেনরি ভ্যানসিটার্ট একাই পেয়েছিল ৫৮,৩৩৩ পাউন্ড। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভ্যানসিটার্টকে ১৭৫৯ সালে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে এবং ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৬৩ সালে যখন মীর জাফরকে দ্বিতীয়বার নবাব করা হয়, তখন বৃটিশদের উপঢৌকনের পরিমাণ ছিল ৫,০০,১৬৫ পাউন্ড। পরে, ১৭৬৫ সালে যখন নাজিম-উদ-দৌলাকে নবাব করা হয়, তখন বৃটিশদের উপঢৌকনের পরিমাণ ছিল ২,৩০,৩৫৬ পাউন্ড। পলাশীর যুদ্ধের পরের আট বছরের মধ্যে বৃটিশরা এভাবে যে উপঢৌকন আদায় করে তার মোট পরিমাণ ছিল ২১,৬৯,৬৬৫ পাউন্ড। এরূপ প্রত্যক্ষ উপঢৌকন ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন দাবির রূপে বৃটিশরা যে অর্থ আদায় করে তার পরিমাণ ছিল ৩৭,৭০,৮৩৩ পাউন্ড। ১৭৭২-৭৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবস্থা তদন্তকারী হাউস অফ কমন্স কমিটির সামনে এই পরিমাণ অর্থের প্রাপ্তি প্রমাণিত হয়েছিল (Dutt 1960a, পৃ. ২৩)।

কিন্তু কোম্পানির ক্ষুধা তাতে নিবৃত্ত হয় না। এককালীন উপঢৌকন, নজরানা, ও অন্যান্য আদায়ের পর্ব শেষ করে কোম্পানি নবাবদের পরিবর্তে নিজেরাই সরাসরিভাবে বাংলার রাজস্ব আদায়ের অধিকারী হতে চায়। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা অত্যন্ত কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দিল্লিতে অবস্থিত দুর্বল, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাসহ মোগল ভারতের সকল প্রদেশের উপর ক্ষমতার অধিকারী সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার 'দেওয়ানি' অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার অর্জন করে। এর ফলে

১৭৫৭ সালের পর থেকে বাংলায় নবাব এবং কোম্পানির মধ্যে যে দ্বৈত শাসনের উদ্ভব ঘটেছিল, তার অবসান ঘটে এবং কোম্পানি কেবল কার্যত নয় বরং আইনতও এই প্রদেশের শাসক (রাজস্ব আদায়ের অধিকারী) হয়ে ওঠে। অতঃপর কোম্পানি তার সমস্ত প্রাণ ও শক্তি দিয়ে বাংলার ভূমি ও অন্যান্য রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত হয়। দেওয়ানি পাওয়ার পর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিরূপ উন্মত্তভাবে বাংলার অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত আহরণে ঝাঁপিয়ে পরে তার একটি পরিচয় সারণি-১ তুলে ধরে। এতে ১৭৬৫ থেকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত মোট রাজস্ব আদায়, বিভিন্ন খরচ, এবং বার্ষিক লাভের (*ব্যালেন্সের*) পরিমাণ দেখা যায়।

স্পষ্ট যে, বাংলার দেওয়ানি লাভের পর ভারতের সাথে বৃটেনের অর্থনৈতিক সম্পর্কের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে। প্রথমত, বৃটেন অভিমুখে ভারতের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পাচারের একটি স্থায়ী এবং বিপুল পরিসরসম্পন্ন পথ খুলে যায়। সারণি-১ থেকে ধারণা হতে পারে যে, এই পাচারের পরিমাণ নেট রাজস্ব আদায়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মতো ছিল (দ্বিতীয় স্তম্ভের অনুপাত হিসেবে সর্বশেষ স্তম্ভের সংখ্যা)। ১৭৬৫-১৭৭১ সময়কালের ছয় বছরের জন্য এর মোট পরিমাণ ছিল ৪০ লক্ষ পাউন্ডের বেশী। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়, কারণ চতুর্থ স্তম্ভে প্রদর্শিত কোম্পানির ব্যয়সমূহ হলো তৃতীয় স্তম্ভে প্রদর্শিত ব্যয়সমূহের অতিরিক্ত। তৃতীয় স্তম্ভের শিরোনাম থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাজস্ব আদায় বাবদ যা কিছু খরচ এবং দিল্লীস্থ সম্রাটকে প্রদত্ত নজরানা ও বাংলার নবাবকে প্রদত্ত ভাতা, সবই তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাহলে চতুর্থ স্তম্ভে প্রদর্শনের মতো বাকী রইলো কী? এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেসব খরচ যেগুলো আগে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে বাণিজ্য করার জন্য ব্যয় করতে হতো এবং যেটাকে কোম্পানি 'বিনিয়োগ' বলে আখ্যায়িত করতো। অর্থাৎ, 'বেসামরিক' খরচের মধ্যে ভারতীয় পণ্য কেনার জন্য কোম্পানিকে যে অর্থ ব্যয় করতে হতো সেটাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আগে এই বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসতে হতো। আগেই উল্লেখিত হয়েছে, এই অর্থ তাদেরকে অনেকাংশে সংগ্রহ করতে হতো স্পেন কর্তৃক নব-আবিষ্কৃত আমেরিকা থেকে আহরিত রূপার একটি অংশ অধিগ্রহণের সূত্রে। সুতরাং, বাংলার রাজস্বের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার পর ইংল্যান্ডের সাথে ভারতের অর্থনৈতিক লেনদেন দুই-তরফা থেকে সম্পূর্ণরূপে একতরফা চরিত্র গ্রহণ করে। শুরু হয় ইংল্যান্ডে ভারতের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পাচার।

সারণি ১. বাংলার দেওয়ানি পাওয়ার পর বিভিন্ন বছরে বৃটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ (বৃটিশ পাউন্ড)

বছর (মে-এপ্রিল)	মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ	মুঘল সম্রাটকে দেয়, নবাবের ভাতা, রাজস্ব আদায়ের খরচ, কর্মচারীদের বেতন, কমিশন ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে নেট রাজস্বের পরিমাণ	বেসামরিক, সামরিক, ভবন নির্মাণ, দুর্গ ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক নির্মাণ বাবদ ব্যয়	বার্ষিক নেট লাভ (ব্যালেন্স)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৭৬৫-৬৬	২২,৫৮,২২৭	১৬,৮১,৪২৭	১২,২০,৩৬৯	৪,৭১,০৬৭
১৭৬৬-৬৭	৩৮,০৫,৮১৭	২৫,২৭,৫৯৪	১২,৭৪,০৯৩	১২,৫৩.৫০১
১৭৬৭-৬৮	৩৬,০৫,০০৯	২৩,৫৯,০০৫	১৪,৮৭,৩৮৩	৮,৭১,৬২২
১৭৬৮-৬৯	৩৭,৮৩,২০৭	২৪,০২,১৯১	১৫,৭৩,১২৯	৮,২৯,০৬২
১৭৬৯-৭০	৩৩,৪৮,৯৭৬	২০,৮৯,৩৬৮	১৭,৫২,৫৫৬	৩,৩৬,৮১২
১৭৭০-৭১	৩৩,৩?,৩৪৩	২০,০৭,১৭৬	১৭,৩২,০৮৮	২,৭৫,০৮৮
মোট	২,০২,৩৩,৫৭৯	১,৩০,৬৬,৭৬১	৯০,২৭,৬০৯	৪০,৩৭,১৫২

সূত্রঃ Dutt (1960, পৃ. xi)

সারণি ১ দেখায় যে, এই পাচারের পরিমাণ ছিল বিশাল। আরও লক্ষণীয়, যেসব বৃটিশ কর্মচারী ভারতে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকুরীরত ছিল, তাঁরা নিজেদের বেতনের টাকার একটি বড় অংশ বৃটেনে পাঠাতো। সুতরাং, শুধুমাত্র চতুর্থ এবং পঞ্চম স্তম্ভে উল্লেখিত পরিসংখ্যানই ইংল্যান্ডে পাচারকৃত ভারতীয় অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের ইঙ্গিতবহ নয়, এমনকি তৃতীয় স্তম্ভে উল্লেখিত অর্থের মধ্যেও তার উপস্থিতি রয়েছে।

ফলে, আশ্চর্যের নয় যে, ভারতের সাথে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যের বিশাল ঘাটতি দেখা দেয়। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিয়োগকৃত গভর্নর হ্যারি ভেরেলস্ট ১৭৬৬-১৭৬৮ সময়কালের জন্য ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের যে পরিসংখ্যান সংকলিত করেন তা সারণি ২'য়ে উপস্থিত করা হলো। এই সারণি দেখায় যে, এই সময়কালে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ড থেকে যে পরিমাণ মূল্যের পণ্যসামগ্রী ভারতবর্ষে এনেছিল, তার প্রায় দশগুণমূল্যের পণ্যসামগ্রী তারা ভারত থেকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়। এ থেকেই ভারত থেকে ইংল্যান্ডে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পাচারের পরিমাণ সম্পর্কে

সারণি ২. ১৭৬৬-১৭৬৮ সময়কালে ভারত-ইংল্যান্ড বাণিজ্য

বিষয়	পরিমাণ (বৃটিশ পাউন্ড)
ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আমদানির পরিমাণ	৬,২৪,৩৭৫
ভারত থেকে ইংল্যান্ডে রপ্তানির পরিমাণ	৬৩,১১,২৫০

সূত্রঃ Dutt (1960, পৃ. xi)

কিছু ধারণা পাওয়া যায়। এভাবে ভারতের অর্থ দ্বারা ভারতের পণ্য ক্রয় বৃটিশদের একটি স্থায়ী নীতি হয়ে দাঁড়ায়[৪০]।

বৃটিশ কর্তৃক বাংলা অধিকৃত হওয়ার পর ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকা, আচরণ, ও পরিস্থিতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে তা হলো যে, এখন থেকে বাংলার রাজস্ব শুধু যে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারত থেকে সকল পণ্যসামগ্রী কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থ যোগাতে শুরু করলো তাই নয়, তা কোম্পানি কর্তৃক ভারতের বাকী প্রদেশসমূহ দখল করার লক্ষ্যে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস হিসেবেও কাজ করা শুরু করে। অর্থাৎ, 'ভারতের অর্থ এবং ভারতীয় সিপাহীদের দ্বারা ভারত দখল করা' বৃটিশদের দ্বিতীয় স্থায়ী নীতি হয়ে দাঁড়ায়। আরও লক্ষণীয়, বৃটিশরা শুধু যে ভারতের বাকী অংশ দখল করার জন্য ভারতীয় রাজস্ব ব্যবহার করে তাই নয়, সুদূর আফগানিস্থান, চীন, এবং আফ্রিকার আবিসিনিয়াতে পরিচালিত স্বীয় যুদ্ধবিগ্রহের খরচও তারা ভারতের রাজস্বের উপর চাপাতে শুরু করে। সুতরাং, ভারতের অর্থ দ্বারা ভারতের সাথে বাণিজ্য করা এবং ভারতের অর্থ দ্বারা ভারতের বাকী অংশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ দখল কিংবা তাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা বৃটিশদের মৌলিক নীতি হয়ে দাঁড়ায়।

সংক্ষেপে, ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বাংলা (এবং পরে পুরো ভারত) এমন একটা সম্পদে পরিণত হয় যা থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে প্রয়াসী হয়। মুনাফা সর্বোচ্চকরণের এই নীতি কোম্পানি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বাস্তবায়ন করে। বৃটিশ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার আগে বাংলায় এবং ভারতে সংগৃহীত রাজস্বের একটি বড় বৈশিষ্ট ছিল যে, তা ইংল্যান্ডে পাচারকৃত হওয়ার পরিবর্তে ভারতেই ব্যয়িত হতো। বৃটিশ-পূর্ব দেশীয় শাসকদের দ্বারা রাজস্ব আদায়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, খাজনার হার পরিস্থিতিসাপেক্ষে পরিবর্তিত হতো। কোনো বছর যদি প্রাকৃতিক অথবা অন্য কোনো কারণে ফসলহানি ঘটতো সে বছর খাজনার হার কমানো হতো। বৃটিশ শাসনের অধীনে খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোনো

নমনীয়তার সুযোগ রাখা হয় না। বরং, খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে অশ্রুতপূর্ব অনমনীয়তা ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শিত হয়। সারণি ৩ তার কিছু সাক্ষ্য উপস্থাপন করে।

সারণি ৩. বাংলায় বৃটিশ শাসনামলের প্রথম বছরগুলোতে খাজনা আদায়ের পরিমাণ

বছর	বাস্তবে আদায়কৃত খাজনার পরিমাণ (রুপি)	বাস্তবে আদায়কৃত খাজনার পরিমাণ (পাউন্ড)
১৭৬২-৬৩	৬৪,৫৬,১৯৮	৬৪৬,০০০
১৭৬৩-৬৪	৭৬,১৮,৪০৭	৭৬২,০০০
১৭৬৪-৬৫	৮১,৭৫,৫৩৩	৮১৮,০০০
১৭৬৫-৬৬	১,৪৭,০৪,৮৭৫	১৪,৭০,০০০

সূত্রঃ Dutt (1960, পৃ. 41)

এই সারণি দেখায় যে, বাংলা কার্যত বৃটিশ শাসনের অধীনে আসার পর থেকেই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ রুপি করে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো, যে বছর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানী লাভ করে সরাসরি নিজে রাজস্ব আদায় শুরু করে (অর্থাৎ, ১৭৬৫ সালে), সে বছর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এক লাফে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এভাবে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৯৩ সাল নাগাদ ভূমি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১৭৬৫-৬৬ সালের তুলনায় প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬,৮০,০০০ পাউন্ডে পৌঁছায়। রাজস্ব হারের এই বিপুল বৃদ্ধি জনগণের উপর কী বিপুল চাপের সৃষ্টি করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। শুধু যে কৃষকদের বার্ষিক উৎপাদনের খুব সামান্যই নিজেদের ভোগের জন্য অবশিষ্ট থাকে তাই নয়, তাদের যা কিছু সঞ্চয় ছিল তাও নিঃশেষিত হয়ে যায়। বাংলা দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হয় এবং ১৭৬৯ সালের করাল দুর্ভিক্ষে এদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। বৃটিশ শাসকেরা এই পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করছিলেন তার একটি চিত্র পাওয়া যায় ১৭৭২ সালের ৩ নভেম্বর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের নিকট তদানীন্তন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংয়ের লেখা চিঠির নিম্নোদ্ধৃত অংশেঃ

> ১৭৬৯ সালের মন্বন্তরে দেশের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যুবরণ এবং তার ফলে সাধিত কৃষিকাজের সংকোচন সত্ত্বেও ১৭৭১ সালে আদায়কৃত নীট খাজনার পরিমাণ ১৭৬৮ সালের

> চেয়েও বেশি ছিল। ... স্বাভাবিকিভাবেই আশা করা গিয়েছিল যে, এরূপ একটি বিপর্যয়ের অন্যান্য প্রতিফলের সাথে সঙ্গতি রেখে খাজনা আদায়ের পরিমাণও সমভাবে হ্রাস পাবে। কিন্তু তা হয় না, কারণ খাজনা আদায়ের হার সহিংস পদ্ধতিতে আগের মাত্রায় অক্ষুণ্ন রাখা হয় (Dutt 1960a, পৃ. 38)।

বৃটিশ শাসকেরা ভারতের সাথে কীরকম অর্থনৈতিক আচরণ করে তার কিছুটা পরিচয় বাংলার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপরে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে। বাংলাকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে বৃটিশরা ভারতের বাকী এলাকাসমূহ দখলে অগ্রসর হয়। প্রথমে অযোধ্যা, তারপর মাদ্রাজ, বোম্বে, উত্তর প্রদেশ, এবং সবশেষে পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিমের অন্যান্য অংশ দখল করে নেয়। এসব প্রদেশ দখলের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃটিশেরা সরাসরি যুদ্ধের আশ্রয় নেয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা নানারকম কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। যেমন তাঁরা আইন প্রণয়ন করে যে কোনো ভারতীয় রাজ্যের শাসক সঠিক উত্তরসূরি না রেখে মৃত্যুবরণ করলে সে রাজ্য বৃটিশদের দ্বারা অধিকৃত হবে। ভারতীয় সামন্তবাদের সেসময়কার রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের পর্ব বৃটিশদের ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বা প্রদেশকে একটার পর একটা দখল করাকে সুগম করে। প্রতিটি প্রদেশেই বৃটিশরা বাংলায় যে আচরণ করেছে তার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। অর্থাৎ, প্রথমে বিভিন্ন উপঢৌকনের রূপে স্থানীয় শাসকদের সঞ্চিত অর্থ নিংড়ে নেয়; তারপর সেখানকার রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্বভার প্রত্যক্ষভাবে অধিগ্রহণ করে; রাজস্ব আদায়ের হার বিপুলভাবে বৃদ্ধি করে; এবং জনগণের উপর চরম মাত্রার শোষণ চাপিয়ে দেয়[৪১]। এটি ছিল নির্লজ্জ লুণ্ঠন, এবং বৃটিশরা তা ধারাবাহিকভাবে, নিখুঁতভাবে এবং স্থানীয় জনগণের মঙ্গলের প্রতি চরম অবহেলা সহকারে পরিচালনা করে[৪২]।

একইভাবে, যেটা আগেই উল্লেখিত হয়েছে, ভারত দখলের সমস্ত ব্যয়ভার বৃটিশরা ভারতের উপর চাপায় এবং ভারতের রাজস্ব দ্বারা নির্বাহ করে। শুধু তাই নয়। দুই শত বছর ধরে ভারতের উপর ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনার জন্য বৃটিশরা স্বীয় দেশে যে ব্যয় করেছে সেটাও তাঁরা ভারতের রাজস্বের উপর চাপায় । বৃটিশরা এই খরচের নাম দেয় 'হোম চার্জেস' এবং তা ভারতের রাজস্ব দ্বারা সাধিত 'বিনিয়োগ' এবং ভারতের কর্মরত সকল বৃটিশ কর্মচারীদের ইংল্যান্ডে প্রেরিত অর্থের পাশাপাশি বৃটেন অভিমুখে ভারতের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পাচারের আরেকটি ধারা হিসেবে কাজ করে।

এই ত্রিমুখী পাচারের সাথে আরও যোগ করতে হয় ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ থেকে বৃটিশদের আহরিত মুনাফা। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ১৬১৫ সালে ভারতে বাণিজ্য করার যে সম্মতিপত্র (দস্তক) বৃটিশরা পেয়েছিল তাতে তাদেরকে শুধুমাত্র রপ্তানির জন্য শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, যেসব পণ্য তারা রপ্তানি করবে সেগুলো অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে ক্রয় এবং যে সমুদ্র বন্দর থেকে রপ্তানি করা হবে সেখানে পরিবহনের উপর শুল্ক প্রদান থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে প্রদত্ত শুল্কমুক্ত এই বাণিজ্যের সুবিধা দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করার জন্য প্রযোজ্য ছিল না। ভারতে কিছুটা সামরিক শক্তি অর্জনের (দুর্গ নির্মাণ এবং সেনাবাহিনী গড়ে তোলার) পরই বৃটিশরা দস্তকের এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য শুরু করে। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে বিজয় এবং নবোর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পর বৃটিশেরা প্রকাশ্যেই বিনাশুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ শুরু করে। বিপরীতে, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নিয়োজিত দেশীয় বণিকদের পণ্য ক্রয় এবং পরিবহনের জন্য পদে পদে (যেমনটা সামন্তযুগে প্রথাগত ছিল) শুল্ক প্রদান করতে হতো। ইংরেজদের এই শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের সাথে দেশীয় বণিকদের পক্ষে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না[৪৪]। এর অনিবার্য ফলাফল ছিল বৃটিশ কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বিরাট মুনাফা অর্জন এবং স্থানীয় বণিকদের সর্বস্বান্ত হওয়া। বাংলার শেষ স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাসেম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এই অবৈধ বাণিজ্যে নিয়োজিত হওয়া থেকে বিরত করার জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেন। তার এই প্রচেষ্টায় বিফল হয়ে মীর কাশিম শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর সমস্ত শুল্ক বাতিল করার মতো একটি চরম পদক্ষেপ নেন, যাতে অন্তত স্থানীয় বণিকরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বৃটিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমান অধিকার পায়। বলাবাহুল্য, বৃটিশরা মীর কাশিমের এই পদক্ষেপে রুষ্ট হয়। তারা দ্রুতই মীর কাসেমকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্যোগ নেয়; তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে; এবং অবশেষে তাঁকে হত্যা করে। এভাবে, বৃটিশদের জন্য বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শুল্কমুক্তভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ অবারিত হয় এবং তা থেকে অর্জিত মুনাফা ভারত থেকে বৃটেনে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পাচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন মাধ্যমে পরিচালিত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের মোট পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার একটি উপায় হল বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যান দেখা। তা থেকে আমারা দেখি যে, কেবলমাত্র ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের বছরগুলি (১৮৫৭-৫৮) ছাড়া, ভারত থেকে বৃটেনে রপ্তানির পরিমাণ সবসময়ই বৃটেন থেকে ভারতে আমদানির চেয়ে বিপুলভাবে বেশী ছিল। এসব পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে মন্টগোমেরি মার্টিন ১৮৩৮ সালে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন:

> ভারতে থেকে বৃটেনে বার্ষিক ৩০,০০,০০০ পাউন্ডের এই পাচার ৩০ বছরে, ১২ শতাংশ (স্বাভাবিক ভারতীয় হার) চক্রবৃদ্ধি সুদে, ৭২,৩৯,৯৭,৯১৭ পাউন্ডের বিশাল অঙ্কে পরিণত হয়েছিল। যদি এই সুদের হার আরও কম ধরা হয়, তাহলেও বার্ষিক ২০,০০,০০০ পাউন্ড হিসেবে ৫০ বছরের জন্য এর পরিমাণ হবে ৮৪০,০০,০০,০০০ পাউন্ড! এ ধরণের ক্রমাগত এবং পুঞ্জিভূত অর্থনৈতিক পাচারের শিকার হলে ইংল্যান্ডও দ্রুতই একটি দরিদ্র দেশে পরিণত হতো। সুতরাং, ভারতের জন্য এরূপ পাচারের অভিঘাত কতটা গুরুতর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অর্ধশতাব্দী ধরে, আমরা ভারত থেকে বছরে ২০ থেকে ৩০ এবং কখনও কখনও ৪০ লক্ষ পাউন্ড আহরণ করে চলেছি, এবং তা ব্যয়িত হচ্ছে বাণিজ্যিক ঘাটতি পূরণের জন্য, ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য, (ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনার জন্য) ইংল্যান্ডস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনের জন্য, এবং হিন্দুস্তানে যাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে তাদের সঞ্চিত সম্পদ ইংল্যান্ডের মাটিতে বিনিয়োগ করার জন্য। আমি মনে ভারতের মতো একটি সুদূর দেশ থেকে কখনো কোনোরূপ প্রতিদানবিহীনভাবে বছরে ৩০ বা ৪০ লক্ষ পাউন্ড অব্যাহতভাবে পাচারের অশুভ প্রভাব কোনো বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে এড়ানো সম্ভব (Martin 1938, প্রথম এবং তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা)।

অর্থনৈতিক পাচারের এই প্রসঙ্গটি শেষ করার আগে এ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, অর্থনীতির সাধারণ হিসাব অনুযায়ী বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতের ধারাবাহিক এবং বিরাট পরিমাণের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের (*ট্রেড সারপ্লাস*) অপর পিঠ হওয়া উচিত ছিল

ভারতের মূলধন হিসাবে (ক্যাপিটাল একাউন্ট) বিপুল পরিমাণের উদ্বৃত্ত পুঞ্জিভূত হওয়া। কিন্তু পরিস্থিতির পরিহাস ছিল যে, মূলধনের অধিকারী হওয়ার পরিবর্তে ভারতকে ক্রমশ ঋণের জালে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছিল! যে কৌশলগত উপায়ে এবং যে কারণে বৃটিশরা এই নিষ্ঠুর ছক তৈরি করেছিল তা নিম্নরূপ। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার 'বিনিয়োগ' সহ অন্যান্য সকল ব্যয় ভারতের ঘাড়ে চাপাচ্ছিল। এরূপ চরম অপব্যবহার সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম বছরগুলিতে, অর্থনীতির অতীত সুস্থতার কারণে, ভারতের রাজস্বের হিসাবে উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছিল। কিন্তু শীঘ্রই কোম্পানি বুঝতে পারে যে, ভারতের রাজস্ব হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকাটা তাদের স্বার্থের জন্য অনুকূল নয়। বরং, ভারতের রাজস্ব হিসাবে ঋণ থাকলে এক ঢিলে অনেক পাখি মারা যেতে পারে। প্রথমত, এরূপ ঋণ ভারতীয় জনগণের কাছে, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, সমসাময়িক বৃটিশ জনসাধারণের কাছে এই ধারণা তৈরি করা যাবে যে, ভারতের সাথে বাণিজ্য এবং ভারতের উপর ঔপনিবেশিক শাসন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (এবং ১৮৫৭ সালের পর গোটা বৃটেন সরকারের) জন্য লাভজনক ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই ঋণের উপর সুদ আদায়ের কোনো সমস্যা ছিল না। ভারতের রাজস্ব থেকে আনায়াসেই এই ঋণের সুদ আদায় করা সম্ভব্য ছিল। সুতরাং, ভারতীয় ঋণ যত বেশি হবে বৃটিশদের জন্য ততো ভালো, কারণ আরও বেশি পরিমাণে ভারতের রাজস্ব থেকে সুদ আদায় করা সম্ভব হবে।

ভারতকে ঋণগ্রস্থ দেখানোর এই কৌশল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য বিশেষভাবে উপযোগী ছিল, কারণ সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে ভারত দখল করার পর এই দেশ থেকে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক যে অবিশ্বাস্য পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছিল তা ইতিমধ্যেই বৃটেনের অন্যান্য বণিক গোষ্ঠীর মধ্যে ঈর্ষার জন্ম দিয়েছিল এবং তারা ভারতের সাথে বাণিজ্যে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বাতিলের দাবি জানাচ্ছিল। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর ইউরোপের মহাদেশীয় বাজার বৃটিশ বণিকদের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে তাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ আরও বেড়ে যায়। এছাড়া, উদীয়মান বৃটিশ তুলাবস্ত্র শিল্প তার বিকাশের জন্য ভারতের বিরাট বাজারকে আরও পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিল। তার ফলে, যখন ১৮১৩ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ নবায়ন করে তখন ভারতীয় বাণিজ্যের উপর এই কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার আর মঞ্জুর করে না। বরং, ভারতকে সকল বৃটিশ ব্যবসায়ীদের জন্য

তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার এবং বিভিন্ন কাঁচামালের উৎস হিসেবে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তবে, স্পষ্টতই, অন্যান্য বৃটিশ বণিকেরা ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমঅধিকারসম্পন্ন ছিল না, কারণ ভারতের শাসক হওয়ার কারণে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিনামূল্যে (অর্থাৎ, ভারতের রাজস্ব ব্যবহার করে) ভারতীয় পণ্য কিনতে পারত এবং অন্যান্য (এমনকি এসব অন্যান্য বৃটিশ বণিকদের কাছ থেকেও!) শুল্ক আদায় করতে পারত। এভাবে সময়ে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে অন্যান্য বণিক এবং শিল্পপতিদের বিরোধিতা বাড়তে থাকে। ১৮৩৩ সালে, যখন আবার সনদ নবায়নের সময় আসে, তখন পার্লামেন্ট ভারতে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য করার অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে। অর্থাৎ, এরপর থেকে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেবল ভারতের শাসক হিসেবে থেকে যায় এবং ভারতের রাজস্ব থেকে তাদের লভ্যাংশ অর্জন করে।

এই পটভূমি থেকে বিবেচনা করলে সহজেই বোঝা যায় কেন ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথাকথিত 'ভারতীয় ঋণ' বৃদ্ধির করায় আগ্রহী এবং খুশি ছিল। ইতিমধ্যে ১৮১৩ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট একটি আইন পাশ করেছিল যার দ্বারা ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তার 'আঞ্চলিক হিসাব' *(টেরিটোরিয়াল একাউন্ট)* – অর্থাৎ ভারতের রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাবকে – কোম্পানির 'বাণিজ্যিক হিসাব' (*কমার্শিয়াল একাউন্ট*) থেকে পৃথক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশে আরও বলা হয়েছিল যে, ভারতের রাজস্ব যেসব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে সেগুলি হলো: (ক) সামরিক ব্যয়, (খ) বেসামরিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের খরচ, এবং (গ) ভারতীয় ঋণের সুদ পরিশোধ। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক হিসাব থেকে অর্জিত লাভ যেসব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে সেগুলি হলো: (ক) কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান এবং (খ) ভারতীয় ঋণ ও হোম বন্ড হ্রাস (Act 53, Geo III, 5, 155)। সুতরাং, ভারতীয় ঋণ বৃদ্ধির জন্য ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রণোদনা বোঝা বেশ সহজ। যতক্ষণ এই ঋণের সুদ ভারতীয় রাজস্ব থেকে আদায় করা সম্ভব ছিল ততক্ষণ সেই ঋণ কমানোর জন্য কোম্পানি তার বাণিজ্যিক লাভের কিছু অংশ ব্যয় করতে কেন আগ্রহী হবে? বরং, এই ব্যবস্থার অধীনে ভারতীয় ঋণ বৃদ্ধি করাই কোম্পানির স্বার্থানুকূল ছিল। ফলে ভারতীয় ঋণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭৯২ সালে মোট ভারতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০ লাখ

পাউন্ড। ১৭৯৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটিতে পৌঁছে। গভর্নর ওয়েলেসলির (অযোধ্যা ও দাক্ষিণাত্য বিজয়ের) যুদ্ধের পর, ১৮০৫ সালে, এটি ২ কোটি ১০ লাখ এবং ১৮০৭ সালে ২ কোটি ৭০ লাখে পৌঁছে। ১৮৩৭ সাল নাগাদ এই ঋণ ৩ কোটিতে উন্নীত হয়। ভারতীয় ঋণের এই ক্রমাগত বৃদ্ধির চিত্রটি বিস্তারিতভাবে রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁর গ্রন্থে বইতে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন (Dutt 1960a)[৪৫]।

১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৮৫৮ সালে পরাজয়ের মাধ্যমে তা শেষ হয়। যুদ্ধের পর ভারতের শাসনাভার ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ইংল্যান্ডের সরকার অধিগ্রহণ করে। ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেরও রাণীতে পরিণত হন। তবে এরজন্য ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে যে 'ক্ষতিপূরণ' দেওয়া হয় সেটা আসে ভারতের রাজস্ব থেকে। অর্থাৎ, ভারতের টাকা দিয়ে ইংল্যান্ডের সরকার ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারত ক্রয় করে! ১৮৩৪ সালে, যখন কোম্পানির সনদ পুনরায় নবায়ন করা হয় এবং ভারতের সাথে কোম্পানির বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন শর্ত ছিল যে, ভারতীয় রাজস্ব থেকে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের তাদের প্রতি ১০ পাউন্ড মূলধনের জন্য বার্ষিক ১০ শিলিং হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। আরও সাব্যস্ত হয় যে, ১৮৭৪ সালের পর কোম্পানির লভ্যাংশ প্রাপ্তির অবসানের বিনিময়ে প্রতি ১০০ শেয়ারের জন্য জন্য ২০০ পাউন্ড প্রদান করা হবে। আইনে আরও বলা হয়েছিল যে, যদি ১৮৫৪ সালের পর কোম্পানির অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যায়, অথবা পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব দ্বারা ভারতের মালিকানা এবং প্রশাসন থেকে কোম্পানিকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে শেয়ারহোল্ডারেরা এক বছরের মধ্যে লভ্যাংশের সমাপ্তির বিনিময়ে উপর্যুক্ত পাওনা দাবি করার অধিকারী হবেন এবং এই দাবি জানানোর তিন বছরের মধ্যে উপর্যুক্ত হারে এই পাওনা পরিশোধ করা হবে। এভাবে যখন ১৮৫৮ সালে কোম্পানি অবলুপ্ত করা হয় তখন এর শেয়ারহোল্ডাদের পুঁজি পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের দায় ভারতের রাজস্বের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এমনিতেই ১৮৫৭-৫৮ সালের স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ভার ভারতের রাজস্বের উপর চাপানো হয়েছিল। তার সাথে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মালিকদের তাদের শেয়ারের অবসানের বিনিময়ে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের দায় যোগ হওয়ার ফলে ভারতীয় ঋণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত তথাকথিত 'বিনিয়োগ' ছিল বৃটেনে ভারতীয় অর্থনৈতিক

উদ্বৃত্ত পাচারের প্রধান মাধ্যম। সে বছর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ায় এই 'বিনিয়োগে'র অবসান ঘটে। কিন্তু ততদিনে 'ভারতীয় ঋণ' বাবদ সুদ আহরণ বৃটেনে ভারতের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পাচারের আরও সূক্ষ্ম কিন্তু শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এই সুদের রূপে কী পরিমাণ অর্থ বৃটিশরা ভারত থেকে অপহরণ করে তার একটি চিত্র নীচের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়:

> ভারতের উপর রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের শেষ দশ বছরে (১৮৯১/২ - ১৯০০/১) ভারতের মোট রাজস্ব ৬৪ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ডে পৌঁছেছিল। অর্থাৎ, রাজস্বের বার্ষিক গড় পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৫০ লাখের কিছু কম। এর মধ্যে ভূমি-রাজস্ব ছাড়া আরও অন্তর্ভুক্ত ছিল রেলওয়ে, সেচ কাজ এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়। একই সময়কালে ইংল্যান্ডে ভারত সংক্রান্ত ব্যয় (তথাকথিত হোম-চার্জ) ছিল ১৫ কোটি ৯০ লাখ পাউন্ড, অর্থাৎ বার্ষিক গড়ে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ড। অতএব, ভারতে প্রাপ্ত সমস্ত রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বার্ষিক হোম চার্জ হিসাবে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। যদি আমরা এর সাথে ভারতে নিযুক্ত ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের বার্ষিক বেতনের ইংল্যান্ডে পাঠানো অংশ অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে পাচারকৃত ভারতীয় রাজস্বের মোট বার্ষিক পরিমাণ ২ কোটি পাউন্ড ছাড়িয়ে যায় (ibid, p. xi)।

১৯০০/০১ সালে ভারতের ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউন্ড। একই বছর হোম-চার্জ বাবদ ইংল্যান্ডে পাঠানো হয় ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড। সুতরাং, ততদিনে কেবলমাত্র হোম-চার্জের পরিমাণই ভারতের মোট ভূমি রাজস্বের সমান হয়ে দাঁড়ায়[৪৬]! এই হোম-চার্জের মূল অংশ ছিল 'ভারতীয় ঋণে'র উপর প্রদেয় সুদ[৪৭]। এইভাবে ক্রমে ভারতীয় ভূমি রাজস্বের প্রায় পুরোটাই সুদের আকারে ইংল্যান্ডে পাচার হয়ে যায়।

৩.৩ ভারতের বি-শিল্পায়ন

সুবিদিত, যেসব ভারতীয় পণ্য ইউরোপীয়দের এই উপমহাদেশের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ছাপা-বস্ত্র (ক্যালিকো) এবং মসলিন। বৃটিশদের দখলকৃত হওয়ার আগে কারুশিল্প এবং নগরায়নে ভারতে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু তথ্য আমরা ইতিপূর্বে

উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু ভারতের উপর বৃটিশদের শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকে সবকিছু বদলে যেতে শুরু করে। ভারতের কারুশিল্প নিরুৎসাহিত এবং ধ্বংস করা এবং ইংল্যান্ডের নবোদ্ভূত যন্ত্রশিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের নবপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করায় লিপ্ত হয়। ১৭৬৯ সালের মার্চ মাসে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ বাংলায় তাদের কর্মকর্তাদের কাছে তাদের 'সাধারণ চিঠি'তে এই নীতিটি তুলে ধরে। বৃটেনের হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটি ১৭৮৩ সালে এই চিঠিটি পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত মন্তব্য করে:

> এই চিঠিতে বাধ্যতামূলক এবং প্রণোদনামূলক উভয় ধরনের নীতির একটি নিখুঁত পরিকল্পনা রয়েছে, যা বাংলার কারুশিল্প ধ্বংস করার লক্ষ্যে খুবই প্রবল এবং কার্যকরভাবে কাজ করবে। যদি কোনো বিভ্রান্ত এড়িয়ে এই নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তাহলে তা কারুশিল্পসমৃদ্ধ এই দেশের (ভারতের) পুরো চেহারার পরিবর্তন করে দেবে এবং এই দেশকে বৃটেনের যন্ত্রশিল্পের স্বার্থের অধীনস্থ এবং এই শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারীতে পরিণত করবে (Ninth Report, পৃ. ৬৪)।

তবে, ভারতের বিষয়ে এই উদ্বেগ বৃটিশ নীতির পরিবর্তন করতে পারে না। বৃটেনে ভারতীয় তুলাবস্ত্রশিল্পের পণ্যের আমদানি হয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় অথবা আমদানির উপর প্রায় ৮০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়। কেবলমাত্র এরূপ প্রতিরক্ষা প্রাচীরের অন্তরালেই বৃটেনের তুলাবস্ত্র শিল্প বিকশিত হতে পারে। একবার বৃটেনে যন্ত্রভিত্তিক বস্ত্রশিল্প বিকশিত হওয়ার পর ভারতকে এই শিল্পোৎপাদনের বাজারে রূপান্তর করা হয়। এ বিষয়ে এইচ. এইচ. উইলসনের নিম্নরূপ পরিলক্ষণের প্রতি নজর দেওয়া যেতে পারে:

> এটি ভারতবর্ষের প্রতি ইংল্যান্ড (যার উপর ভারত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল) কর্তৃক সাধিত অন্যায়ের একটি অত্যন্ত দুঃখজনক উদাহরণ। ১৮১৩ সালে প্রদত্ত সাক্ষ্যে বলা হয়েছিল যে, সেই সময় পর্যন্ত ভারতের তুলাবস্ত্র কারুশিল্প ও রেশমজাত পণ্য ইংল্যান্ডে তৈরি পণ্যের তুলনায় ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ কম দামে বৃটিশ বাজারে লাভজনকভাবে বিক্রি করা যেত। ফলে, ইংল্যেন্ডের বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করার জন্য ভারতীয় পণ্যের উপর ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ শুল্ক অথবা সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যদি

এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা হতো, অর্থাৎ এই ধরনের চরমমাত্রার শুল্ক আরোপ এবং আমদানির উপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জারী না করা হতো, তাহলে পেসলি এবং ম্যানচেস্টারের কারখানাসমূহ শুরুতেই বন্ধ হয়ে যেত, এবং এমনকি পরবর্তীতে আবিষ্কৃত বাষ্পের শক্তির দ্বারাও পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হতো না। ইংল্যান্ডের যন্ত্রভিত্তিক বস্ত্রশিল্প বিকশিত হতে পেরেছিল ভারতের বস্ত্র কারুশিল্পকে বলি দেওয়ার বিনিময়ে। ভারত যদি স্বাধীন হতো, তাহলে সে প্রতিশোধ নিতো, বৃটিশ পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞামূলক শুল্ক আরোপ করতো, এবং তার নিজস্ব উৎপাদনশীল কারুশিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতো। ভারত সেই আত্মরক্ষার সুযোগ পায়নি। অচেনা এক দেশের করুণার উপর সে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ভারতের উপর বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের উৎপাদিত পণ্য জোর করে এবং কোনো রকম শুল্ক প্রদান না করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বৃটেনের শিল্পপতিরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিযোগী ভারতের কারুশিল্প, যার সাথে সমান শর্তে লড়াই করে সে টিকে থাকতে পারতো না, তাকে অবদমিত করে এবং গলা টিপে হত্যা করে[৪৯]।

পরবর্তীকালে, যখন ভারতে বৃটিশ প্রশাসন স্বীয় রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা বস্ত্রশিল্পের পণ্যের উপর মাত্র পাঁচ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করে, তখন লন্ডনস্থ বৃটিশ সরকার তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে। যখন ১৮৪০ সালের পর থেকে বৃটিশরা মুক্ত বাণিজ্যের ওকালতি শুরু করে, তখন জার্মান অর্থনীতিবিদ ফ্রিডরিখ লিস্ট তাদের এই ভণ্ডামির নিম্নরূপ তীক্ষ্ণ বর্ণনা দিয়েছিলেন:

> যদি ইংরেজরা ইংল্যান্ডে ভারতীয় তুলা ও রেশমশিল্পের পণ্য ইংল্যান্ডে বিনাশুল্কে আমদানির সুযোগ দিত, তাহলে তাদের তুলা ও রেশম কারখানাগুলি অবধারিতভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ভারতের কেবল সস্তা শ্রম এবং কাঁচামালের সুবিধাই ছিল না, বরং তার আরও ছিল বহু শতাব্দীর অনুশীলনের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা। অবাধ বাণিজ্যের পরিস্থিতিতে ভারতের এই সুবিধাগুলির প্রভাব কোনোভাবেই ব্যর্থ হতো না।
>
> কিন্তু ইংরেজরা ভারতের কারুশিল্পের অধীনস্থ হওয়ার জন্য এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেনি। তারা চেয়েছিল বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং

তারা অনুভব করেছিল যে, অবাধ বাণিজ্যের পরিস্থিতিতে সেই দেশই শেখরে পৌঁছাবে যে শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে। পক্ষান্তরে, যে দেশ কৃষিপণ্য রপ্তানি করে সে দেশ অধীনস্থ হয়ে পড়বে। উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে ইংল্যান্ড ইতিমধ্যেই এই নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিল। সেকারণে এসব উপনিবেশে সে একটি ঘোড়ার-খুর পোতার পেরেক তৈরিরও অনুমতি দেয় নি এবং সেখানে নির্মিত কোনো ঘোড়ার-খুর পোতার পেরেক ইংল্যান্ডে আমদানি করতে দেয়নি। সুতরাং, কীভাবে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে যে, সে তার শিল্পোৎপাদনের নিজস্ব বাজার, যে শিল্প তার ভবিষ্যতে শেখরে ওঠার ভিত্তি, তা হিন্দুদের মতো এত অসংখ্য, মিতব্যয়ী, অভিজ্ঞ, এবং পুরানো উৎপাদন ব্যবস্থায় এত পারদর্শী লোকদের কাছে ছেড়ে দেবে?

সুতরাং, তাদের কারখানায় উৎপাদন করা যায় এমন ধরনের সব সুতি এবং রেশমের বস্ত্র ভারত থেকে আমদানি নিষিদ্ধ করেছিল। এই নিষেধাজ্ঞাটি ছিল সর্বাঙ্গীন এবং অনতিবিলম্বে কার্যকর। ইংরেজরা স্বীয় দেশে ভারতে উৎপাদিত বস্ত্রের একটি সুতা ব্যবহারেরও অনুমতি দিতে রাজী ছিল না। ভারতের চমৎকার এবং সস্তা কোনো কাপড়ই সে বরদাশত করতে রাজী ছিল না। সে বরং তার নিজস্ব নিম্নমানের অথচ ব্যয়বহুল বস্ত্র ব্যবহার করাকেই শ্রেয় মনে করে। তবে, সে ইউরোপের মহাদেশীয় দেশগুলিকে কম দামে ভারতের মোটা ও সূক্ষ্ম কাপড় সরবরাহ করতে বেশ ইচ্ছুক ছিল। ভারতীয় বস্ত্রের কম দামের সমস্ত সুবিধা সে স্বেচ্ছায় এসব দেশের ভোক্তাদের কাছে সমর্পণে রাজী ছিল, যদিও সে নিজে তা গ্রহণ করতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিল না!

ইংল্যান্ডের এমন আচরণ কী বোকামি ছিল? মূল্য সংক্রান্ত অ্যাডাম স্মিথ এবং জ্যাঁ বাপ্তিয়ার তত্ত্ব নিঃসন্দেহে তাই বলে। কারণ, তাঁদের মতে, ইংল্যান্ডের উচিত ছিল তার যা প্রয়োজন তা সেখান থেকে কেনা যেখানে এগুলোর মান সবচেয়ে ভাল এবং দাম সবচেয়ে কম। সুতরাং, যে পণ্য সে অন্যত্র আরও কম দামে কিনতে পারে তা নিজ দেশে আরও বেশী ব্যয় করে উৎপাদন করা একটা বোকামি ছিল, যখন একই সাথে কম দামের সেই পণ্য বৃটেন ইউরোপীয় মহাদেশীয় দেশসমূহকে সরবরাহ করছিল (List 1885, পৃ. 42)।

বৃটিশ আচরণের বৈপরীত্যটি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত করার পর ফ্রিডরিখ লিস্ট এর কারণটি ব্যাখ্যা করেন নিম্নরূপ:

> আসলে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। কাঁচামাল আমদানি এবং শিল্প সামগ্রী রপ্তানি করার নীতি প্রতিপালনের মাধ্যমে ইংরেজ মন্ত্রণালয় বস্তুত আমাদের যে (মূল্য তত্ত্বের বিপরীতে) 'উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব' সেটাই বাস্তবে প্রয়োগ করেছিল, যদিও যে ভিত্তির উপর এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত তা তাঁরা কখনো পরীক্ষা করে দেখেনি। ইংরেজ মন্ত্রীরা কারুশিল্পের কম দামী এবং পচনশীল পণ্য সংগ্রহে উৎসাহী ছিল না। তাদের আগ্রহ ছিল আরও ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদী যন্ত্রশিল্পের শক্তি অর্জনের প্রতি।

সুতরাং, আমরা দেখি যে, বৃটেনে সংঘটিত প্রথম শিল্প বিপ্লবের অপর-পিঠ ছিল ভারতের বি-শিল্পায়ন। শুধু জ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলতে হয় যে, নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদেরা এই সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় প্রধানত দুই কারণে। প্রথমত, তাদের অনেকে উপনিবেশ বলতে কেবল আমেরিকা তথা পশ্চিম গোলার্ধকে বুঝেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তারা কালাক্রম তথা সময়কালের দৃষ্টিকোণ থেকে 'আগে-পরে'র পার্থক্যের প্রতি প্রয়োজনীয় নজর দেন না। শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার আগে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃটেন যে ধরণের নীতি অনুসরণ করেছিল, শিল্প বিপ্লব ঘটার পর তাদের সেই নীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। তবে উভয় পর্যায়ে যেটি অক্ষুণ্ন থাকে তা হলো বৃটেনের স্বার্থ। আগের প্রতিরক্ষামূলক বাণিজ্য নীতি যেমন বৃটেনের শিল্প বিপ্লব সংঘটনের জন্য প্রয়োজন ছিল, তেমনি পরের মুক্তবাণিজ্যের নীতিও বৃটেনের নতুন যন্ত্রশিল্পের আরও বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল।

৩.৪ ভারতকে মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা

শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর বৃটেনের (শিল্পপণ্যের বাজারজাতকরণ ছাড়া) আরেক যে প্রয়োজন দেখা দেয় তা হলো উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগের জন্য লাভজনক ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া। বলাবাহুল্য, আমরা এখানে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো বাণিজ্যে 'বিনিয়োগে'র কথা বলছি না। উপরের দুই উপ-অনুচ্ছেদে আমারা দেখেছি যে, ভারত অধিকৃত হওয়ার পর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনিয়োগ ছিল ভারতের রাজস্ব ব্যবহার করে ইংল্যান্ডে রপ্তানির জন্য ভারতীয় পণ্য ক্রয়, যা ছিল বিনিময়হীন বাণিজ্য তথা লুণ্ঠনের সমার্থক। 'বাণিজ্য বিনিয়োগে'র পরিবর্তে

এখানে আমরা আলোচনা করছি 'শিল্প পুঁজি বিনিয়োগে'র। ভারতে বৃটিশ শিল্প পুঁজির বিনিয়োগের প্রধান মূর্ত রূপটি ছিল রেলপথ নির্মাণ। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, এই বিনিয়োগও ঔপনিবেশিক চরিত্র গ্রহণ করে।

প্রথমত, ভারতে রেলপথ নির্মাণে বৃটিশ বিনিয়োগ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত প্রয়োজনের মেটানোর চেয়ে ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং বৃটিশ ভারী শিল্প এবং মূলধনের স্বার্থের জন্য বেশি প্রয়োজন ছিল। বিষয়টি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন রেলপথ নির্মাণে বিনিয়োগের সাথে সেচকার্যে বিনিয়োগের তুলনা করা হয়। সামন্ত ভারতে সেচ বেশ প্রচলিত ছিল। ভারতের উত্তর এবং পশ্চিম অংশে সেচ স্থায়ী এবং প্লাবিত খাল দ্বারা পরিচালিত হতো। সে তুলনায় দাক্ষিণাত্যে জলাধার ব্যবহার করে সেচ বেশি প্রচলিত ছিল, যদিও এই অঞ্চলের নদী উপত্যকায় খাল-নির্ভর সেচও ব্যবহৃত হতো। সামন্ততান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ পর্ব এবং বৃটিশ কর্তৃক ভারত দখলের জন্য সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এসব সেচকাঠামোর বেশিরভাগই অব্যবহৃত ও পরিত্যাক্ত হয়ে পড়ে। স্বীয় শাসন সুসংহত করার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের পুরাতন সেচ কাঠামোগুলির কিছু পুনরুজ্জীবিত করার এবং কিছু নতুন নির্মাণের আগ্রহ দেখিয়েছিল। যদিও ভারতীয় রাজস্ব ব্যবহার করেই এ সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল, তবে উৎসাহব্যঞ্জক দিকটি ছিল যে, এসব প্রকল্প বেশ লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এ থেকে ধারণা করা সম্ভব ছিল যে, সেচ-কাঠামো অভিমুখে আরও বিনিয়োগ অগ্রসর হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বৃটিশ শিল্পপতিদের অভিমত ছিল যে, খালের চেয়ে রেলপথ ভারতের বিস্তীর্ণ দুর্গম এলাকাকে তাদের পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য আরও দ্রুত উন্মুক্ত করবে এবং একইসাথে তাদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহে সহায়তা করবে। তদুপরি, রেলপথ নির্মাণ বৃটিশ লোহা ও ইস্পাত শিল্পের জন্য একটি চমৎকার বাজার যোগাবে। এসব কারণে বৃটিশ পার্লামেন্ট ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ইংল্যান্ডের সরকার উভয়ের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে যাতে লোকসান দিয়ে হলেও তারা যেন আরও বেশি করে ভারতে রেলপথ নির্মাণ করে। দ্বিতীয়ত, রেলপথে বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য ভারতের রাজস্ব ব্যবহারের আরেকটি ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে। এই ব্যবস্থার ইতিহাস নিম্নরূপ।

প্রাথমিকভাবে, ভারতে রেলপথ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ১৮৪৫ সালে ঈস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি এবং গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে কোম্পানি নামে দু'টি বেসরকারি কোম্পানি গঠিত হয়। কিন্তু সরকারি সাহায্য ছাড়া এসব কোম্পানির প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা উদ্যোক্তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে রেলপথ নির্মাণে ব্যয়িত মূলধনের উপর সুদের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে রেল নির্মাণ কর্মসূচির প্রতি সহায়তা প্রদানে সম্মতি জানাতে হয়। সাব্যস্ত হয় যে, রেলওয়ে থেকে প্রাপ্ত বাৎসরিক নিট আয় ব্যয়িত মূলধনের পাঁচ শতাংশের কম হলে, ভারতের রাজস্ব থেকে এই পার্থক্য পূরণ করা হবে। অন্যদিকে, রেলওয়ে থেকে নিট আয় পাঁচ শতাংশের বেশি হলে, অতিরিক্ত আয়ের অর্ধেক রেল কোম্পানিগুলির নিকট এবং বাকি অর্ধেক ভারত সরকারের কাছে যাবে। ১৮৫৮ সাল নাগাদ তিনটি কোম্পানির অধীনে রেললাইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলো হলো ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে এবং মাদ্রাজ রেলওয়ে। এর প্রতিটি ছিল লোকসানি প্রতিষ্ঠান এবং এসব লোকসান পুষিয়ে পাঁচ শতাংশ হারে মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য ভারতের রাজস্ব থেকে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল সারণী-৪ সে সংক্রান্ত কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরে।

সারণী ৪. বৃটিশ রেলপথ কোম্পনিসমূহকে ভারতীয় রাজস্ব থেকে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ (পাউন্ড)

বছর	পূর্ব ভারতীয় রেলপথ	দাক্ষিণাত্যের রেলপথ	মাদ্রাজ রেলপথ
১৮৪৯	৫,৬০২		
১৮৫০	১৭,৪৭১	৩,০৬৩	
১৮৫১	৩৭,১৮৫	৬,৩১৯	
১৮৫২	৪৫,২৩৪	১৬,৩১০	
১৮৫৩	৫২,০৭১	২২,৮২৫	
১৮৫৪	৮৮,৮৮৪	২৫,০০২	৯,৭০৩
১৮৫৫	১,৯৫,৭৩০	৩০,২৫৯	১৮,১১৫
১৮৫৬	২,৯৭,৩৯০	৬০,৩৭০	৪২,৫১০
১৮৫৭	৩,৫৪,৫১১	১,১৬,৬১২	৮১,১৩৯
১৮৫৮	৪,৩৩,৯৬৮	১,৭৫,২৮৯	১,০৯,২৬৭
মোট	১৫,২৮,০৪৬	৪,৫৬,০৪৯	২,৬০,৭৩৪

সূত্রঃ Dutt (1960b, পৃ. 123)

এসব ক্ষতি সত্ত্বেও নতুন রেলপথ নির্মাণের জন্য উৎসাহের কোনও ঘাটতি ছিল না। বলার অপেক্ষা রাখে না, ভারতের রাজস্ব দ্বারা নিশ্চিত পাঁচ শতাংশ হারের মুনাফা এই উৎসাহের মূল কারণ ছিল। এই নিশ্চিত মুনাফার কারণে ১৮৫৮ সালের আগেই ভারতের প্রায় প্রতিটি অংশে নতুন নতুন কোম্পানি রেললাইন নির্মাণ শুরু করে। বিদ্যমান বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে যখন নতুন রেললাইন নির্মাণ কিছুটা বিলম্বিত হয়, তখন বৃটেনের শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা এতটাই বিরক্ত হয়ে ওঠে যে, এই বিলম্বের তদন্তের জন্য হাউস অফ কমন্স একটি কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়।

ভারতের রাজস্বের ভিত্তিতে নিশ্চিত মুনাফা দ্বারা তাড়িত হয়ে রেলপথ নির্মাণের এই হিড়িক ভারতের রাজস্বের ব্যাপক অপচয় এবং ক্ষতির কারণ হয়। এই দাবির সত্যতা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করার পরিবর্তে আমরা কেবল গভর্নর লরেন্স এবং গভর্নর মেয়োর অধীনে যিনি ভারতের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সেই উইলিয়াম ম্যাসির নিম্নলিখিত বিবৃতিটি লক্ষ্য করতে পারি:

> পূর্ব ভারত রেলওয়ে নির্মাণে যতটা ব্যয় হওয়া উচিত ছিল তার দ্বিগুণ না হলেও অনেক বেশি ব্যয় হয়েছিল। প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল এবং ঠিকাদারদের ব্যয় সাশ্রয়ের কোনো ইচ্ছাও ছিল না। ইংরেজ পুঁজিপতিদের কাছ থেকে সমস্ত অর্থ আসছিল, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ভারতের রাজস্বের ভিত্তিতে পাঁচ শতাংশ হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রদত্ত তহবিল হুগলি নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল নাকি ইট এবং চুন-সুড়কিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছিল তা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ফলে, বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল এবং আমার ধারণা পূর্ব ভারত রেলওয়ের মাইল প্রতি ৩০,০০০ রুপি ব্যয় করা হয়েছিল। আমার মনে হয় এর চেয়ে খরচের বাহুল্যসম্পন্ন আর কোনো নির্মাণকাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না (১৮৭১ সালের রিপোর্ট, প্রশ্ন ৮৮৬৭)।

এর সাথে আমরা ১৮৭৩ সালের বৃটেনের সংসদীয় কমিটিতে লর্ড লরেন্সের করা নিম্নলিখিত মন্তব্যটি যোগ করতে পারি:

> পাঁচ শতাংশ হারের মুনাফার নিশ্চয়তা পেলে পুঁজিপতিরা যেকিছুতে রাজি হবেন। সেটি সফল হোক কিংবা নাহোক, তা নিয়ে তাদের খুব একটা পরোয়া নেই। সুদের হার হিসেবে পাঁচ শতাংশ এত ভালো যে, সেটা পেয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকে। তাদের পুঁজি দিয়ে কী করা হচ্ছে সেটা তারা জানতেও চায় না। এটাই ছিল রেলওয়ের নির্মাণের খরচ যতটা হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে বেশি হওয়ার একটি কারণ (১৮৭৩ সালের রিপোর্ট, প্রশ্ন ৪৫৮৯)।

মাইল-প্রতি রেলপথ নির্মাণে এই অতিরিক্ত ব্যয় সত্ত্বেও এবং রেলপথ পরিচালনায় লোকসান সত্ত্বেও রেলপথ দৈর্ঘ্যের অবিরাম বৃদ্ধি বজায় থাকে। লর্ড লরেন্সের অনুমান অনুসারে, ১৮৬৭ সাল নাগাদ ভারতীয় রাজস্ব থেকে রেলওয়ে বাবদ নেট পরিশোধের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউন্ড[৫০]। ১৮৭১ সাল নাগাদ ভারতীয় রেলওয়ের জন্য (পাঁচ শতাংশ হারে মুনাফার নিশ্চয়তা সহকার) সংগৃহীত মূলধনের মোট পরিমাণ ছিল ৯,৪৭,২৫,০০০ পাউন্ড। ভারত সরকার সরাসরি আরও ৫৩,৯৮,০০০ পাউন্ড ব্যয় করে। সুতরাং, মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ কোটি পাউন্ডেরও বেশি। এই সময়ের মধ্যে প্রধান ট্রাঙ্ক লাইনগুলিসহ রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৫,৮৭২ মাইল। প্রকৃতপক্ষে, সেই বছরের সরকারী ভারতীয় ইতিহাসে ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছিল যে 'রেলপথের নির্মাণ এখন প্রায় সম্পূর্ণ। নির্মাণকাজের জন্য উচ্চব্যয়ের পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে আশা করা যায় যে, আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে'[৫১]। কিন্তু তা হওয়ার ছিল না। বস্তুত, পরবর্তী দশকগুলিতে রেলপথ নির্মাণযজ্ঞ আরও জোরেশোরে অগ্রসর হয়। ১৯০১ সালের মধ্যে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ১৮৭১ সালের তুলনায় চারগুণ বেড়ে ২৫,৩৭৩ মাইলে পৌঁছে, এবং এর জন্য মোট ব্যয় হয় ২২,৬৭,৭৩,২০০ পাউন্ড।

রেলপথের এই বিপুল সম্প্রসারণ ঘটছিল এমন এক সময় যখন সেচের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ মারাত্মকভাবে অবহেলিত হচ্ছিল। রেলপথের নিশ্চয়ই অনেক উপকারিতা ছিল। বিশেষ করে, দুর্ভিক্ষের সময় পীড়িত এলাকাসমূহে দ্রুত খাদ্যশস্য পরিবহনে রেলপথ সহায়তা করেছিল। তবে, স্যার আর্থার কটন যেটা লক্ষ করেছেন, সেচকার্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে, রেলপথ তা করে না। ফলে, উনিশ শতকের শেষের দিকে করাল দুর্ভিক্ষ যেভাবে ভারতকে ঘন ঘন আক্রান্ত করে তা থেকে রেলপথের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ভারতকে রক্ষা করতে পারেনি। ফলে অবাক হওয়ার

কিছু নেই যে, ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে, 'সেচ-কাঠামোর সম্প্রসারণের মাধ্যমে (দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে) আরও বেশি সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে' (দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রতিবেদন ১৮৯৮, পৃ. ৩৩০)।

১৮৭১, ১৮৭২, ১৮৭৩ এবং ১৮৭৪ সালের অর্থ কমিটির তদন্তে রেলপথ নির্মাণে অযাচিত ব্যয়বহুলতার চিত্র স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, গ্যারান্টিযুক্ত মুনাফা হারের অধীনে বেসরকারি কোম্পানিগুলি দ্বারা বিনিয়োগের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং এর পরিবর্তে রাষ্ট্র নিজে ঋণ গ্রহণ করে ভবিষ্যতে রেলপথ নির্মাণ করবে। এই নতুন ব্যবস্থা কয়েক বছর ধরে অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষ এবং ১৮৭৮ সালের আফগান যুদ্ধ রেলপথ নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। এরপর আবারও গ্যারান্টিযুক্ত মুনাফা ছাড়াই বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে রেলপথ নির্মাণে উৎসাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু বৃটিশ পুঁজিপতি শ্রেণি জানত যে, তারা সহজেই ভারতের ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে গ্যারান্টিযুক্ত মুনাফা হারের ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য করতে পারবে, তাই তারা এই নতুন প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। আরও কয়েক দফা বিতর্কের পর, ভারতের ঔপনিবেশিক সরকার পুনরায় ভারতের রাজস্ব থেকে গ্যারান্টিযুক্ত মুনাফার ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে আবার রেলপথ নির্মাণ শুরু হয় এবং এমনকি বার্মা এবং চীনের নিকটবর্তী লাখিও নামক স্থান পর্যন্ত রেলপথ তৈরি করা হয় (যদিও সেখান পর্যন্ত কোনো চলাচল ছিল না)। এমনিভাবে ভারতীয় রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ এমনসব প্রকল্পে অপচয় করা হয় যেগুলো থেকে ভারতের করদাতাদের লাভবান হওয়ার কিছু ছিল না।

সুতরাং, আমরা দেখি যে, শিল্প বিপ্লবের আগে, শিল্প বিপ্লবের সময়, এবং এই বিপ্লবের পরও ভারতের ভূমিকা বৃটেনের জন্য অপরিহার্য ছিল। এই ভূমিকার অস্বীকার নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্যার একদিকে জ্ঞানগত সংকীর্ণতা এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য-প্রোথিত অহংবোধের পরিচয় দেয়।

উপসংহার

উপরের তিনটি অনুচ্ছেদে পরিবেশিত প্রথম শিল্প বিপ্লবের সাধারণভাবে বৈদেশিক এবং বিশেষত ভারতীয় সংযোগ সংক্রান্ত নয়া ইতিহাসবিদ্যার

অভিমতসমূহের বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা আমাদেরকে অনিবার্যভাবে নিম্নরূপ উপসংহারের দিকে নিয়ে যায়।

আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ করেছি, ভারতের সাথে সংযোগ প্রমাণিত হলেই প্রথম শিল্প বিপ্লবের বৈদেশিক সংযোগের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তৃতীয় অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত বৃটিশ ভারতের ইতিহাসের কিছু দিকের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা স্পষ্টভাবে দেখায় যে, বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলি ভারতের অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত এবং নির্ভরশীল ছিল। বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল ভারতের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত। পরিসরের সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা এই প্রবন্ধে বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ নির্ণয়ের বিষয়টি আলোচনা করিনি। এই সময়কালের বৃটিশ মূলধন বাজারের সম্ভাব্য অপূর্ণতা এ বিষয়ক আলোচনার আরেকটি জনপ্রিয় বিষয়। পরবর্তীকালের মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের (অন্তত এর প্রাথমিক পর্যায়ের) জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ স্বল্প ছিল, কারণ এই পর্যায়ে শিল্পের পুঁজি-ঘনত্ব কম ছিল। সে কারণে অনেক সময় বলা হয় যে, বৃটিশ শিল্প বিপ্লব ছিল 'সস্তা'। কিন্তু যতই পরিমিত পরিমাণের হোক না কেন, পুঁজির প্রয়োজন ছিল এবং উদ্যোক্তাদের তা সংগ্রহ করতে হয়েছিল। সুবিদিত, ইতিহাসবিদ এশটনের (Ashton 1948) প্রতিপাদ্য যে, নিম্ন সুদহার বৃটিশ শিল্প বিপ্লব সংঘটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এমন যুক্তিও রয়েছে যে মূলধনের অভাবই বৃটিশ শিল্প বিপ্লবকে স্বল্প পুঁজি-ঘনত্বসম্পন্ন হতে বাধ্য করেছিল। এসব বিভিন্ন তত্ত্ব ও প্রতিপাদ্য দেখায় যে, বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজিগঠনে ভারত থেকে আহরিত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের ভূমিকা কিছুতেই লঘু হতে পারে না। তদুপরি, লক্ষণীয়, এটা প্রমিত ধরনের বাণিজ্য থেকে অর্জিত মুনাফা ছিল না। এটা ছিল ভারতের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের সরাসরি, বিনিময়হীন আত্মসাতকরণ।

বৃটিশ অধিকৃত ভারতের ইতিহাস আরও দেখা যায় যে, বৃটিশ যন্ত্রভিত্তিক তুলাবস্ত্র শিল্প – যেটা ছিল বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের সূচনাকারী এবং প্রধান খাত – তার উত্থান ঘটেছিল ভারতের তুলাবস্ত্র উৎপাদনকারী কারুশিল্পের ধ্বংসের বিনিময়ে। এই বিজয় অর্থনৈতিক তুলনামূলক সুবিধার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। বরং নিষ্ঠুর রাজনৈতিক শক্তি এই বিজয়ের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্প বিপ্লব সংঘটনে

প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হওয়ার পর বৃটেন ভারতকে তার যন্ত্রশিল্প দ্বারা উৎপাদিত তুলাবস্ত্র বিক্রয়ের একটি প্রধান বাজার হিসেবে ব্যবহার করে। স্থানাভাবে এই প্রবন্ধে বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কৃষি কাঁচামাল, যেমন তুলা এবং নীলের সরবরাহকারী হিসেবে ভারতের ভূমিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করিনি। এসব ক্ষেত্রেও অসম বাণিজ্য এবং নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগের জাজ্জ্বল্যমান ইতিহাস রয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে আমরা আরও দেখেছি যে, সফল শিল্পায়নের পর এবং অত্যন্ত অসম বন্টনের কারণে, বৃটেনে যখন পুঁজি 'উদ্বৃত্ত' হয়ে ওঠে, তখন আবার ভারতকে এই পুঁজি বিনিয়োগের বন্দী চারণক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রেও 'ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন' সংক্রান্ত অর্থনীতির সাধারণ নিয়মটি অনুসরণ করা হয় না। বরং, ভারতের রাজস্ব দ্বারা নিশ্চয়তাসম্পন্ন মুনাফার এক ঝুঁকিহীনব্যবস্থার অধীনে রেলপথ নির্মাণে এই বিনিয়োগ ঘটে এবং প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকে।

সুতরাং, শুধুমাত্র বৃটিশ ভারতের ইতিহাসই দেখায় যে, প্রথম শিল্প বিপ্লবকে কিছুতেই বৃটেনের একটি অভ্যন্তরীণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তদুপরি, আমরা দেখেছি যে, ভারতে বৃটিশদের বাণিজ্যের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল অতলান্তিক মহাসাগর-কেন্দ্রিক ত্রিকোণ বাণিজ্যের, তথা নব-আবিষ্কৃত আমেরিকা ও আফ্রিকায় বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপন এবং সেখানকার সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়ার। সুতরাং, নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রবক্তাদের কর্তৃক প্রথম শিল্প বিপ্লবকে শুধুমাত্র বৃটেনের বিষয় এবং তাতে বহির্বিশ্বের তথা উপনিবেশমূহের ভূমিকাকে লঘু করে দেখার যে প্রবণতা আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে লক্ষ করেছি তা যে ভ্রান্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাস্তব সত্য হলো এই যে, শিল্প বিপ্লব ছিল একটি বৈশ্বিক ঘটনা। এটা ছিল বিশ্ব-পরিধিতে ঘটমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের সম্মিলিত ফলশ্রুতি এবং তাতে এশিয়া, আফ্রিকা, ও আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বস্তুত তাদের ভূমিকা ছাড়া শিল্প বিপ্লব সম্ভব ছিল না এবং মানবজাতি শিল্পের যুগে পৌঁছাতে পারতো না।

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ইতিহাসবিদরা প্রথম শিল্প বিপ্লবের পেছনের বিপুল বৈশ্বিক প্রক্রিয়ায় তাদের নিজ নিজ ভূমিকা তুলে ধরেছেন। উইলিয়ামস (Williams 1944) এবং ফ্রাঙ্কের (Frank 2005) মতো লেখকরা প্রথম শিল্প বিপ্লব সংঘটনে আফ্রিকান এবং ক্যারিবিয়ান অর্থনীতির

গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক অবদানের সপক্ষে যে পরিমাণ প্রমাণ এবং যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তার বিরুদ্ধে থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কির মতো নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদের উপস্থাপিত তথ্য-পরিসংখ্যান নিতান্তই অপর্যাপ্ত এবং ভ্রান্ত।

প্রথম অনুচ্ছেদের আলোচনায় আমরা দেখেছি, নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রবক্তাদের একটি সাধারণ প্রবণতা হলো হলো বিষয়সমূহকে খুব সাধারণীকৃত এবং বিমূর্ত পর্যায়ে বিবেচনা করা। তারই প্রতিফলন আমরা দেখি তাদের কারো কারো 'সরবরাহ নিজেই চাহিদা তৈরি করে' প্রতিপাদ্যকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরার মধ্যে, যার ফলে চাহিদার কোনও স্বাধীন ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়। লক্ষণীয়, 'সরবরাহ নিজেই চাহিদা তৈরি করে' কথাটি প্রযোজ্য হতে পারে কেবল দীর্ঘমেয়াদী বিচারে এবং সংযোগ (*মেডিয়েশন*) সংক্রান্ত উপযোগী অনুমানের ভিত্তিতে। কিন্তু স্বল্পমেয়াদী ফলাফলের মধ্য দিয়েই ক্রমান্বয়ে দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলে পৌঁছানো সম্ভব। অথচ, স্বল্পমেয়াদে চাহিদার স্বতন্ত্র কিংবা স্বয়ম্ভূ বৃদ্ধি ঘটতে পারে এবং তা সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য একটি প্রবল প্রণোদনা হিসেবে কাজ করতে পারে। 'প্রতিস্থাপন সম্ভাব্যতা' সংক্রান্ত প্রতিপাদ্য সম্পর্কেও নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রবক্তারা একই ধরণের একদেশদর্শীতা প্রদর্শন করেন। লক্ষণীয়, যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'প্রতিস্থাপন সম্ভাব্যতা' থেকে থাকে, তাহলে সপ্তদশ শতাব্দীতেও 'প্রতিস্থাপন সম্ভাব্যতা' ছিল। তা সত্ত্বেও শিল্প বিপ্লব সপ্তদশ শতাব্দীতে সংঘটিত না হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং, 'প্রতিস্থাপন সম্ভাব্যতা' সংক্রান্ত বিমূর্ত ধারণা দিয়ে শিল্প বিপ্লব ব্যাখ্যা করা যায় না। সংক্ষেপে, যেন-তেন ভাবে উপস্থাপিত বিমূর্ত প্রস্তাবনা দিয়ে ইতিহাস হয় না। ইতিহাসের জন্য আলোচনাকে নামতে হয় মূর্ত-সুনির্দিষ্টতায়।

নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় বড় দুর্বলতা লক্ষ করা যায় কালাক্রম (*ক্রোনোলজী*) অনুসরণের ক্ষেত্রে। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব ঘটে যাওয়ার বহু পরে একটি ক্যারিবিয়ান দেশে দাসভিত্তিক খামার (*প্ল্যানটেশন*) অলাভজনক বলে প্রমাণিত হওয়ার ঘটনাকে (যদিওবা সত্য হয়) শিল্প বিপ্লবে আফ্রিকার উপর দাসপ্রথা আরোপ এবং তার ভিত্তিতে উদ্ভূত ত্রিকোণ বাণিজ্যের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। একইভাবে ঊণবিংশ শতাব্দীতে পরিলক্ষিত বৃটেনের বাণিজ্যিক শর্তের উন্নতি দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত শিল্প বিপ্লবকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস সঙ্গত নয়।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে কার্যকারণ উদঘাটনের সাফল্যের প্রমাণ কালাক্রমের মধ্যে নিহিত। যদি 'কিছু' সংঘটনে 'অন্যকিছু' ভূমিকা রেখে থাকে তবে সেই অন্যকিছুকে কিছুর আগে ঘটতে হবে। সেজন্যই সঠিক কালাক্রম রক্ষা ইতিহাসের জন্য এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসের তৃতীয় বড় দুর্বলতা হলো একটি নতুন ধরণের অর্থনীতির প্রথম অভ্যুদয়ের সাথে পরবর্তীতে অন্যত্র সে অর্থনীতির বিস্তৃতির মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ও সচেতনতার অভাব। প্রথম অনুচ্ছেদে আমরা তারই প্রতিফলন দেখি যখন দাবী করা হয় যে, কোনো উপনিবেশ ছাড়াই সুইটজারল্যান্ড শিল্পায়িত হতে পেরেছে; কাজেই ইংল্যান্ডের পক্ষেও কোনো উপনিবেশ ছাড়াই প্রথম শিল্প বিপ্লব অর্জন সম্ভব ছিল। ইতিহাস হলো যা ঘটেছে তা কীভাবে ঘটেছে তা সততার সাথে ব্যাখ্যা করা। সত্য হলো যে, ইংল্যান্ডকে শিল্প বিপ্লবের আগে ভারতের মতো একটি বিশাল এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশকে উপনিবেশ হিসেবে পেতে হয়েছে। ভারতের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত আহরণ করতে হয়েছে এবং ভারতকে বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানবজাতির ইতিহাস দেখায় যে, নতুন ধরনের অর্থনীতির অভ্যুদয়ের জন্য বহু পূর্বশর্তের পূরণের প্রয়োজন হয়। এই পূর্বশর্তগুলি সময় পরিক্রমায় বিভিন্ন স্থানে বিকশিত হয়। যখন এসব শর্ত একত্রিত হয় এবং উপযুক্ত সংশ্লেষণ অর্জন করে কেবল তখনই নতুন অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। 'সম্ভাব্যতা তত্ত্ব' (*প্রবেবিলিটি থিওরি*) অনুসারে, সমস্ত এলাকায় একই সাথে এই ধরনের সম্মিলন ঘটা প্রায় অসম্ভব। অতএব, পৃথিবীর কেবল একটি কিংবা স্বল্প কয়েকটি স্থানে এই সম্মিলন ঘটে, যাকে 'কেন্দ্রবিন্দু' (*ফোকাল পয়েন্ট*) বলে আখ্যায়িত করা যায়। একবার নতুন সংস্কৃতি কেন্দ্রবিন্দুতে আবির্ভূত হলে তা 'বিচ্ছুরণ' (*ডিফুশান*) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ প্রসঙ্গে 'নবপ্রস্তর বিপ্লব' (*নিওলিথিক রেভ্যুলুশান*)-এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। গরডন চাইল্ড (Child) এবং অন্যান্য ইতিহাসবিদেরা দেখিয়েছেন যে, কৃষিনির্ভর নবপ্রস্তর যুগের অর্থনীতির অভ্যুদয়ের অসংখ্য বস্তুগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পূর্বশর্তের সম্মিলনের প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন স্থানে এসব শর্তের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। অবশেষে নিকট প্রাচ্যে এসব শর্তের সম্মিলন ঘটে এবং 'নবপ্রস্তর বিপ্লব' ঘটে, পরবর্তীতে যা অন্যত্র বিস্তৃত হয়। তখন সেখানে সকল আদি পূর্বশর্তসমূহের নতুন করে পূরিত

হওয়ার প্রয়োজন হয় না। সুইটজারল্যান্ড ছিল শিল্প বিপ্লবের বিস্তৃতির একটি উদাহরণ। এটা শিল্প বিপ্লবের আদি অভ্যুদয়ের উদাহরণ নয়। সে কারণে উপনিবেশ ছাড়াই সুইটজারল্যান্ডের পক্ষে শিল্পায়িত অর্থনীতিতে উত্তরণ অর্জন বিস্ময়ের নয়।

এরিক হবসবাম তাঁর নিজস্ব যুক্তিরচনার মধ্য দিয়ে ইতিহাস বিকাশের উপর্যুক্ত ধারণার কাছাকাছি এসেছিলেন যখন তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, অনেক দেশে একই সাথে শিল্প বিপ্লবের সংঘটন সম্ভব ছিল না, কারণ ইউরোপের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সকল দেশের পক্ষে বাকী পৃথিবীর বিশাল অংশের দখল করা সম্ভব ছিল না। বিশ্বের পরিধি সীমাবদ্ধ। ফলেই বিশ্বের দখল একটা, ইংরাজিতে যাকে বলা হয়, *জিরো-সাম গেইম*[৫২]। এই খেলায় বৃটেন জয়লাভ করে, কাজেই প্রথম শিল্প বিপ্লব বৃটেনে সংঘটিত হয়। কিন্তু শিল্প বিপ্লব বৃটেনের একার ঘটনা ছিল না। গোটা বিশ্বের ইতিহাস এই শিল্প বিপ্লবে পরিণতি পেয়েছে। কাজেই শিল্প বিপ্লবের বহিঃস্থ সংযোগ মোটেও অবহেলাযোগ্য বিষয় নয়। শিল্প বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য বৃটেনের অভ্যন্তরীণ শর্তাদি যেমন কাজ করেছে তেমনি কাজ করেছে এর বহিঃস্থ সংযোগসমূহ। এ দুইয়ের মধ্যে আবার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কও ছিল।

ইতিহাসকে অর্থনৈতিক তত্ত্বের আলোকে দেখার প্রয়াস নিন্দনীয় মোটেও নয়, বরং প্রশংসনীয়, কারণে তাতে আরও বেশী তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি লাভের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। তবে তা করতে যেয়ে যদি ইতিহাসের প্রাণকেই অস্বীকার করা হয় তবে তাতে ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। ইতিহাসকে বুঝতে হয় তার সংযোগের মধ্যে এবং তার সঠিক কালাক্রমের মধ্যে।

অন্ত্যটীকা

[১] "মিসেস নোলস, হবসন এবং আরও কয়েকজন শিল্প বিপ্লবের সাথে চাহিদার বৃদ্ধির সম্পর্কের গুরুত্বের বিষয়ে ভালভাবে অবগত ছিলেন। কিন্তু ... তারা বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং অনুন্নত বাজারে নতুন বাজারউন্মুক্ত হওয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন (Gilboy 1932, পৃ. 121)।"

[২] জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে মোকিরের মতামত ছিল যে, "যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে বহিস্থ (স্বয়ম্ভু) চরিত্রের ছিল ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও বলতে হয় যে, বর্ধিত শিল্প

উৎপাদনের চাহিদা তৈরিতে এর তাৎপর্য ছিল প্রান্তিক (Mokyr 1985, পৃ. 101)।" শিল্প বিপ্লবে কৃষি বৃদ্ধির গুরুত্ব সংক্রান্ত তার যুক্তিগুলির জন্য দেখুন (ঐ, পৃ. ৯৮-৯৯)।"

[৩] মোকির যেমন লিখেন, "চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে রপ্তানির বিষয়টির বিবেচনা জটিল হয়ে পড়ে কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপাদনশীলতার ক্রমাগত উন্নতি ঘটেছে। ফলে লেনদেন এবং পরিবহন খরচ হ্রাস পেয়েছে, এবং তার অভিঘাতে তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে বিশেষীকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে"। মোট জাতীয় উৎপাদনে রপ্তানির অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রাপ্ত লাভ জাতীয় আয়কে বর্ধিত করে। অতএব, বলা যেতে পারে যে, প্রবৃদ্ধির চূড়ান্ত কারণ ছিল সরবরাহ পরিস্থিতির পরিবর্তন, যদিও আলোচ্য অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিবর্তনকে চাহিদা রেখার স্থানান্তর (শিফট) বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই শ্রেণিকরণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো যে, সরবরাহ রেখার স্থানান্তর ঘটেছে, যার ফলে পণ্যের দাম হ্রাস পেয়েছে, এবং সে কারণে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, চাহিদা রেখা এবং সরবরাহ রেখার স্থানান্তরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা না করে পর্যন্ত রপ্তানির বৃদ্ধিকে কেবল বৈদেশিক চাহিদার বৃদ্ধির ফলশ্রুতি বলে আখ্যায়িত করা সম্ভব নয় (Mokyr 1985, পৃ. ১০০)"।

[৪] অথচ, মোকিরই উপসংহারে শিল্প বিপ্লবকে কতগুলি 'গ্যাজেটের ঢেউ' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'শিল্প বিপ্লবকে 'গ্যাজেটের ঢেউ' বলে স্কুলের শিক্ষার্থীসুলভ যে ধারণা, বাস্তবতা সম্ভবত তার থেকে খুব বেশি দূরের নয়, যদি আমরা এর সাথে যোগ করি যে গ্যাজেটসমূহ সংখ্যায় আরও "বেশী" এবং মানের দিক থেকে আরও "উন্নত" ছিল এবং যদি আমরা সাংগঠনিক পরিবর্তন, শ্রমিকদের মনোভাবের পরিবর্তন, ইত্যাদির মতো বিমূর্ত উৎকর্ষতাকে বৃহত্তর অর্থে 'গ্যাজেটে'র সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি'।

[৫] উল্লেখ্য যে, প্রসঙ্গক্রমে মোকির বিশেষ করে ঔপনিবেশিক বাজার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায়, 'এটা স্পষ্ট যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে চাহিদার সম্প্রসারণ অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃটিশ উৎপাদনকে বেশি উপকৃত করবে এবং তা মোট শিল্প চাহিদার একটি অপেক্ষাকৃত ছোট অংশের কারণ হবে। প্যারিস শান্তি চুক্তি (১৭৬৩)'র পর থেকে মোট রপ্তানিতে উপনিবেশসমূহের অংশ ৩৫ শতাংশের উপরে ওঠানামা করে, যদিও ১৭৯৩-১৮১৪ সালের তথ্য ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। ওয়াটারলুর (১৮১৫) পরে, বৃটিশ সাম্রাজ্য বৃটেনের রপ্তানির ৩০ শতাংশেরও কমের জন্য দায়ী ছিল'। ১৮৪৬-৬০ সালে, ভারতে বৃটেনের মোট রপ্তানি ছিল জার্মানিতে মোট রপ্তানির মাত্র ৮৭ শতাংশ এবং রাইন বদ্বীপের দেশসমূহে রপ্তানির তুলনায় মাত্র ৩০ শতাংশ বেশি। বৃটেন কেন 'বিশ্বের কর্মশালা' হয়ে উঠল ঔপনিবেশিক বাজারের চাহিদা তার খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা নয় (ibid, পৃ. ১০১)'।

[৬] তার ভাষায়, "চাহিদা সম্প্রসারণের বেশিরভাগ প্রচলিত উৎসই ছিল নগণ্য আকারের (ibid)"।

[৭] বিদেশী চাহিদা সম্পর্কে, ম্যাকক্লোস্কি অভিমত ছিল যে, 'বিদেশে জনসংখ্যা এবং সম্পদ বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে বৃটিশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি করেছে, তবে এই কারণে বৃদ্ধি ছিল সামান্য' (ibid)।

[৮] তবে, কিছু শিল্পের বিকাশে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই। বস্ত্রশিল্প তার একটি উদাহরণ (Thomas and McCloskey 1981, পৃ. ৮৭)। স্পষ্টতই, থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি মোকিরের এই যুক্তি উপেক্ষা করছিলেন যে, বৈদেশিক বাণিজ্য বৃটিশ তুলা বস্ত্রশিল্পের বিকাশের জন্যও তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, বিদেশী বাণিজ্য আর বৈদেশিক চাহিদা সমার্থক নয়।

[৯] এখানে উল্লেখ্য যে, থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি মনে করেন যে, পরিসংখ্যানের তুলনামূলকভাবে বেশী প্রাপ্যতার কারণে শিল্প বিপ্লবের কারণের আলোচনায় বাণিজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের ভাষায়, 'ইংরেজি শিল্প বিপ্লবের ব্যাখ্যায় বৈদেশিক বাণিজ্য খাতের প্রবৃদ্ধিকে অগ্রণী ভূমিকা প্রদানের একটি কারণ হল, আঠারো শতকের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের যুক্তিসঙ্গত নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। বস্তুত, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যানই গোটা এই শতাব্দীর জন্য লব্ধ একমাত্র বার্ষিক সিরিজ' (ibid, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮)।

[১০] বৈদেশিক বাণিজ্য খাতের প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন: 'সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য খাত দেখায় যে ১৭০০ সাল থেকে ১৭৪০ সালের মধ্যে এই খাতের বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ০.৮ শতাংশ। ১৭৪০ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে এটি প্রায় দ্বিগুণ (বার্ষিক ১.৭ শতাংশ) হয়েছিল, এবং ১৭৭০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে, এটি তিনগুণেরও বেশি (বার্ষিক ২.৬ শতাংশ) হয়েছিল' (ibid, পৃ. ৮৯)।

[১১] প্রথম শিল্প বিপ্লবের কারণ হিসেবে নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদের কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকাকে লঘু করে দেখার এই প্রচেষ্টা বেশ চিত্তাকর্ষক, কারণ নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদেরা বর্তমানে 'বাণিজ্যকে প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে' ভাবতে খুবই উৎসাহী। আমরা আগেই লক্ষ করেছি, নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্যাকে এক অর্থে ইতিহাস চর্চায় নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতির প্রয়োগ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

[১২] লক্ষণীয় যে, যদিও থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি এখানে দুটি উপায়ের কথা উল্লেখ করেছেন এবং উভয় বিষয়েই আলোচনা করবেন বলে জানা, তবে তাদের পরবর্তী আলোচনায় তারা দ্বিতীয় উপায়টির তেমন কোনো উল্লেখ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

[১৩] শীঘ্রই আমরা এই থিসিসের পক্ষে তাদের প্রদত্ত প্রমাণটি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পাব।

[১৪] এই অপ্রীতিকর যুক্তির বিশদ রূপটি নিম্নরূপ: 'যদি দাস প্রথা (উৎপাদনে দাসশ্রমের প্রয়োগ)'র মুনাফা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হতো, তাহলে দাস কেনার প্রতিযোগিতা তীব্রতর হতো এবং দাস সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হতো। তখন একজন দাসের ব্যবহার থেকে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হতো তা দাস ব্যবসায় নিয়োজিত ডিলারদের মাধ্যমে শেষ

পর্যন্ত প্রাথমিক দাস সংগ্রহকারীদের কাছে পৌঁছাতো। এই অতিরিক্ত মুনাফা তাদেরকে আরও বেশী হারে দাস সংগ্রহে প্রবুদ্ধ করতো এবং এভাবে দাস ব্যবহার থেকে অর্জিত অতিরিক্ত লাভ আফ্রিকায় অপচয়িত হতো (ঐ)"।

[১৫] মনে রাখা দরকার যে, থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি উভয়েই এ বিষয়ে একমত হন যে, ১৭৮০ এবং ১৭৯০-এর দশকে বৃটিশ বাণিজ্যের শর্তাবলী (আমাদানীকৃত পণ্যের দামের তুলনায় রপ্তানিকৃত পণ্যের দাম) হ্রাস পেয়েছিল কিনা তা বিতর্কিত (ঐ)। এছাড়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিষয়ে তারা (Imlah 1958, পৃ. ৯৪-৯৮ থেকে উদ্ধৃত করে) জানান যে, ১৮০০ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে বৃটিশ রপ্তানি দশগুণ বৃদ্ধি পেলেও বৃটিশ বৈদেশিক বাণিজ্যের শর্তাবলী মাত্র অর্ধেক হ্রাস পেয়েছিল (ঐ)।

[১৬] এই শুল্ক বাবদ আদায়কৃত অর্থ যে বৃটিশ সরকারের কোষাগারে জমা হচ্ছিল সে বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না!

[১৭] থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কি কীভাবে এই হ্রাসকৃত সংখ্যায় পৌঁছান তা স্পষ্ট নয়, কারণ তাঁরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছেন যে, শুধুমাত্র আমদানি বাবদ বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল বছরে ১৫ লক্ষ পাউন্ডেরও বেশি।

[১৮] থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কির ভাষায়, 'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামগ্রিক অর্থনীতির তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্য লক্ষণীয়ভাবে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল' (ঐ, পৃ. xx)।

[১৯] থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কির ভাষ্যমতে, 'শতাব্দীর শুরুতে, মধ্য দশকগুলিতে, দেশীয় রপ্তানির (f.o.b. মূল্যে) বার্ষিক বৃদ্ধির হার সম্ভবত প্রায় ৭ বা ৮ শতাংশ ছিল, এবং তারপর এই শতাব্দীর শেষভাগে তা ১৬ কিংবা ১৭ শতাংশে পৌঁছেছিল (ঐ, পৃ. xx)'। এটা স্পষ্ট যে, 'স্বল্পমেয়াদী উত্থানপতন থাকলেও রপ্তানির বিরাট পরিমাণ এবং দেশের অভ্যন্তরীণ ভোগ বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশী হারে বৃদ্ধি পাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা – এই দুই কারণে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, রপ্তানির বৃদ্ধি বৃটেনের শিল্প খাতের বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে' (ঐ, পৃ. ৪০)।

[২০] থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কির বর্ণনা অনুযায়ী, 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই সময়কালগুলি সেই বছরগুলির সাথে মিলে যায় যখন বাণিজ্যিক শর্তাবলী প্রবলভাবে বৃটেনের পক্ষে পরিবর্তিত হচ্ছিল। সুবিদিত যে, এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে অভ্যন্তরীণ আয় প্রকৃতমূল্যে বৃদ্ধি পায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে স্বীয় রপ্তানিকে কম প্রতিযোগিতামূলক করে দেয়' (ঐ, পৃ. xx)। উপরন্তু, 'সামগ্রিকভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের জন্য বিদ্যমান তথ্য-প্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে, বাণিজ্যের শর্তাবলি বৃটেনের পক্ষে পরিবর্তিত হচ্ছিল, বিপক্ষে নয়' (ঐ, পৃ. xx)।

[২১] থমাস এবং ম্যাকক্লোস্কির লক্ষ করেন যে, 'তবে অর্থনীতির কিছু ক্ষেত্রে বিদেশী বাজার অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মধ্যযুগের শেষের দিক থেকে ইংরেজদের রপ্তানিতে পশমী কাপড় প্রাধান্য পেয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতেও পশমী শিল্প সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি শিল্প ছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষের দিকে, যদিও চামড়া এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো কিছু শিল্প অভ্যন্তরীণ বাজারের উপর অত্যধিক

নির্ভরশীল ছিল, তবুও অ-পশমী বস্ত্র (বিশেষ করে তুলা), লোহা-ভিন্ন অন্যান্য ধাতু, কাঁচ ও মাটির পাত্র, এবং লোহা ও ইস্পাতসহ অন্যান্য অনেক শিল্প রপ্তানিতে অত্যন্ত সফল হতে শুরু করে, এবং তাদের উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রপ্তানিকৃত হতো' (ঐ, পৃ. ৩৯)।

[২২] বৃটিশ রপ্তানি সম্প্রসারণের পেছনের কারণগুলি বিবেচনা করে কোল এই অভিমতে পৌছান যে, 'প্রকৃতপক্ষে, বৃটিশ পণ্যের বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধিকে বহুলাংশে একটি "স্বয়ম্ভূ" (অটোনোমাস) ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা সম্ভব'। তিনি আরও যোগ করেন যে, 'যদি আমরা তা করি, তাহলে এটা দেখা কঠিন নয় যে, অন্যান্য শিল্পের সাথে সংযোগসূত্রে বৃটেনের রপ্তানি শিল্পের সম্প্রসারণ অন্যান্য শিল্পকেও উদ্দীপ্ত করে। রপ্তানি থেকে অর্জিত অধিক আয় থেকে উদ্ভূত ব্যয়ের বৃদ্ধি (উল্লেখযোগ্য বেকারত্বসম্পন্ন) অর্থনীতিতে 'বহুগুণিতক প্রভাব' (মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট) সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং জাতীয় আয় সবকিছুই বৃদ্ধি পাবে। এমনকি তা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকেও উদ্দীপিত করতে পারে এবং তা দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন এবং আয়কে আরও উচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং, রপ্তানি খাতের সীমিত আকার সত্ত্বেও, ১৭৪০ থেকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত রপ্তানির বৃদ্ধি এই সময়কালে বৃটেনের সামগ্রিকভাবে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির ৭৫ শতাংশের জন্য যথেষ্ট হতে পারে (ঐ, পৃ. ৪২)'। কোলের মতে, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইংল্যান্ডের রপ্তানি বাণিজ্যের বৃদ্ধি সেদেশের ব্যবসায়ী এবং শিল্পোদ্যক্তাদের জন্য বাজারের এক বড় সম্প্রসারণ ডেকে এনেছিল' (ঐ, পৃ. ৪১)।

[২৩] বাণিজ্য ও শিল্পায়নের মধ্যে গতিশীল সম্পর্কের বিষয়ে ম্যান্টোক্সের প্রগাঢ় উপলব্ধির বিশেষ মূল্য বিবেচনা করে আমরা তাঁর গ্রন্থ থেকে পাঠকদের জন্য নিম্নরূপ দীর্ঘ উক্তিটি পরিবেশন করছি: 'শিল্পের অগ্রগতি এবং বাণিজ্যের বিকাশ এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং প্রকৃতপক্ষে একে অপরকে এতভাবে প্রভাবিত করে যে, এ দুইয়ের কোন দিক থেকে নতুন বিকাশ শুরু হয়েছে তা আবিষ্কার করা প্রায়শই কঠিন। কখনও কখনও শিল্পের অগ্রগতি বাণিজ্যকে নতুন বাজার খুঁজে পেতে বাধ্য করে, বাণিজ্যিক সম্পর্ককে প্রসারিত এবং বহুগুণ করে। কখনও কখনও, অন্যদিকে, বাণিজ্যিক বাজারের সম্প্রসারণের ফলে সৃষ্ট নতুন চাহিদা শিল্প উদ্যোগকে উদ্দীপিত করে। আজকাল, প্রথমটি বেশী পরিদৃষ্ট হয়। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা চালিত আধুনিক শিল্প বাণিজ্য এবং ঋণের প্রসার ঘটায়, যা উৎপাদনের স্বার্থে এখন গোটা বিশ্বকে অধিকার করেছে। তদুপরি, উৎপাদন অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে বলে মনে করাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এটি কি আধুনিক কারখানা ব্যবস্থার নতুন এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি নয়? তার অসাধারণ ক্ষমতা এবং প্রযুক্তির দ্রুত এবং নিরন্তর উন্নতি সাধনের ফলে এই কারখানা ব্যবস্থা চাহিদা অনুমান, পরিবর্তন, বা কখনো কখনো তৈরি করতে সক্ষম। পরিবহনের উন্নয়ন শিল্পোদ্যক্তাদের সীমাহীন এবং ইচ্ছামত তাদের বাজারের পরিধি বাড়াতে সক্ষম করে। এক্ষেত্রে একমাত্র সীমা হলো জনবহুল বিশ্বের পরিধি। পুরানো কালের শিল্পের জন্য এসব বৈশিষ্ট্য প্রয়োজ্য ছিল না। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ধীরগতি এবং যোগাযোগ ও পরিবহনের সীমাবিদ্ধতা পুরানো কালের উৎপাদনকে বাধ্যতামূলকভাবে তার প্রথাগত বাজারের জ্ঞাত চাহিদার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। অজানা এবং দূরবর্তী সম্ভাব্য ভোক্তাদের জন্য উৎপাদন করা পাগলামির কাজ

বলে বিবেচিত হতো। সংক্ষেপে, শিল্পকে বাণিজ্য সংযোগের শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হতো' (ঐ, পৃ. ৯০-৯১)।

[২৪] ম্যান্টোক্সের ভাষায়, 'প্রতিটি প্রযুক্তিগত প্রশ্নই প্রথম এবং সর্বাগ্রে একটি ব্যবহারিক প্রশ্ন। তাত্ত্বিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সমাধানের জন্য সমস্যা হওয়ার আগে, এটি ব্যবসায়ীদের দ্বারা অতিক্রম করার জন্য একটি বাধা অথবা বস্তুগত সুবিধা অর্জনের জন্য একটি সম্ভাব্য সুযোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়' (ঐ, পৃ. ২০৬)।

[২৫] ম্যান্টোক্সের ভাষ্যমতে, 'প্রয়োজনীয়তা যত বেশি জরুরি হয়ে উঠছিল, গবেষণা তত বেশি সক্রিয় হয়ে উঠছিল, যতক্ষণ না একটি বাস্তব সমাধান আসলে আবিষ্কৃত হয়েছিল' (ঐ, পৃ. ২০৯)। তাঁর মতে, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মাধ্যমে তাত্ত্বিক বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং শিল্প বিপ্লব অভিজ্ঞতামূলক যুগ থেকে বৈজ্ঞানিক যুগে উত্তরিত হয়। প্রয়োজনীয়তা এবং আবিষ্কারের মধ্যে সংযোগ অব্যাহত থাকে, কিন্তু প্রথম যুগে এটি ছিল বাহ্যিকভাবে স্পষ্ট এবং মধ্যবর্তী কোন সংযোগের প্রয়োজন ছিল না।

[২৬] হবসবয়ম মনে করেন যে, এখানে নিম্নরূপ আরও কিছু বিষয় যোগ করার ছিল: 'ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পায়ন কীভাবে আমেরিকায় দাসপ্রথা দীর্ঘায়িত এবং বিকশিত করেছিল; অথবা কীভাবে বৃটিশ অর্থনৈতিক সংকটের কিছু বোঝা প্রাথমিক উৎপাদনকারী দেশগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যাদের রপ্তানির জন্য আমরাই একমাত্র গন্তব্যস্থল ছিলাম; বৃটেন এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, যা ছাড়া আমাদের ইতিহাস বোঝা যায় না' (ঐ)।

[২৭] হবসবয়ম মনে করেন যে, এখানে 'আমরা যোগ করতে পারি এই প্রশ্ন যে, একটি চিত্তাকর্ষক প্রাথমিক বিস্ফোরণের পর সেটি কীভাবে থেমে গিয়েছিল' (ঐ)।

[২৮] হবসবয়মের মতে প্রশ্ন হলো, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটেনে কীভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যা ব্যবসায়ী শ্রেণিকে এতদসত্ত্বেও উৎপাদনে বিপ্লব আনার দিকে পরিচালিত করেছিল?

[২৯] হবসবয়মের ভাষায়, 'সঠিক উত্তর সম্ভবত এই যে, উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে অপরিহার্য ছিল; তদুপরি আরেকটি তৃতীয় এবং প্রায়শ অবহেলিত উপাদানও ছিল এবং সেটা হলো সরকার' (ঐ, পৃ. ৪২)।

[৩০] হবসবয়ম বারবার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, অন্য এক জায়গায় তিনি উপসংহারে বলেন, 'আমাদের শিল্প বিপ্লবের পেছনে রয়েছে আমাদের হাতে ঔপনিবেশিক এবং বিদেশের "অবিকশিত" বাজার হস্তগত হওয়া এবং অন্যদেরকে (অন্যান্য ইউরোপীয় দেশকে) তা থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত সফল যুদ্ধ' (ঐ, পৃ. ৫৪)। অন্যত্র তিনি যেমন লিখেন, 'আমাদের শিল্প অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছিল আমাদের বাণিজ্য থেকে, বিশেষত অনুন্নত বিশ্বের সাথে আমাদের বাণিজ্য থেকে' (ঐ)।

[৩১] হবসবয়মের ভাষায়, 'আঠারো শতকের দ্বিতীয় তৃতীয়াংশের কোনো এক সময়, যখন বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিরও একটি সাধারণ ত্বরান্বিতকরণ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এটা কেবল বৃটেনের জন্য প্রযোজ্য ছিল না; বরং এটির একটি সাধারণ চরিত্র ছিল (যা ইউরোপের অন্যান্য দেশের জন্যও কমবেশি

সত্য ছিল)। পণ্যের দামের গতিবিধি (যাতে বিগত এক শতাব্দীর ওঠানামা বা অনির্দিষ্ট যাত্রার পর একটি নিম্নহারসম্পন্ন কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির সূচনা ঘটেছিল), জনসংখ্যা, এবং অন্যান্য যেসব বিষয়ে আমাদের তথ্য আছে, তাতে তা ধরা পড়েছিল' (ঐ, পৃ. ৫৪)।

[৩২] হবসবয়মের ভাষায়, '১৭৪০-এর পরের দশকগুলিতে শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল, যখন বৃটেনের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিশাল কিন্তু ধীরগতির প্রবৃদ্ধির সাথে ১৭৫০-এর পরের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণ যোগ হয়। এবং এটা সেই দেশে ঘটেছিল যেই দেশ বৈদেশিক বাজারের একটি বড় অংশ দখল করার জন্য আন্তর্জাতিক সুযোগগুলি দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়েছিল' (ঐ, পৃ. ৫৪)।

[৩৩] ম্যানটক্সের আলোচনায় অনুরূপ আরও অনেক অনুচ্ছেদ রয়েছে। যেমন তিনি লিখেন, 'ল্যাঙ্কাশায়ারের মাধ্যমে প্রবেশকারী বাইরের প্রভাব একটি নতুন শিল্পের বিকাশকে উদ্দীপিত করেছিল। এটি ছিল তুলা বস্ত্রশিল্প, যা তার ধরন এবং এর কাঁচামাল উভয়ই বাইরে (ভারতবর্ষ) থেকে ধার করেছিল' (ঐ, পৃ. ১০৮)। অথবা, 'তুলা বস্ত্রশিল্প থেকে এসেছিল সেই নির্ধারক প্রেরণা যা কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র বস্ত্র শিল্পে ছড়িয়ে পড়ে, এবং সেটা আরও বেশী আশ্চর্য্যের ছিল কারণ এই (তুলা) বস্ত্রশিল্পের উৎপত্তি ছিল খুবই সাম্প্রতিক' (ঐ, পৃ. ১৯৭)।

[৩৪] শিল্প বিপ্লবে ঔপনিবেশিক বাজারের ভূমিকার উপর জোর দিতে গিয়ে হবসবয়ম আরও লিখেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পর এটি (বৃটিশ তুলা বস্ত্রশিল্প) (স্বীয় উৎপাদন বাজারজাতকরণের জন্য) ভারত এবং দূর-প্রাচ্যে তার প্রধান ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল' (ঐ)। এ প্রসঙ্গে হবসবয়মের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণটিও লক্ষণীয়: 'এভাবে তুলা বস্ত্রশিল্পের মাধ্যমে অনুন্নত বিশ্বের সাথে বৃটেনের স্বীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা বৃটেন তার ভাগ্যের বিভিন্ন ওঠানামার মধ্যেও ধরে রেখেছিল এবং শক্তিশালী করেছিল। ১৭৯০ দশক পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের দাসভিত্তিক খামারসমূহ এই শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করেছিল। পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের দাসভিত্তিক খামারসমূহ এই কাঁচামালের কার্যত এক সীমাহীন উৎসে পরিণত হয়েছিল, যার ফলে এই অঞ্চল বস্তুত ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের উপর নির্ভরশীল অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এভাবে উৎপাদনের সবচেয়ে আধুনিক কেন্দ্রটি (যন্ত্রশিল্পভিত্তিক ল্যাঙ্কাশায়ার) শোষণের সবচেয়ে আদিম রূপ (দাসপ্রথা) সংরক্ষণ এবং প্রসারিত করেছিল' (ঐ, পৃ. ৫৮)।

[৩৫] হবসবয়ম জানতেন যে, প্রাথমিকভাবে তুলা বস্ত্রশিল্প মোট অর্থনীতির একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল। কিন্তু তিনি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, এ ক্ষুদ্রতা তাকে 'নেতৃস্থানীয় খাত'র ভূমিকা পালন থেকে বিরত রাখেনি। তাঁর ভাষায়, 'জাতীয় আয়ে এই শিল্পের অংশ বড় ছিল না – নেপোলিয়নিক যুদ্ধের শেষের দিকে সম্ভবত ৭ বা ৮ শতাংশু যদিও তা অন্যান্য শিল্পের অংশের তুলনায় বেশি ছিল। এই শিল্প কিছুটা আগে থেকেই প্রসারিত হতে শুরু করে এবং বাকিদের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং এক অর্থে এর গতি অর্থনীতির গতির পরিমাপ দেওয়া শুরু করে' (ঐ)।

[৩৬] ভারতীয় বস্ত্রের আমদানির উপর গুরুতর বিধিনিষেধের ফলে বৃটেনের অভ্যন্তরে এসব বস্ত্রের জন্য বিপুল চাহিদা পুঞ্জিভূত হয়েছিল। ফলে এসব বস্ত্রের নকল প্রস্তুতে সক্ষম এরূপ

যেকোনো বৃটিশ উদ্যোক্তার জন্য সাফল্য এবং সৌভাগ্য নিশ্চিত ছিল। ১৭০০ সালে যখন ভারতীয় বস্ত্র আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় তখন এরূপ সাফল্য ও সৌভাগ্যের সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পায়। নিষেধাজ্ঞার কারণে বৃটিশ ভোক্তারা এসব পণ্য থেকে হয় বঞ্চিত ছিল কিংবা অবৈধ পথে সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছিল। সুতরাং, তারা এসব পণ্য উৎপাদনের লক্ষে বৃটিশ তাঁতীদের অদক্ষ প্রয়াসকেও স্বাগত জানায়' (ঐ, পৃ. ২০১)।

[৩৭] ইরফান হাবিবের মতে, 'সেই সময়ের উৎসগুলি পড়লে এই ধারণা না পাওয়া সম্ভব নয় যে, ভারতবর্ষে বিরাট শহুরে জনসংখ্যা ছিল। শহরগুলিতে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক কারুশিল্পী, পিয়ন, এবং ভৃত্যরা প্রায়ই বিদেশী পর্যবেক্ষকদের আলোচনার বিষয়বস্তু হতে দেখা যায়। অতএব আমাদের আশা করতে পারি যে, ভারতবর্ষে শহুরে জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল বিরাট, সম্ভবত মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশের কম নয়' (Habib 1969, পৃ. ৬০)।

[৩৮] ভারতের ইতিহাস এবং ভারতের সাথে বৃটেনের সম্পর্ক বিষয়ে অবগতদের কাছে এসব তথ্য সুপরিচিত ক্লিশে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, যেমনটি আমরা প্রথম অংশে উল্লেখ করেছি, কেবল সাধারণ নাগরিকরাই নন, এমনকি নয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসের অনেক পুরোধারাও বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের ইতিহাসের ভারতীয় সংযোগ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত নন বলে মনে হয়। সে কারণে সুবিদিত এবং প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক তথ্যেরও পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন।

[৩৯] চীন এবং বিশেষ করে জাপানের তুলনায় ভারতীয় উপমহাদেশের জনসংখ্যার জাতিগত, ধর্মীয় এবং অন্যান্য বৈচিত্র্য এদেশে সামন্ততান্ত্রিক কেন্দ্রাতিগ (*সেন্ট্রিফুগাল*) শক্তির প্রাধান্য বিস্তারের জন্য প্রাকৃতিকভাবে অনুকূল পটভূমি যোগান দিয়েছিল এবং বহিরাগতদের আক্রমণের প্রতি ভারতীয় দুর্বলতার একটি বাড়তি উৎস হিসেবেও কাজ করেছিল।

[৪০] বৃটিশ পার্লামেন্টের নবম প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্যের বিশেষ গুরুত্ব বিধায় এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো: 'বাংলার রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ বহু বছর ধরে ইংল্যান্ডে রপ্তানির জন্য পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশে আলাদা করা হয়েছে এবং এটিকে 'বিনিয়োগ' বলা হয়। বিনিয়োগের পরিমাণ হলো সেই মানদণ্ড যার দ্বারা কোম্পানির প্রধান কর্মচারীদের যোগ্যতা সাধারণভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতের দারিদ্র্যের এই প্রধান কারণটিকে সাধারণত তার সম্পদ এবং সমৃদ্ধির সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। প্রতি বছর প্রাচ্যের সবচেয়ে মূল্যবান পণ্য বোঝাই বৃহৎ জাহাজের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ইংল্যান্ডে পৌছানোর ঘটনা জনগণের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল এবং তাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই এমন একটি সমৃদ্ধশালী এবং ঐশ্বর্যময় দেশের ধারণা দিচ্ছিল যার উদ্বৃত্ত উৎপাদন সারা বিশ্বের বৈদেশিক বাণিজ্যের এত বিশাল স্থান দখল করেছিল। ভারত থেকে রপ্তানি একটি পারস্পরিক বিনিময় বলেও মনে হচ্ছিল, যে বিনিময় দ্বারা সেই উৎপাদনে নিযুক্ত বাণিজ্যিক মূলধন ক্রমাগত শক্তিশালী এবং প্রসারিত হচ্ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ছিল যে, এই ছলনাময় এবং ভ্রান্ত আবরণের অন্তরালে ছিল উপকারী বাণিজ্য নয় বরং একটি বিশুদ্ধ কর প্রদানের প্রক্রিয়া' (বৃটিশ হাউস অফ কমন্স, নবম প্রতিবেদন, ১৭৮৩, পৃ. ৫৪)।

[৪১] শোরের ভাষায়, 'ইংরেজদের মূলনীতি ছিল সমগ্র ভারতীয় জাতিকে তাদের স্বার্থ এবং সুবিধার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে অধীনস্থ করা। তাদের উপর সর্বোচ্চ হারে কর আরোপ করা হয়েছে। আমাদের দখলে আসা প্রতিটি প্রদেশকে আরও বেশী হারে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা সর্বদা গর্ব করে বেড়িয়েছি যে, পূর্বতন স্থানীয় শাসকদের দ্বারা আদায়কৃত রাজস্বের চেয়ে বহুগুণ বেশী রাজস্ব আদায় করেছি' (Shore 1837, Vol. II, পৃ. ৫১৬)।

[৪২] ভারতে বৃটিশ শাসনের এই দুঃখজনক কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার সুযোগ আমাদের এখানে নেই। আগ্রহী যে কেউ ইতিপূর্বে উল্লিখিত রমেশ চন্দ্র দত্তের ধ্রুপদী রচনায় (Dutt 1960a, 1960b) এর একটি বিস্তারিত এবং নথিভুক্ত বর্ণনা পেতে পারেন।

[৪৩] লক্ষণীয় যে, চীনে বিনিয়োগ, তথা চীন থেকে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যেও ভারতের রাজস্ব ব্যবহৃত হতো।

[৪৪] অনেক ক্ষেত্রে, বৃটিশরা তাদের সামরিক শক্তি ব্যবহার করে তাদের বাণিজ্যের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে কম দামে কিংবা জোর পূর্বক বিনামূল্যেও সংগ্রহ করতো।

[৪৫] এসব পরিসংখ্যানের একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ নিম্নরূপ: 'জনমনে প্রচলিত একটি বিরাট ভ্রান্তি হলো যে, "ভারতীয় ঋণ" বলতে ভারতবর্ষে বৃটিশদের কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অপ্রত্যাহারযোগ্য পুঁজিকে বোঝায়। এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে, এভাবে "ভারতের ঋণে'র উদ্ভব ঘটেনি। যখন ১৮৫৭ সালে ভারতের উপর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে তখন কোম্পানি সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি পাউন্ড। এই সময়ের মধ্যে তারা (কোম্পানি) ১৫ কোটি পাউন্ডের নজরানা (অর্থনৈতিকভাবে অন্যায্য নজরানা) আদায় করেছে (সুদকে গণনার মধ্যে না ধরেই)। তারা ভারতের উপর আফগান যুদ্ধ, চীনের যুদ্ধ, এবং ভারতের বাইরে সঙ্ঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের দায়ভার ভারতের উপর চাপিয়েছে। সুতরাং 'ভারতীয় ঋণ' একটি কাল্পনিক বিষয়। ভারত থেকে যে পরিমাণ আদায় করা হয়েছে তার থেকে ১০ কোটি পাউন্ডেরও বেশী ভারতের জন্য উদ্বৃত্ত ছিল। রাণী কর্তৃক শাসনাভার গ্রহণের প্রথম ১৮ বছরে ভারতীয় ঋণ দ্বিগুণ হয়। ১৮৭৭ সালে যখন রানী ভারতের সাম্রাজ্ঞী হন, তখন এই ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি পাউন্ড। এঁর অন্যতম কারণ ছিল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমনের ব্যয়, যার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি পাউন্ড, যা ভারতের রাজস্বের উপর আরোপিত হয়েছিল। ১৮৬৭ সালের আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের বড় অংশ ভারতে বহন করতে হয়। ভারতকে ১৮৬৭ সালের আবেসিনিয়া যুদ্ধের ব্যয়ের বিরাট অংশ বহন করতে হোয়। ১৮৭৭ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ভারতীয় ঋণের পরিমাণ ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ থেকে ২২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউন্ডে পৌছায়। এর মূল কারণ ছিল রেলপথ নির্মাণের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত সুদের বিনিময়ে সংগৃহীত ঋণ, যদিও এ ধরণের রেলপথের তখন তেমন প্রয়োজন ছিল না এবং সামর্থ্য ছিল না। এই ঋণ বৃদ্ধির পেছনে আরেক কারণ ১৮৭৮ এবং ১৮৯৭ সালের আফগান যুদ্ধ। ভারতীয় ঋণের ইতিহাস হলো আর্থিক অবিবেচিনা এবং অন্যায়ের দুঃখজনক দলিল (ঐ, পৃ. xii-xiii)"।

[৪৬] ১৯০০-১ সালে ভারতের মোট ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭১ লক্ষ পাউন্ড। একই বছরে মোট হোমচার্জের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড । অতএব দেখা

হবে যে ভারতের সকল প্রদেশের থেকে যে পরিমাণ ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করা হয় তার সমপরিমাণ অর্থ বার্ষিকভাবে দেশ থেকে হোমচার্জের বাবদ বৃটেনে পাঠানো হয় (ঐ, p. xii)।"

[৪৭] অন্যান্য উপাদানগুলি ছিল রেলওয়ের সুদ এবং বেসামরিক ও সামরিক চার্জ। ভারতে সরবরাহ করা সামরিক এবং অন্যান্য স্টোরের খরচ মেটাতে ব্যয় করা হতো নিছক একটা ক্ষুদ্র অংশ।

[৪৮] দত্ত যেমন মন্তব্য করেন, 'পঞ্চাশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ভারতের প্রতি ইংল্যান্ডের স্থায়ী নীতি এটিই ছিল; এটি হাউস অফ কমন্সের সামনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ১৮৩৩ সাল এবং তার পরেও জোরালোভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল; এবং এটি ইংরেজ শিল্পোদ্যক্তাদের সুবিধা দেওয়ার জন্য ভারতের অনেক জাতীয় শিল্পকে কার্যকরভাবে ধ্বংস করে দেয়' (ibid, পৃ. ৩২)।

[৪৯] দ্রষ্টব্য Mill, James (1858), Wilson's continuation, Book I, Chapter VIII, Note.

[৫০] 'অনুমান করা হয় যে যদিও কোম্পানিগুলিকে নির্মাণাধীন রেলপথের জন্য ৮ কোটি ১০ লক্ষ পাউন্ড সরবরাহ করা হয়েছিল, এর সাথে আরও যোগ হবে সরকারী জমি, বিনিময় ক্ষতি, এবং তত্ত্বাবধানের জন্য ৭৫ লক্ষ পাউন্ড; নিট আয়ের অতিরিক্ত প্রদত্ত সুদের জন্য ১ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউন্ড; এবং সুদের নিশ্চয়তা পূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থের উপর আরও ৪৫ লক্ষ পাউন্ড সুদ (Lawrence 1867)।

[৫১] দ্রষ্টব্য *Moral and Material Progress and Condition in India, 1872-73*. Ordered by the House of Commons of the British Parliament, p. 75.

[৫২] কেন ইউরোপের অন্য কোনও দেশের পরিবর্তে বৃটেনে প্রথম শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তা ব্যাখ্যায় বৃটিশ অধিকৃত উপনিবেশের ভূমিকার উপর জোর দিতে গিয়ে হবসবয়ম উল্লেখ করেন যে, 'যদি একটি (ইউরোপের) দেশ বৈদেশিক বাজারের একটি বড় অংশ কেন্দ্রীভূত করে তাহলে বাকী দেশসমূহ শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি তৈরি করতে অক্ষম হবে। অন্য ভাষায়, প্রাক-শিল্প পরিস্থিতিতে, শিল্পায়ন অর্জন এবং 'বিশ্বের কারখানা' হওয়ার জন্য কেবলমাত্র একটি দেশেরই পরিসর ছিল (যেটি হয়েছিল বৃটেন), কারণ একাধিক দেশের পক্ষে একইসাথে উপনিবেশের সিংহভাগের অধিকারী হওয়া সম্ভব ছিল না (Hobsbawm 1968, পৃ. ৪৯)।"

নির্দেশিত রচনাবলী

Alavi, H. et al. (1982), *Capitalism and Colonial Production*, Croom Helm, London

Ashton, T. S. (1948), *The Industrial Revolution, 1760-1830*, New York: Oxford University Press

Buchanan, F. (1807), *Journey from Madras*, &c., London: Cadell and W. Davies

Child, Gordon (1939), *Man Makes Himself*, New York: Oxford University Press

Child, Gordon (1948), *What Happened in History?* UK: Pelican Books

Clapham, J. H. (1926-38), *An Economic History of Modern Britain*, 3 vols., Cambridge: Cambridge University Press

Cole, W. A. (1973), "Eighteenth century economic growth revisited," *Explorations in Economic History*, X, Summer, pp. 327-48

Cole, W. A. (1981), 'The Industrial Revolution and Its Aftermath,' in *The Cambridge Economic History of Europe*, Volume 8, edited by Peter Mathias and Sidney Pollard, Cambridge: Cambridge University Press

Cole, W. A. and P. Deane (1965), "The growth of national incomes," in *Cambridge Economic History of Europe*, VI, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-55.

Crafts, N. C. R. (1976), "English economic growth in the eighteenth century: A re-examination of Dean and Cole's estimates," *Economic History Review*, XXIX, No. 2, April, pp. 226-235

Crafts, N. C. R. (1984), *Economic Growth during the British Industrial Revolution*, Oxford: Oxford University Press

Crouzet, F. (1972) (ed.), *Capital Formation in the Industrial Revolution*, London: Methuen

Cunningham, W. (1912), *The Growth of English industry and Commerce in Modern Times*, Cambridge: Cambridge University Press

Davis, R. (1979), *The Industrial Revolution and British overseas trade*, Leicester: Leicester University Press

Dean, P. M. (1969), *The First Industrial Revolution*, Cambridge: Cambridge University Press

Dean, P. M. and W. A. Cole (1969), *British economic growth, 1688-1959: Trends and Structure*, Cambridge: Cambridge University Press

Dutt, R. C. (1960a), *The Economic History of India*, Vol. I. (Under early British rule), London: Routledge Kegan Paul Ltd.

Dutt, R. C. (1960b), *The Economic History of India*, Vol. II. (In the Victorian Age 1837-1900), London: Routledge Kegan Paul Ltd.

Edwards, M. M. (1967), *The Growth of British Cotton Trade*, Manchester: Manchester University Press

Eversley, D. E. C. (1967), "The home market and economic growth in England, 1750-1780," in E. L. Jones and G. E. Mingay (eds.), *Land, Labour, and Population in the Industrial Revolution*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 206-59

Flinn, M. W. (1967), *Origins of the Industrial Revolution*, London: Longmans

Floud, R. and D. McCloskey (eds.) (1981), *The Economic History of Britain since 1700*, Vol. I, 1700-1860, Cambridge University Press

Frank, Andre Gunder (2005), 'Africans and the Industrial Revolution in England: A Studz in International Trade and Economic Development: Review,' *Journal of World History*, Vol. 16, No. 2, pp. 232-235

Gilboy, E. W. (1932), 'Demand as a factor in the Industrial Revolution,' in R. M. Hartwell (ed.) (1967)

Habbakkuk, H. J. (1958), *The Economic History of Modern Britain*, Cambridge: Cambridge University Press

Hammond J. L. and B. Hammond (1925), *The Rise of Modern Industry*, London, Methen & Co.

Hartwell, R. M. (ed.) (1965), *The Cause of the Industrial Revolution in England*, London: Methuen & Co.

Hobsbawm, E. J. (1968), *Industry and empire: from 1750 to the present day*, Pelican, London

Hobsbawm, E. J. (1962), *The Age of Revolution: Europe 1789-1848*, Vintage Books, New York

Hunter, A. (1868), *The annals of rural Bengal*, New York: Leypoldt and Holt

Inikori, Joseph E. (2002), *Africans and the Industrial Revolution in England: A Study in International Trade and Economic Development*, New York: Cambridge University Press

Islam, Nazrul, (1984) "Karl Marx and his analysis of capitalism some a-pasteriors," *Journal of social studies*, No.25 (July), pp.60-99

ইসলাম, নজরুল (২০১২),"ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশ", *আগামী দিনের বাংলাদেশ*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৪৬-২১৭

Kravis, I. B. (1970), "Trade as the handmaiden of growth: similarities between the nineteenth and twentieth centuries," *Economic Journal*, LXXX, No. 320, Dec., pp. 850-872

Landes, D. (1969), *The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present*, Cambridge: Cambridge University Press

Lawrence (1867), *Report to the British Parliament on construction of railways in India*, India House, London

List, Friedrich (1885), *The National System of Political Economy*, translated by Sampson S, Lloyd, London: Longmans

Mantoux, P. (1928), *The Industrial Revolution in the Eighteenth Century*, New York: Hartman, Brace & Co.

Montgomery, Martin (1838), *The History, Antiquities, Topograpy, and Statistics of Eastern India*, London: W. H. Allen and Company.

Mathias, P. (1969), *The First Industrial Nation: An Economic History of Britain*, 1700-1914, New York: Charles Scribner' Sons.

Mill, J. S. (1858), *The history of British India*, London: James Madden

Mokyer, J. (ed.) (1985), *The economics of the industrial revolution*, New York: HarperCollins Publishers Ltd

O'brien, P. K. and C. Keydor (1978), *Economic growth in Britain and France 1780-1914: Two Paths to the Twentieth Century*, London: Allen & Unwin

Rostow, W. W. (ed.) (1963), *The Economics of Take-off into Sustained Growth*, New York: St. Martin's press

Rothermund, D. (1988), *An Economic History of India: from Pre-colonial Times to 1986*, Croom Helm, London

Toynbee, A. (1884), *Lectures on the Industrial Revolution*, in Ashton, T. S. (ed.) (1969), New York

Trevelyan, G. M. (1944), *English Social History: A Survey of Six Centuries, Chaucer to Victoria*, London: Longmans Green & Co.

Verelst, H. (1772), *View of the rise, etc. of the English government in Bengal*, London: J. Nourse

Williams, E. (1944), *Capitalism and Slavery*, Chapel Hill: University of North Carolina

পুস্তক পর্যালোচনা

নজরুল ইসলামের *আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয়*

তাজুল ইসলাম*

ভূমিকা

বাংলাদেশ আজ একটি ঐতিহাসিক ক্ষণের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সফল উন্নয়নশীল দেশের রোল মডেলের তকমা নিয়ে দেশ যখন মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে গ্রাজুয়েট হবো হবো করছে, ঠিক তখনই কোটাবিরোধী আন্দোলনের মতো একটি আপাত অরাজনৈতিক ও নিরীহ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশত্যাগ করে। এরপর যখন অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি সব এলাকাতেই অস্থিরতা, দ্বিধা, অবিশ্বাস, প্রত্যাখ্যান সব মিলিয়ে এক গভীর অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে, তখনই এই সত্যটি আবার নতুন করে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে।

নিকট-অর্থনীতির 'উন্নয়নের রোল মডেল' তকমাটি আজ মীথ সদৃশ্য মনে হচ্ছে। দারিদ্র বিমোচন সহ অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নের সূচকগুলিরও প্রায় ভঙ্গুর দশা; মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অর্জনগুলিকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি হঠাৎ করেই যেন প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছে; ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, অসহিষ্ণুতা ও মৌলবাদে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে। অনেকেই এই নেতিবাচক পরিবর্তনগুলিকে অন্তর্বর্তী সরকারের অদক্ষতা এবং/অথবা নীতিগত অবস্থানের ফল হিসেবে দেখছেন। এই দেখার মধ্যে অনেকখানি সত্যতা আছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু 'সব দোষ নন্দ ঘোষের' উপর চাপিয়ে দিয়ে অতীতকে দায়মুক্তি দেবার কোন অবকাশ নেই। আমাদের উন্নয়নের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজতে হবে বর্তমান পরিণতির শিকড়।

স্বাধীনতার প্রথম দিকে একটি শোষণবিহীন সমাজ তৈরির মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ বীরের রক্তের ঋণ শোধের আকাঙ্ক্ষা আপামর জনসাধারণের মধ্যে

*জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ভূতপূর্ব প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর, এবং বাংলাদেশ ইউজিসির ভূতপূর্ব সদস্য।

জাগ্রত ছিল। রাষ্ট্রের ঘোষিত নীতির মধ্যেও সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে একটি শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছিল। আধুনিক, সেকুলার, গণমুখী, এবং বিজ্ঞানভিত্তিক একটি শিক্ষানীতিও প্রণীত হয়েছিল।

ভুলভ্রান্তি, অদক্ষতা, শ্রেণীগত দোদুল্যমানতা, ইত্যাদি সত্ত্বেও স্বাধীনতা উত্তর প্রথম সরকার এই সব নীতি বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। কিন্তু '৭৫-এর নির্মম হত্যাকান্ডের পর সেই আদর্শিক জায়গা থেকে সরে এলো বাংলাদেশ। একমাত্র জিডিপি উৎপাদনকেই ধরা হল কোনো সরকারের সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি। সেই সাথে বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ চাপে বা অনুপ্রেরণায় নয়া-উদারনৈতিক (নিও-লিবারেল) পুঁজিবাদী উন্নয়ন মডেল হয়ে ওঠে এই কৌশলের আদর্শিক ভিত্তি। দেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় না নিয়ে কেবলমাত্র বাজার শক্তির বুলডোজার দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার এই নীতি ও কৌশল অনেক আগেই গতি হারিয়ে ফেলার কথা ছিল। তবে, এই সময় মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক রপ্তানি এবং উন্নত দেশসমূহে তৈরি পোশাক রপ্তানির মতো আন্তর্জাতিক পরিসরে এমন কিছু অনুকূল সুযোগ আসে যা বাংলাদেশের এই অভিমুখীনতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে; বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সাফল্যও অর্জিত হয়। কিন্তু নয়া-উদারনীতিবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণেই এই সাফল্যের মধ্যেই জমতে থাকে নানান প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ। তাই বলা যায়, একটি অতি প্রচন্ড রাজনৈতিক প্রলয়কাণ্ডের মধ্য দিয়ে এই দিশেহারা অবস্থার প্রকাশ ঘটলেও এর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। কিন্তু চলতি সাফল্যের প্রভাবে অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী সরকার ও কর্তৃপক্ষসমূহ এ সম্বন্ধে ছিল একেবারেই উদাসীন।

সকলে নাহলেও অর্থনীতিবিদ, সমাজ গবেষকসহ উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা করেন এরকম অনেকেই প্রচলিত উন্নয়ন কৌশলের সম্ভাব্য নেতিবাচক ফলাফল নিয়ে অনেক আগে থেকেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। প্রথম থেকেই বিভিন্ন সময়ে তারা বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। সেরকম একজন দেশপ্রেমিক সচেতন বিশেষজ্ঞের সাম্প্রতিকতম একটি প্রকাশনাকে পরিচয়

করিয়ে দেওয়ার জন্য বর্তমান লেখাটির অবতারণা। তিনি হলেন জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণা বিভাগের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান, অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম, এবং তাঁর বইটির নাম হল আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয়।

জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণা বিভাগের প্রধান হিসাবে উন্নয়ন তত্ত্ব এবং উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে কাজের জন্য নজরুল ইসলাম আন্তর্জাতিকভাবে সমধিকপরিচিত। তবে, যারা নজরুল ইসলামের গবেষণা ও রচনাবলীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তারা জানেন যে, তিনি সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবেশ, সুশাসন, ইত্যাদি বিষয়ে একজন সব্যসাচী লেখক এবং গবেষক। আরো প্রশংসনীয়, বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া, শিক্ষকতা, এবং গবেষণায় নিয়োজিত থাকলেও বাংলাদেশের নানামুখী সমস্যা নিয়ে গবেষণাভিত্তিক আলোচনায় প্রথম সারির একজন হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই, আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয় পুস্তকটি ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সফল সমাপ্তির পটভূমিতে প্রকাশিত হলেও, এর ভিত্তি সুদূর অতীতে প্রোথিত; এবং বাংলাদেশ নিয়ে নজরুলের চিন্তাভাবনা ও আকাঙ্ক্ষার এটি একটি চূড়ান্ত প্রকাশ। বস্তুত ২০২৪ সালের অনেক আগেই, ২০২৩ সালের মাঝামাঝিতে বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে যায়। আর বইয়ের মূল সুরটি বাঁধা হয়ে গিয়েছে তারও অনেক আগে, সেই ১৯৮৭ সালে, বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা: বর্তমান উন্নয়ন ধারার সমস্যা এবং বিকল্পধারার প্রশ্ন শীর্ষক তাঁর বইটি প্রকাশনার মধ্য দিয়ে। এই সম্বন্ধে নজরুল বইয়ের মুখবন্ধে কিছুটা ধারণা দিয়েছেন।

বর্তমান লেখাটিকে প্রচলিত অর্থে কোন পুস্তক সমালোচনা বলা যাবে না; বরং এটি হল একটি পরিচিতিমূলক রচনা, যেখানে দশটি করণীয় সম্বন্ধে নজরুলের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনাকেই প্রধান উপজীব্য করা হয়েছে। আমার লক্ষ্য হল, যেন রচনাটি পাঠ করে প্রতিটি প্রস্তাবিত করণীয়'র ঐতিহাসিক ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তা, তাত্ত্বিক ও তথ্যগত ভিত্তি, পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিসমূহ ইত্যাদির উপস্থাপনায় পাঠক লেখক নজরুলকে অনুভব করতে পারেন; এবং মূল বইটি পাঠ করার তাগিদ অনুভব করেন।

দশটি করনীয়কে লেখক দশটি ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করেছেন। পরিচ্ছেদের ক্রম অনুসারে করণীয়গুলি হল: অর্থনৈতিক বৈষম্যহ্রাস (পরিচ্ছেদ ১); সুশাসন অর্জন (পরিচ্ছেদ ২); আনুপাতিক নির্বাচনের প্রবর্তন (পরিচ্ছেদ ৩); পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা (পরিচ্ছেদ ৪); গ্রাম পরিষদ গঠন (পরিচ্ছেদ ৫); আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ (পরিচ্ছেদ ৬); সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি (পরিচ্ছেদ ৭); নারী, শিশু, যুবক, এবং বয়স্কদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান (পরিচ্ছেদ ৮); সর্বজনীন সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন (পরিচ্ছেদ ৯); জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ (পরিচ্ছেদ ১০)। এই পরিচ্ছেদক্রম অনুসরণ করেই পুস্তকের পরিচিতিটি তুলে ধরা হল।

মুখবন্ধ ও ভূমিকা

ভূমিকাতেই লেখক পরিষ্কার করেছেন, তিনি যে বাংলাদেশের জন্য দশ করণীয় উপস্থাপন করছেন তা বিগত সত্তর কিংবা আশির দশকের নানামুখী সমস্যায় ধুঁকতে থাকা দিকনির্দেশনাহীন বাংলাদেশ নয়, বরং তা হল এক প্রতিশ্রুতিশীল বাংলাদেশ, যে দেশ অন্তত জিডিপি প্রবৃদ্ধির নিরিখে (এবং বেশ কিছু সামাজিক সূচকে) প্রায় দুই দশক ধরে ধারাবাহিক সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে (সর্বশেষ উদ্‌ঘাটিত সরকরি বিভিন্ন তথ্য-বিকৃতিজনিত ধোঁয়াশা বাদ দিলেও)। উন্নয়নের অন্তর্গত দ্বান্দ্বিকতা অনুসরণ করে তিনি দেখান যে, বাংলাদেশ তার সাফল্যের অনুষঙ্গ হিসেবে দুই ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। একদিকে বৈষম্য বৃদ্ধি এবং পরিবেশ দূষণের মতো নেতিবাচক প্রভাবকগুলি মোকাবেলা করার চ্যালেঞ্জ; অন্যদিকে উন্নয়নের এক বিশেষ ধাপে এসে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবসহ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের আত্মস্থকরণের চ্যালেঞ্জ।

নজরুল মনে করেন যে, গতানুগতিক ধারায় এবং বিচ্ছিন্নভাবে এই চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এর একটি কারণ অবশ্যই আধুনিক অর্থনীতির জটিল আন্তঃসম্পর্ক ও আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক (*পলিটিক্যাল-ইকনোমিক*) প্রভাব; তবে, বাংলাদেশের জন্য একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণটি নজরুল ইসলাম অনুভব করেছেন তা হল

'লুটপাটের' সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে একটি সুস্থ ধারার অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পুনর্গঠনের তাগিদ। তার নিজের ভাষায় 'সে দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থে আগামী বাংলাদেশের উন্নয়নকে একটি নতুন পর্ব হিসেবে ভাবার প্রস্তাব করা হয়েছে'।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পুস্তকে প্রস্তাবিত দশটি করণীয়ই কি বাংলাদেশের সব সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি? অবশ্যই নয়; লেখকও তেমন দাবি করেননি। তবে অন্যান্য বিভিন্ন প্রস্তাবের সাথে নজরুলের পার্থক্য এখানে যে, তিনি এই দশটি করণীয়কে একটি সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনের বিভিন্ন দিক হিসেবে একসূত্রে গ্রন্থিত করার চেষ্টা করেছেন। এই সামগ্রিকতাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'বৈষম্যের প্রশমন'। এর কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে এই প্রস্তাবগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং সেই সূত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবকটিই চূড়ান্ত বিচারে বৈষম্য বিরোধী। তাই তিনি মনে করেন এবং তা যথার্থভাবেই- যে ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশিত বৈষম্যবিরোধী যে আকাঙ্ক্ষা এখন জাতীয় আকাঙ্ক্ষা হিসেবে স্বীকৃত, তার বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত এই করণীয়গুলি নতুন রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করবে। নজরুলের আকাঙ্ক্ষা, ব্যাপক জনগণের মাঝে প্রস্তাবগুলি পরিচিতি লাভ করুক; যাতে বৈষম্যবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিসমূহের করণীয় (*এজেন্ডা*)-তে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়।

আরও একটি বিষয় নজরুল সূচনাতেই পরিষ্কার করেন এবং তা হল, বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন কৌশলের স্বল্পমেয়াদি ও সংকীর্ণ চরিত্রের অর্থনৈতিক ইস্যুগুলির প্রতি মূল মনোযোগ না দিয়ে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন- তাঁর ভাষায়- বৃহত্তর চরিত্রের এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং পরিবেশগত করণীয়সমূহের উপর। এর কারণ ব্যাখ্যায় তিনি লক্ষ্য করেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে 'রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধি কৌশল' নামে যে উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করা হচ্ছে তা বহুল পরিচিত এবং পূর্ব-এশীয় দেশসমূহে ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। এই মডেল নিয়ে বিগত চার দশকে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ অনেক আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশে এই মডেলের

অনুসরণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুবিধা-অসুবিধা, ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা নিয়ে চলতি ও স্বল্পমেয়াদি অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু যেটা কম আলোচিত হয়েছে তা হলো দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত বাস্তবতায় এই মডেলের মিথস্ক্রিয়াটি কেমন হবে সেই প্রশ্ন। তাই তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন এইসব সুদূরপ্রসারী ন-অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের উপর।

পরিচ্ছেদ ১. অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস

যদিও নজরুল তার দশ করণীয়র জন্য কোনো পছন্দক্রম ঘোষণা করেননি, তবুও প্রথম পরিচ্ছেদে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের উপস্থাপন একেবারে কাকতালীয় নয়। বাংলাদেশে ১৯৭৫ পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যে উন্নয়ন ধারাটি চলমান আছে তার অনিবার্য ফল হলো অর্থনৈতিক বৈষম্যের দ্রুত বৃদ্ধি। অথচ নজরুলের মতে, যে পূর্ব-এশীয় উন্নয়ন মডেল অনুসরণে বাংলাদেশ চলছে তার অন্যতম অভিজ্ঞতা হলো, এই মডেলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বৃদ্ধি অবধারিত নয়। কিন্তু বাংলাদেশে উন্নয়ন এবং বৈষম্য চলছে হাত ধরাধরি করে। তাই নজরুলের ভাষায়, 'সেজন্য উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস'। তিনি অত্যন্ত সুগঠিতভাবে এবং যৌক্তিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তার আলোচনাটি সম্পন্ন করেন। প্রথমে তিনি বৈষম্য বৃদ্ধির মাত্রা ও তার গতি-প্রকৃতির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন, তারপর তাত্ত্বিকভাবে আলোচনা করেন কীভাবে এই বৈষম্য অর্থনীতির সীমানা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলকেও গ্রাস করতে পারে। তারপর তিনি আসেন কীভাবে এই বৈষম্য হ্রাস করা যায় সেই প্রশ্নের আলোচনায়।

তিনি আলোচনাটি করেন দুই ভাগে। প্রথমে তিনি অনুসন্ধান করেন কিভাবে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের শ্রম লব্ধ আয়ের হিস্যা, যাকে অর্থনীতিবিদগণ বলেন 'বাজার আয়' (*মার্কেট ইনকাম*), তা বাড়ানো যায়। প্রকৃতিগত দিক থেকে 'বাজার আয়'কে 'প্রাথমিক আয়' *(প্রাইমারি ইনকাম)* বা 'উপাদান আয়' (*ফ্যাক্টর ইনকাম*) বলেও অভিহিত করা হয়। এরপর নজরুল দেখেন বিভিন্ন সরকারি এবং ক্ষেত্র বিশেষে বেসরকারি উদ্যোগে

অন্যান্য উৎস থেকে কিছুটা আয় পুনর্বিতরণের মাধ্যমে নিম্নআয়ের জনগণের ঝুলিতে স্থানান্তরিত করা যায় কিনা। এই সম্মিলিত আয়ই হল তার টিকে থাকার অবলম্বন, যাকে বলা হয় 'ব্যয়যোগ্য আয়' (*ডিসপোজেবল ইনকাম*)। বাজার আয় এবং ব্যয়যোগ্য আয়ের বিভিন্ন উৎস চিহ্নিত করে নজরুল দেখাতে সচেষ্ট হন যুগের পর যুগ ধরে কোন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই উৎসগুলি থেকে নিম্ন আয়ের জনগণের ন্যূনতম যৌক্তিক আয় সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আলোচনার পরবর্তী যৌক্তিক ধাপ হলো এই প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করে নিম্ন আয়ের জনগণের হাতে তাদের প্রাপ্য আয় পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কারের প্রস্তাব। পরিচ্ছেদের শুরুতেই এই আলোচনাগুলি সেরে নিয়ে লেখক একেক অনুচ্ছেদে সেই কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। লেখকের উপস্থাপনার ক্রমানুসারে আমরা নীচে এই বিষয়গুলির সাথে পরিচিত হবো।

শুরুতেই নজরুল বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে বাজার আয়ে যে বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটেছে তার একটি চিত্র তুলে ধরেন। এ কাজে তিনি 'গিনি-সহগ' এবং 'পালমা-অনুপাত' নামক অর্থনীতিবিদদের অতিপরিচিত দুইটি সূচক ব্যবহার করেন। গিনি-সহগ ধারণা দেয় সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে বৈষম্যের মাত্রা কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, আর পালমা-অনুপাত ধারণা দেয় আয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের সর্বনিম্নের ৪০ শতাংশের মোট আয়ের তুলনায় সর্বোচ্চ আয়সম্পন্ন ১০ শতাংশের মোট আয় কতগুন বেশি। গিনি-সহগের মান শূন্য থেকে একের মধ্যে থাকে। মান যদি শূন্য হয় তাহলে বলা যায় সমাজে চূড়ান্ত সাম্য বিরাজ করছে (যা বাস্তবে অসম্ভব); আর মান যদি এক হয়, তাহলে বলা যায় সমাজের সম্পূর্ণ আয় এক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হয়েছে, যেটিও বাস্তবে সম্ভব নয়। স্বভাবতই, এই মান শূন্যের যত কাছাকাছি থাকে ততই দেশের আয় বিতরণকে সমতাধর্মী (*ইগালিটারিয়ান*) আর তার উল্টোটা হলে তাকে বৈষম্যপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশে গিনি-সহগের মান ছিল ০.৩৮৮, যা বাড়তে বাড়তে ২০২২ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ০.৫৭-এ। অর্থাৎ, এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ 'বৈষম্যপূর্ণ' অবস্থা থেকে রূপান্তরিত হয়েছে 'চরম বৈষম্যপূর্ণ' দেশে।

অন্যদিকে পালমা-অনুপাত ১৯৯২ সালের ১.৬৮ থেকে বেড়ে ২০২২ সালে হয়েছে ৩.২০। অর্থাৎ, সমাজের নিম্নতম ৪০ ভাগ মানুষের আয়ের তুলনায় উচ্চআয়ের ১০ শতাংশ মানুষের আয় আগে যেখানে ছিল পৌনে দুই গুনের সামান্য কম, তা ২০২২ সালের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে সোয়া তিনগুণের মত। অন্য ভাষায়, সমাজের নিঃস্বতম জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশকে আরো নিঃস্ব করে দিয়ে সম্পদের শীর্ষে থাকা একটি ছোট অংশের জীবনকে আরো জৌলুসপূর্ণ করার মধ্যেই নিহিত ছিল আমাদের বহুল প্রশংসিত উন্নয়নের আসল কৃতিত্ব।

এখন প্রশ্ন হল, দেশের উন্নয়নের জন্য সম্পদের এরূপ অন্যায্য বন্টন কি আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে? এই প্রশ্নে নজরুলের উত্তর হল, তা অবশ্যই নয়। তিনি উন্নত বিশ্বের ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস এবং জার্মানির মত দেশ এবং পূর্ব-এশিয়ার তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মত উন্নয়ন-বিস্ময় (*ডেভেলপমেন্ট-মিরাকল*)-এর দেশের পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে, উন্নয়নের জন্য আয়ের এরূপ অন্যায্য বন্টন অবশ্যই জরুরি নয়। বিশেষত, তাইওয়ানের সাথে বাংলাদেশের একটি সচিত্র (*গ্রাফিক্যাল*) তুলনা খুবই চমকপ্রদ। এতে দেখা যায় যে, ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান এবং তৎকালীন তাইওয়ানের গিনি-সহগের মান ছিল কমবেশি ০.২৮ এর মত। আর ২০২২ সালে এসে এই মান তাইওয়ানের জন্য হয়েছে একটু বেড়ে ০.৩০ এর মত আর বাংলাদেশে এই মান ০.৩৪ কে ছাড়িয়ে গেছে। বস্তুত, আয় বৈষম্যের দিক থেকে বাংলাদেশ এখন ক্রমশই চরম বৈষম্যপূর্ণ দেশগুলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এমনটা মনে করা অমূলক নয়।

এরপর লেখক বৈষম্যের এই ক্রমাগত বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে কী প্রতিফল বয়ে আনতে পারে, এবং ইতিমধ্যে এই দিকে কতদূর অগ্রসর হয়েছে তার কিছু চিত্র তুলে ধরেন। বৈষম্যের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া– অর্থাৎ, বৈষম্য কীভাবে আরও উচ্চতর বৈষম্যের জন্ম দেয় বা অন্যভাবে বলতে গেলে 'বৈষম্য ফাঁদের' সৃষ্টি হয় – তার একটি সচিত্র ব্যাখ্যার পর নজরুল বিভিন্ন সূত্রের পরিসংখ্যান দিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাটি তুলে ধরেন। তাঁর দেয়া তথ্যমতে, যেখানে প্রথম জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ী-শিল্পপতির আসন সংখ্যা ছিল ২৪ শতাংশ, সেখানে ২০২৪

সালের সংসদে তা ৬৫. ৪৪ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, যারা বৈষম্য নিরসনের জন্য আইন প্রণয়ন বা নীতি নির্ধারণ করবেন তারাই হলেন বৈষম্যের প্রধান সুবিধাভোগী। তাই বলা যায়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক, সব দিক দিয়েই বাংলাদেশ এখন বৈষম্য পুনরুৎপাদনের একটি উর্বর ক্ষেত্র। এ ধরনের গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষাকারী উন্নয়ন অনেক সময়ই একপর্যায়ে এসে উন্নয়নের উচ্চতর স্তরে পৌঁছানোর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, যাকে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ নাম দিয়েছেন 'মধ্য আয় ফাঁদ'। তাই নজরুলের অভিমত, অচিরেই এই মধ্য আয় ফাঁদে আটকা পড়তে না চাইলে বাংলাদেশকে অবশ্যই বৈষম্য হ্রাসের বিষয়ে জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

কিন্তু কী হতে পারে সেই পদক্ষেপ? এই প্রশ্নের উত্তরই লেখক খুঁজেছেন পরবর্তী বিভিন্ন অনুচ্ছেদে। প্রথমে 'শ্রম আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় বৈষম্য হ্রাসের বিভিন্ন পন্থা' শিরোনামে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট আয়ে শ্রমিকের হিস্যা বাড়ানো যায়; আর দ্বিতীয় ধাপে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে সরাসরিভাবে প্রাপ্ত পুঁজি আয়ের পুনর্বিতরণের মাধ্যমে শ্রমজীবি মানুষের আয় বৃদ্ধি করা যায়। শুরুতেই তিনি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রাথমিক আয় সৃষ্টির রাজনৈতিক অর্থনীতি অনুসরণে ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশে শ্রম আয়ই হল দরিদ্র মানুষের আয়ের প্রধান উৎস, এবং মজুরি হল শ্রম আয়ের প্রধান রূপ। মজুরি সহ অন্যান্য ধরনের সামান্য কিছু আয় বাদ দিলে সামাজিক আয়ের বাকি সমস্তটাই হল সম্পদ মালিকের আয়। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য যত বেশি সমাজে বৈষম্যও ততোই বেশি।

অতঃপর তিনি বাংলাদেশে – কী গ্রামীণ, কী শহুরে – মজুরি আয়ের করুণ চিত্র তুলে ধরেন। এখানে লেখক (১৭ নং পৃষ্ঠায় ১.৪ নং সারণিতে ২০১০-২০১৬ সময়কাল, অর্থাৎ মোট ৬ বছরের প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান পরিবেশন করেন; কিন্তু এর বর্ণনাকালে ১৬ নং পৃষ্ঠায় বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধি হারের উল্লেখ করেন। এই অসামঞ্জস্য পাঠকের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করে)। যাহোক, পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি দেখান, যেখানে বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে বার্ষিক ৭.১৩ শতাংশ হারে, সেখানে শহুরে মজুরি বেড়েছে বার্ষিক মাত্র ১.২৪ শতাংশ এবং গ্রামীণ

মজুরি আরো কম, ১.০৬ শতাংশ হারে। সুতরাং, বৈষম্য হ্রাস করতে হলে মজুরি বাড়ানো একটি অপরিহার্য করণীয়।

লেখক লক্ষ করেন যে, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ মজুরি বৃদ্ধির একটি স্বীকৃত পন্থা হলেও বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই অনেকে তাত্ত্বিক যুক্তি দেখিয়ে এর বিরোধিতা করেন। যেমন তাঁরা দাবি করেন যে, এর ফলে বেকারত্ব বাড়বে, বাজারে প্রতিযোগিতা বিকৃত হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সুবিধা হারাবে ইত্যাদি। লেখক বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিটি যুক্তিই তত্ত্ব এবং তথ্য দিয়ে খন্ডন করেন। তৈরি পোশাক সেক্টরে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কথা বলে নূন্যতম মজুরি বৃদ্ধির বিরোধিতা যে কতটা অসার তা দেখানোর জন্য তিনি প্রায় ২৫টি দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ন্যূনতম মাসিক মজুরি তুলে ধরেন। তাতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সাথে যে সমস্ত দেশের এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা হয় তার সবকটিরই নূন্যতম মজুরি বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন বাংলাদেশের মাসিক ৬৩ ডলারের বিপরীতে এই মজুরি পাকিস্তানে ১২১, ভিয়েতনামে ১৫১, ভারতে ১৬৮, ফিলিপাইনে ২০০, চীনে ২১৭, থাইল্যান্ডে ৩২০, এবং তাইওয়ানে ৭৪৭ ডলার। নজরুল দেখান যে, সমস্যা আসলে মজুরি কমানোতে নয়, তা হল শ্রমের উৎপাদনশীলতায়। চীন, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, এবং ভিয়েতনাম- প্রতিটি দেশেই বাংলাদেশের তুলনায় শ্রমের উৎপাদনশীলতা কয়েক গুণ বেশি। তাই নজরুলের যুক্তি, মজুরি দাবিয়ে রেখে নয় বরং কারিগরি উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে পারবে। শুধু সস্তা শ্রমের উপর নির্ভরশীল হয়ে বাংলাদেশ উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তরিত হতে পারবে না।

শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি ছাড়াও আরেকটি যে উৎস থেকে আয় বৈষম্য হ্রাস করার প্রতি নজরুল দৃষ্টি দেন তা হল 'পুঁজি আয়ের বিচ্ছুরণ'। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট আয় থেকে শ্রমিকের মজুরী বাদ দিয়ে যা থাকে তা থেকে প্রকৃত খরচপাতি বাদ দিয়ে বাকী সবটাই পুঁজিপতি-মালিকের পকেটে যায়। অর্থনীতিবিদগণ এই বণ্টনকে ন্যায্য মনে করেন না, কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার না থাকলে শ্রমিক মজুরীর মাধ্যমে তার উৎপাদনশীলতার অনুপাতে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। আর

বাংলাদেশে কোন বাজারেই যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নেই এ কথাতো সুবিদিত। তাই নজরুল ইসলাম পুঁজি আয়ের একটি অংশ শ্রমিকের কাছে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করেন এবং এই প্রক্রিয়ার নাম দেন 'পুঁজি আয়ের বিচ্ছুরণের মাধ্যমে আয় বৈষম্য হ্রাস'। এক্ষেত্রে তিনি ভূমি আয় এবং শিল্পপুঁজি আয়কে পৃথক ভাবে উপস্থাপন করেন, কারণ এই দুইয়ের মধ্যে মালিকানার বৈশিষ্টের জন্য আয়-বণ্টনের বৈশিষ্টের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই মালিকানার ধরণের মধ্যে শ্রমিক/চাষী বান্ধব পরিবর্তনের জন্য তার সুপারিশগুলি বিবেচনার দাবী রাখে[২]।

মজুরী এবং পুঁজি আয় বিচ্ছুরণের মত প্রাথমিক আয় বণ্টনের কার্যকারিতা অনেক সময় বাজারের কারণে ব্যহত হতে পারে; তাই প্রাথমিক আয় বণ্টনের পর লেখক বণ্টিত আয়ের পুনর্বিতরণের মাধ্যমে বৈষম্য হ্রাসের বিষয়টি সামনে আনেন। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, জিডিপির পুনর্বিতরণ উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বে এখন একটি সাধারণ নীতি। মূলত রাজস্ব আয়-ব্যয়ের মাধ্যমে এই পুনর্বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পুঁজিবাদের মডেল নির্বিশেষে এসব দেশে সাধারণত জিডিপির প্রায় ৩৫ শতাংশ পুনর্বিতরিত হয়। বস্তুত, এই নীতির মাধ্যমেই এই সমস্ত দেশে পুঁজিবাদকে সহনীয় এবং গ্রহণযোগ্য করে রাখা হয়। যেমন, কোনো কোনো দেশ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গিনি সহগকে ০.৫ বা তার কাছাকাছি (উচ্চ আয়-বৈষম্য) থেকে প্রায় ০.৩ (মোটামুটি সহনীয় বৈষম্য, যেমন আয়ারল্যান্ডে) বা তার কাছাকাছি আনতে পেরেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা কি?

পরিতাপের বিষয় যে, বাংলাদেশের এক্ষেত্রে যাত্রা বরং উল্টোদিক। এই উল্টোযাত্রার কারণ সম্বন্ধে ধারণা এবং তার সংশোধনের উপায় নিয়েই লেখক আলোচনা করেছেন পরবর্তী অনুচ্ছেদ জুড়ে। প্রথমে তিনি লক্ষ্য করেন যে, আয়ের উল্লেখযোগ্য পুনর্বিতরণ করতে হলে প্রথমে উচ্চহারে কর বা রাজস্ব আহরণ করতে হবে; তারপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা নিম্নবিত্তের হাতে তুলে দিতে হবে। অথচ, লেখকের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে ২০২৩ সালে জিডিপির মাত্র ৮.২ শতাংশ রাজস্ব হিসাবে এবং তারমধ্যে ৭.৩ শতাংশ কর হিসাবে সরকারি কোষাগারে আসে। তদুপরি, মোট কর আয়েরও প্রায় ৭২ শতাংশ আসে বিভিন্ন পরোক্ষ কর থেকে।

তার অর্থ হলো, পুনর্বিতরণের জন্য জিডিপির খুব সামান্য অংশই সরকারের হাতে ফিরে আসে, আর যা আসে তার মধ্যেও একটা বড় অংশ নিম্ন কিংবা নিম্ন-মধ্যবিত্তের কাছ থেকে নেওয়া, কারণ পরোক্ষ কর ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলেই প্রদান করে। তাই, লেখকের ভাষায়, বাংলাদেশের কর কাঠামো দরিদ্র-বিরোধী এবং বৈষম্য বৃদ্ধিকারী। এ কারণে লেখক বৈষম্য হ্রাসের জন্য আয়কর ও সম্পদ করের মত প্রত্যক্ষ উৎসসমূহ থেকে অধিক হারে কর আহরণ এবং পরোক্ষ করের ভূমিকা হ্রাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাজস্ব ব্যয়ের প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে যেয়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের একটি চিত্র তুলে ধরেন। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের শর্তাধীন এবং শর্তহীন বিভিন্ন পুনর্বিতরণের সাথে বাংলাদেশের কিছু কর্মসূচির তুলনা করে তিনি আলোচনাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি, অদক্ষতা, ও অন্যান্য নেতিবাচক বিষয়গুলি সামনে এনে তিনি নীতি নির্ধারকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ভোলেন না।

পরোক্ষ পুনর্বিতরণের আলোচনায় লেখক মূলত খাদ্য, শিক্ষা, ও স্বাস্থ্য, এই তিন বিষয়ে নিম্ন আয়ের জনগণের প্রাপ্তির উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সরকারের শুল্কনীতি যদি মানুষের ভোগ্যবস্তুগুলি সস্তা করে তুলতে পারে অথবা সরকারি শিক্ষা ও চিকিৎসা সহজলভ্য হয় তবে তা পক্ষান্তরে দরিদ্র মানুষের (প্রকৃত) আয় বৃদ্ধিরই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা এবং চিকিৎসার 'বহিৎসারিত উপকার' (*পজিটিভ এক্সটার্নালিটি*)'র কথা স্মরণ করিয়ে লেখক সর্বজনীন শিক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে আলোচনাটি সমাপ্ত করেন।

উপরের নীতিগত এবং তত্ত্বগত আলোচনার পর লেখক যখন বাংলাদেশের রিয়েলিটিতে আসেন, তখন তার হতাশা আর অব্যক্ত থাকে না। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের মত প্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের কথাই বলি, আর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের পরোক্ষ পুনর্বিতরণের কথাই বলি, কোন ক্ষেত্রেই যে তা প্রত্যাশার ধারে কাছেও নেই তা বলার বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখক আলোচনাটিকে আরো হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন, যখন তিনি যুক্তরাজ্যের সরকারি আয়-ব্যয়ের একটি ফিরিস্তি আমাদের সামনে হাজির

করেন। একটি উন্নত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কী ধরনের সামাজিক চরিত্র গ্রহণ করা উচিত তা লেখক যুক্তরাজ্যের উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে লেখক অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের সরকারি উদ্যোগের প্রতি দৃষ্টি দেন। তাঁর মতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রবৃদ্ধিকে দরিদ্র অভিমুখী করা, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য মোকাবেলা করা, অতি-দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধির উপর আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া, সুনির্দিষ্টভাবে সমাজের নিচের ৪০ শতাংশের গড় আয় যাতে গোটা সমাজের গড় আয়ের চেয়ে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পায় তা নিশ্চিত করা ছিল এই পরিকল্পনার ঘোষিত লক্ষ্যের অন্তর্গত। শুধু তাই নয়, এই লক্ষ্য অর্জনের শর্ত হিসেবে তিনটি নির্ধারক – নিয়োজনের বৃদ্ধি, শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি – চিহ্নিত করা এবং তাদের বর্তমান হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির উল্লেখ দ্বারা পরিকল্পনার আন্তরিকতা সম্বন্ধে লেখক যতটা আশান্বিত হন পরক্ষণে ততটাই হতাশ হন যখন তিনি দেখেন যে প্রস্তাবিত নীতিসমূহের প্রয়োগ এবং তার ফলাফল সম্পর্কে কোন বিস্তারিত হিসাব এই পরিকল্পনায় দেওয়া হয় না। তদুপরি, যদি-কিন্তু'র আবর্তে পড়ে আন্তরিকভাবে (!) গৃহীত এই কর্মসূচিগুলিও কতটা বাস্তবায়িত হবে এ সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া লেখকের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। নির্দ্বিধায় বলতে হয়, নজরুলের লেখার এই অংশটি সবদিক দিয়েই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

লেখক এই পুস্তকের মুখবন্ধেই উল্লেখ করেছেন, এটি হলো তাঁর ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত *বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা-বর্তমান ধারার সঙ্কট এবং বিকল্প পথের প্রশ্ন*শীর্ষক পুস্তকের পদাঙ্ক অনুসরণে লেখা। ঐ পুস্তকে লেখক বাংলাদেশের পুঁজিবাদী উন্নয়নের চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য – ধনী-অভিমুখীনতা, শহর-অভিমুখীনতা, ব্যক্তিস্বার্থকে সমষ্টিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান প্রদান, এবং বৈদেশিক নির্ভরতা – চিহ্নিত করে তার বিপরীতে দরিদ্র-অভিমুখী, গ্রাম-অভিমুখী, সমষ্টিস্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান প্রদানকারী, এবং আত্মনির্ভর একটি উন্নয়ন মডেলের প্রস্তাব করেছিলেন।

তাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই অষ্টম পরিকল্পনার দরিদ্রমুখী উন্নয়ন প্রস্তাবের আলোচনায় এসে তিনি আরেকবার সেগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে বাংলাদেশ সেই ধারায় অগ্রসর হতে পারেনি। কিন্তু যদি পারত, তাহলে বাংলাদেশ পূর্ব-এশিয় ধারার মতোই আর একটি পথ-প্রদর্শিত পুঁজিবাদী ধারার উন্নয়নের উদাহরণ হতে পারতো। লেখক এই পর্বে সমগ্র আলোচনাটির উপসংহার টানেন এভাবে: উন্নয়ন অর্থনীতির আলোচনায় বৈষম্যবৃদ্ধিহীন উন্নয়ন এখন একটি স্বীকৃত মডেল। শুধু তাই নয়, পূর্ব-এশীয় টাইগারদের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা একথাও প্রমাণ করে যে, প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক সমতা একটি শক্তিশালী সহায়ক উপাদান। তাই অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসকে উন্নয়নের একটি পার্শ্ব-লক্ষ্য হিসেবে না দেখে এই প্রয়াসের একটি মৌল লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার ফলে বাংলাদেশ 'প্রবৃদ্ধি-সমতা-আরো প্রবৃদ্ধি'র প্রক্রিয়া সম্বলিত একটি শুভচক্রের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে।

পরিচ্ছেদ ২. সুশাসন অর্জন

লেখক পরিচ্ছেদটি আরম্ভ করেন একটা সাধারণ বক্তব্য দিয়ে: 'সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ খুবই পিছিয়ে আছে'। বাংলাদেশ দুর্নীতিতে সর্বোচ্চদের এক-দুই-তিনের মধ্যে থাকে, এই অবস্থাটার সাথে আমরা একরকম অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তাই সুশাসনে পিছিয়ে আছি, এমন খবরে আমরা ততটা বিচলিত হই না। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, মত প্রকাশ এবং জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সহিংসতা, সরকারের দক্ষতা, নিয়ন্ত্রণের মান, আইনের শাসন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ – সুশাসনের এমন কোন মানদন্ড নেই যার বিচারে বাংলাদেশ একেবারে তলানির দিকে নেই, তখন আর বিচলিত না হয়ে থাকা যায় না। বিশেষ করে তার সাথে যখন লেখক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখান যে, দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশাই বলি আর সম্পদের পাচার বা নিঃসরণই বলি, সব কিছুর সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে দুঃশাসন অক্টোপাসের অষ্টবাহু, তখন আর বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখার উপায় থাকেনা। তাই লেখক সুশাসন

বিষয়ে আলোচনার আরম্ভ বিন্দু হিসাবে বেছে নেন তার অর্থনৈতিক ভিত্তি লুটপাটতন্ত্রকে, যাকে তিনি আখ্যায়িত করেন 'নিঃসরণ মডেল' নামে।

নিঃসরণ মডেল বা লিকেজ মডেলের মাধ্যমে নজরুল দেখান, দেশের সম্পদ যাই উৎপাদিত হোক না কেন তার একটা অংশ অনৈতিকভাবে এবং কোন না কোন অবৈধ উপায়ে দুর্নীতিবাজ আমলা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, চতুর ও ধান্দাবাজ বিশেষজ্ঞ, প্রভৃতি সামাজিক পরজীবি (*প্যারাসাইট*) গোষ্ঠীর হাতে পড়ে দেশের বাইরে চলে যায়, অথবা দেশের ভিতরেই একটি দুর্নীতিপরায়ণ সমাজের ভিত্তি পুনঃপৌণিকভাবে জোরদারের কাজে ব্যবহৃত হয়।

অতঃপর লেখক দেখান কিভাবে এই নিঃসরণ মডেল দেশে গণখাতের উৎপাদনশীলতা হ্রাস, প্রকৃত বিনিয়োগ হ্রাস, পুঁজি পাচার (তার আবার বিভিন্ন রকমফেরের বর্ণনাসহ), ইত্যাদির মাধ্যমে একটি চরম বৈষম্যপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলে, রাজনীতির বিকৃতি ঘটিয়ে একদিকে তাকে অবৈধ সম্পদ গড়ে তোলার হাতিয়ারে পরিণত করে, অন্যদিকে এই অবৈধ সম্পদ ব্যবহার করে রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়নের চরমে পৌঁছে দেয় এবং শেষাবধি দেশকে 'মধ্য আয় ফাঁদে'র দিকে নিয়ে যায়। আর এই প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদানটি হল রাজনীতি এবং জনপ্রশাসনের অযৌক্তিক এবং অনৈতিক মেলবন্ধন। তাই পরবর্তী একটা বড় অংশ জুড়ে লেখক জনপ্রশাসনের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে স্থায়ীভাবে অরাজনৈতিক চরিত্রের একটি জনপ্রশাসন নিশ্চিত করার জন্য তার কাঠামো, আকার, নিয়োগ ও পদোন্নতি, ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন[৪]।

জনপ্রশাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করার প্রধান শর্ত হল নিরপেক্ষভাবে মেধার বিচার করে নিয়োগ দেওয়া এবং একইভাবে নিরপেক্ষতার সাথে তাদের মূল্যায়ন এবং পদোন্নতির ব্যবস্থা করা। এই কথাটি মাথায় রেখেই লেখক বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের উল্লম্বিক এবং অনুভূমিক কাঠামো, নিয়োগ প্রক্রিয়া, এবং পদোন্নতি নীতিমালা ও প্রক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। সেই ব্রিটিশ আমলে মূলত রাজস্ব আদায়কারী পুলিশ এবং বিচারক দিয়ে জনপ্রশাসন ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে এবং প্রয়োজনের তাগিদে তার অনেক শাখা প্রশাখা

সৃষ্টি হয়েছে; তাদের আন্তঃসম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে; আর তার সাথে তাল মিলিয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উদ্ভূত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জেরই সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ ঘটে শিক্ষার্থীদের ২০২৪ সালের কোটাবিরোধী আন্দোলনে, যা এক পর্যায়ে এসে সরকার পতনের আন্দোলনের রূপ নেয় এবং আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্বাধীনতার পরপরই কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং তার নানামুখী বিবর্তনের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করে এই সত্যটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন যে, রাজনৈতিক সরকার, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, ইত্যাদির সাথে গণআকাঙ্ক্ষার একটি সুষম ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় যে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তারই মাশুল বাংলাদেশ এখন গুনে চলছে। এই পরিস্থিতির উদ্ভবের জন্য অবশ্যই রাজনৈতিক সরকারের অনায্য আকাঙ্ক্ষা এবং তার ভ্রান্ত ও অনৈতিক বাস্তবায়ন কৌশল অনেকখানি দায়ী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের মত ভঙ্গুর গণতন্ত্রের দেশে রাজনৈতিক সরকারের মধ্যে এরূপ অন্যায্য এবং অনৈতিক আকাঙ্ক্ষার জন্ম হওয়া একদম বিরল নয়, তবে তা সেই সব দেশেই ভিত্তি গেড়ে বসে যেখানে প্রশাসনকে সে তার সঙ্গী করে নিতে পারে। আর তারা এটা তখনই করতে পারে যখন প্রশাসনের বিভিন্ন কাঠামোগত অসঙ্গতি, পারিতোষিক পরিমাপের অস্বচ্ছতা এবং তজ্জনিত হতাশা, এবং দেশপ্রেম ও নৈতিকতার নিম্নমান, ইত্যাদি রাজনীতি-প্রশাসনের একটি অশুভ নেক্সাস তৈরির সুযোগ করে দেয়। যে সমস্ত দেশে জনপ্রশাসনের স্থায়ী-অরাজনৈতিক ধরনের মডেল বিরাজমান সেখানে এ ধরনের অশুভ নেক্সাস অত্যন্ত বিপদজনক। এক কথায় বলতে গেলে, নজরুলের ভাষায়, বাংলাদেশের উন্নয়নের নিঃসরণ মডেল (যার উদাহরণ হিসেবে তিনি কানাডার বেগম পাড়ার মালিকদের প্রধান অংশটি যে দেশের সরকারি আমলা কর্মচারী এ সম্বন্ধীয় তথ্যটি হাজির করেন)-এর উৎস এখানেই খুঁজতে হবে। তাই সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বিপজ্জনক এই দিকটির আলোচনায় লেখক অনেকখানি সময় ব্যয় করেছেন।

প্রশাসনের অযৌক্তিক কলেবর বৃদ্ধির বিপরীতে তাকে একটি অপটিমাম বা যৌক্তিক আকারের সীমাবদ্ধ রেখে কিভাবে নানামুখী প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা, নৈতিক উৎসাহ-প্রদান (*পারসুয়েশন*), ইত্যাদির মাধ্যমে একটি দেশপ্রেমিক প্রশাসনিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তা নিয়ে লেখক বিশদ আলোচনা করেন। 'প্রশাসন এবং বস্তুগত প্রণোদনা' শীর্ষক অনুচ্ছেদটিকে কি তাত্ত্বিক, কি ব্যবহারিক, উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এই আলোচনার নির্যাস বলা যেতে পারে।

পরিচ্ছেদ ৩. আনুপাতিক নির্বাচনের প্রবর্তন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জনপ্রশাসন নিয়ে আলোচনার পর লেখক স্বাভাবিকভাবেই পরিশাসনের অপর উপাদান রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। রাজনীতি এবং গণতন্ত্র একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তাই সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য চাই সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চা। এই সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করার জন্যই লেখকের প্রস্তাব 'আনুপাতিক নির্বাচন' ব্যবস্থার প্রবর্তন। বিশ্বের ১৭০টি দেশের মধ্যে ৯১টি দেশই আনুপাতিক নির্বাচন গ্রহণ করেছে, আলোচনার শুরুতেই এই তথ্যটি দিয়ে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন যে, বাংলাদেশের জন্য এই আলোচনাটি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। আমাদের দেশে আনুপাতিক নির্বাচন নিয়ে আলোচনা বলতে গেলে ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পরেই জোরেশোরে শুরু হয়েছে, তাই এই নির্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা খুবই সীমিত এবং কিছুটা বিভ্রান্তিকরও। তাই লেখক আলোচনার শুরুতে আনুপাতিক নির্বাচন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রাথমিক এই আলোচনার পর তিনি বাংলাদেশের মতো রাজনৈতিক অস্থিরতার দেশে আনুপাতিক নির্বাচনের ইতিবাচক সম্ভাবনাগুলি তুলে ধরেন। তবে তার আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নির্বাচন পদ্ধতির সাথে সুশাসনের বিভিন্ন সূচকগুলির তুলনা করে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন যে, গড়ে উন্নত-অনুন্নয়নশীল নির্বিশেষে আনুপাতিক নির্বাচনের দেশগুলিতে সুশাসনের সূচকসমূহ বেশি ইতিবাচক। বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক নির্বাচনের সম্ভাব্য সুফলের আলোচনায় তিনি প্রথমে আনেন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রসঙ্গটি। কয়েকটি মোটামুটিভাবে সুষ্ঠু নির্বাচনের তুলনা

করে তিনি দেখান যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে ভোটের সামান্য পরিবর্তন ফলাফলের উপর যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে তেমনটা আনুপাতিক নির্বাচনে হতে পারে না। ফলে দেশে স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এছাড়া ভোটে কারচুপির সুযোগ ও প্রণোদনা কমে যাওয়া, সংসদ সদস্যদের গুণমানের বৃদ্ধি, উঁচু মানের নির্বাচনী প্রচার অভিযান, প্রাক নির্বাচনী জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস, রাজনৈতিক দলসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকারের বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র দল ও জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যের অবসান, উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার অবসান, শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব, প্রভৃতি ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে রাজনীতির যে গুণগত উল্লম্ফন ঘটবে তাই হলো আনুপাতিক নির্বাচন থেকে আসল প্রাপ্তি।

তবে আনুপাতিক নির্বাচনের নেতিবাচক সম্ভাবনাগুলিকেও লেখক এড়িয়ে যাননি। এসব সম্ভাবনার মধ্যে আছে ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের সমস্যা, জোটবদ্ধ সরকার ও ঘনঘন সরকার পরিবর্তন, দলের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার, এ ধরণের বিষয়সমূহ। লেখক এসব বিষয়ে তাঁর মতো করে কিছু প্রতি-উত্তর বা কিছু সমাধান দিয়েছেন, তবে তা সব পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

আলোচনার শেষের দিকে এসে নজরুল একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। সেটা হলো এই যে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সাধারণভাবে রাষ্ট্র সংস্কারের দাবিটি জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু তার বাস্তবায়ন করতে হলে আনুপাতিক নির্বাচন অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব আছে যা কোন-না-কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের মনঃপুত নয়। তাই এককভাবে শক্তিশালী হয়ে সংসদে গেলে তারা এরূপ জনসমর্থিত অথচ নিজ দলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমন সংস্কার বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হবে না। অন্যদিকে, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশের বিশ্লেষণ করে লেখকের ধারণা হয়েছে যে, আনুপাতিক নির্বাচন গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ এখন সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অবস্থানে আছে।

আমরা জানি ইতিমধ্যে সংলাপ শেষ হয়েছে, সংস্কার নিয়ে একটি ঘোষণাও জারি হয়েছে; তবে আনুপাতিক নির্বাচন নিয়ে লেখকের বর্ণিত আশাবাদ থেকে তা অনেকখানি দূরে। বিশেষ করে আনুপাতিক নির্বাচনের যে মডেলটি আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে তার সাফল্য নিয়ে অনেক মহল থেকে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে । নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের বর্তমান প্রয়াসের শেষ পরিণতি দেখার জন্য আমাদের হয়তো নির্বাচনের পরেও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে।

পরিচ্ছেদ ৪. পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

পরিচ্ছেদটির শিরোনাম দুই ধরনের করণীয়র আভাস দেয়। একটি হলো পরিবেশের সুরক্ষা, অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনে প্রকৃতির সাথে যে মিথস্ক্রিয়া ঘটে তার মাধ্যমে পরিবেশ যেন অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। অন্যটি হলো, পৃথিবীময় জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাতগুলিকে যেন আমরা নিম্নতম পর্যায়ে রাখতে পারি সেই লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাই লেখক পরিচ্ছেদটি আরম্ভ করেছেন ইতিমধ্যে বাংলাদেশে পরিবেশের যে ধ্বংস প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এক ঝলকে তার কিছুটা ধারণা দিয়ে। তার ভাষায়, 'সব মিলিয়ে পরিষ্কার, আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হলো উন্নয়নকে পরিবেশ বিধ্বংসী হওয়ার পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব করা'[৭]।

অবশ্য পরিচ্ছেদের শিরোনামটি আলোচনার একটি বিস্তৃত পরিধির আভাস দিলেও প্রকৃতপক্ষে লেখক এখানে মূলত নদী ব্যবহার ও নদী ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর প্রধান কারণ বোধহয় এই যে, আমাদের জীবন-জীবিকার এমন কোন ক্ষেত্র নেই যা নদী দ্বারা প্রভাবিত নয় বা নদীর গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করে না। তাই পরিবেশ সম্বন্ধীয় প্রায় সব আলোচনাই শেষমেষ নদীতে এসে ঠেকে। সে যাই হোক, পরিবেশ দূষণের সাথে যদি নদীর সম্পর্ক থাকে তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবীভাবে তা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। লেখক তাই অভ্যন্তরীণ এবং আঞ্চলিক (আন্তর্জাতিক অর্থে) – এই দুই দিক থেকেই দূষণের কারণগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন।

তাত্ত্বিকভাবে নদী অবক্ষয়ের অভ্যন্তরীণ কারণগুলি চিহ্নিত করতে যেয়ে তিনি মানুষের জীবন-যাপনে নদী ব্যবহারকে দুইটি বিপরীত ধর্মী পন্থা হিসাবে দেখেন। একটি হল 'প্রকৃতিসম্মত পন্থা', যার মূলকথা হল নদীকে তার মত চলতে দেওয়া এবং নিজেদের জীবনকে তার সাথে খাপ খাইয়ে চলা; অন্যটি হল 'বাণিজ্যিক পন্থা,' যার মূল কথা হল জীবনের প্রয়োজনে মানুষের কারিগরি সক্ষমতার সবটুকু ব্যবহার করে নদী থেকে যতটা সুবিধা আদায় করা যায় তা করে নেওয়া। কারিগরি ও কাঠামোগত বিশেষত্বের কারণে তিনি এই পন্থাকে 'বেষ্টনী পন্থা' হিসেবেও অভিহিত করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, দেশ যতই শিল্পে অগ্রসর হতে থাকে ততোই নদীর প্রতি বেষ্টনীপন্থার বিস্তার ঘটে। কীভাবে তা ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশে নানামুখী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্ম দিচ্ছে তাই তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে। তবে নজরুল ইসলাম আমাদের আশ্বস্ত করেন যে, প্রাকৃতিক কারণেই নদীর সাথে এই দুরাচার বেশিদিন চলতে পারে না। সেকারণেই শিল্পোন্নত অনেক দেশ পরিবেশ বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা থেকে আবার প্রকৃতিসম্মত পন্থায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। এমনকি অনেক দেশে সাংবিধানিকভাবেও নদনদীর প্রতিরক্ষার জন্য বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে।

তত্ত্ব এবং তথ্য সমৃদ্ধ এই আলোচনার পর লেখক বাংলাদেশে বেষ্টনী পন্থার প্রয়োগ ও তার বিভিন্ন প্রতিফল নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাভাবিক পলিপতনের অভাবে প্লাবন এবং জোয়ারভূমির প্রাকৃতিক অবক্ষয়, প্রায়শই বেষ্টনী বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে স্বাভাবিক বন্যার পরিবর্তে প্রলয়ংকরি বন্যার আবির্ভাব, পাম্প এবং কৃত্রিম খাল নির্ভর ব্যবহারসম্পন্ন অদক্ষ সেচ, বেষ্টনীর ভিতরে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জটিলতা ও ব্যয়বহুলতার কারণে নতুন ধরনের জলাবদ্ধতার সৃষ্টি, প্লাবনভূমিতে স্বাভাবিক পলিপতন বন্ধ হওয়ার কারণে নদীতল উঁচু হয়ে নদী ভাঙ্গন এবং নদী-খাত বিকৃতি, বেষ্টনীর ভিতরের অংশকে বন্যা মুক্ত রাখতে গিয়ে উন্মুক্ত অঞ্চলকে আরো করাল বন্যার মুখে ফেলে দেওয়া, ইত্যাদি বহুবিধ পুঞ্জিভূত সমস্যাকে অবিশেষজ্ঞদের জন্য খুবই প্রাণবন্ত ও বোধগম্যভাবে বর্ণনা করে লেখক এই পন্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন বলে আমার ধারণা।

এরপর তিনি আসেন বর্তমান বাস্তবতায় বেষ্টনী প্রথার অবসান ঘটিয়ে উন্মুক্ত পন্থায় ফেরত যেতে হলে কী কী করণীয় তার আলোচনায়। এই আলোচনার শুরুতেই লেখক একটি বিষয় পরিষ্কার করেন যে, প্রকৃতিকে নিয়ে খেলতে হলে হঠাৎ করে পুরনো সব ফেলে দিয়ে শূন্য থেকে শুরু করার কোন সুযোগ নেই। ভুল-শুদ্ধ যে করেই হোক সৃষ্ট বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই আমাদের সামনে এগোতে হবে। অর্থাৎ, বেষ্টনীর সাথে খাপ খাইয়ে গড়ে ওঠা জনজীবনকে নতুন ভাবে অস্থিতিশীল না করে, বেষ্টনীর ইতিবাচক ফলসমূহকে সংরক্ষণ করে, এবং এগুলির নেতিবাচক ফলাফলসমূহ প্রশমন ও দূরীকরণের মাধ্যমে উন্মুক্ত পন্থা প্রয়োগের দিকে আমাদের যেতে হবে। লেখক এই পদ্ধতিকে নাম দিয়েছেন 'উইন-উইন' সমাধানের নীতি। এই নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে বাস্তবায়নের পর্যায়ক্রমিকতা, প্রকল্পভিত্তিক সুনির্দিষ্টতা (অর্থাৎ, প্রতিটি প্রকল্প তৈরি হবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে), দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার, জনগণের সম্পৃক্ততা, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় দেশজ প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন, ইত্যাদি। নীতি ও কৌশলগত উপর্যুক্ত প্রস্তাবগুলির পরে লেখক উন্মুক্ত পন্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (ক) বেষ্টনী বাঁধকে অস্থায়ী বাঁধে রূপান্তর, (খ) পর্যায়ক্রমে উঁচুভিটির গৃহ নির্মাণে প্রত্যাবর্তন; (গ) খাল-বিল-নদী-নালার পুনর্খনন ও সংস্কার; (ঘ) নৌপথের পুনরুদ্ধার ও বিকাশ; (ঙ) উন্মুক্ত মৎস্য সম্পদের পুনরুদ্ধার ও বিকাশ; ইত্যাদিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভৌতকর্ম ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রস্তাব দেন।

দূষণের অভ্যন্তরীণ উৎস ও তার প্রতিকারের প্রস্তাবসমূহ নিয়ে আলোচনার পর লেখক মনোনিবেশ করেন আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক হুমকিসমূহের দিকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এক্ষেত্রে অভিযোগের অঙ্গুলীটি মূলত: ভারতের দিকেই নির্দেশ করে। তবে, ব্রহ্মপুত্রের প্রসঙ্গে চীনের ভূমিকার কথাও এসে পড়ে। সুবিদিত যে, গঙ্গার উপর নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ এবং তিস্তার উজানে নির্মিত অসংখ্য বাঁধের কারণে বাংলাদেশে নদীভিত্তিক অবক্ষয়গুলির সৃষ্টি হচ্ছে, এবং ভারতের অনমনীয় নীতির কারণেই সমস্যাগুলির সমাধান হচ্ছে না। সেকারণে মূলত এই সমস্যাগুলির সমাধানে বাংলাদেশের করণীয় সম্বন্ধেই তিনি আলোচনাটিকে কেন্দ্রীভূত করেন। তার প্রথম প্রস্তাব হল, আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের সনদ স্বাক্ষর করা। যদিও তিনি স্বীকার করেন

যে, ভারত স্বাক্ষর না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাক্ষর ততোটা কার্যকর ফল বয়ে আনবে না, তথাপি, তাঁর মতে, বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক আলোচনায় তা বাংলাদেশের জন্য বাড়তি সুবিধা যোগাতে পারে। নজরুলের দ্বিতীয় প্রস্তাব হোল 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলা[৮]। তৃতীয় প্রস্তাব হল, ভারতের অভ্যন্তরে ফারাক্কা বাঁধ বিরোধী দাবির প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন জ্ঞাপন; এবং চতুর্থ প্রস্তাব হল, ভারত চীনের কাছ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়ে যে ব্যবহার প্রত্যাশা করে সেরূপ ব্যবহারই বাংলাদেশ ভারতের কাছে প্রত্যাশা করে, এই বিষয়টি কূটনৈতিকভাবে তাকে জানিয়ে দেওয়া। নজরুলের প্রস্তাবগুলি সাধারণ বিচারে খুবই যৌক্তিক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেক জটিল ও বহুমাত্রিক একটি বিষয়। কূটনৈতিক বিচক্ষণতা এখানে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। নীতিগতভাবে নজরুলের প্রস্তাবগুলি অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে।

সবশেষে, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসমূহ মোকাবেলায় প্রকৃতিসম্মত ও উন্মুক্ত পন্থার কার্যকারিতা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করে নজরুল ইসলাম নদীনির্ভর পরিবেশ সম্বন্ধীয় আলোচনাটি সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি সংক্ষেপে নদীর সাথে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধহীন কিছু পরিবেশ বিষয়ক আলোচনার অবতারণা করেন, যার মধ্যে রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার প্রসার, উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস হ্রাস, অভিযোজন অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো, বন এবং পাহাড়ের অবক্ষয় ও প্রতিকার, জীব বৈচিত্রের হ্রাস এবং প্রতিকার, বায়ু দূষণ ও প্রতিকার, শিল্প দূষণ ও প্রতিকার, বিপজ্জনক বর্জ্যের বিস্তৃতি ও প্রতিকার, ইত্যাদি কিছু বিষয়।

বিগত সরকারের আমলে প্রণীত 'বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' সম্পর্কে তাঁর সরাসরি বক্তব্য হল: (ক) পরিকল্পনাটি নেদারল্যান্ডের অন্ধ অনুকরণ, অথচ বদ্বীপ হিসাবে বাংলাদেশের সাথে নেদারল্যান্ডের আকাশ-পাতাল তফাৎ; (খ) নেদারল্যান্ডের জন্য বেষ্টনী পন্থা উপযুক্ত ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্ত পন্থাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ; (গ) বদ্বীপ পরিকল্পনাকারী সংস্থা নিজে কোনো প্রকল্প তৈরী না করে অন্য বিভিন্ন সংস্থা কিংবা ব্যাক্তির পূর্ব

থেকে তৈরী করা প্রকল্পসমূহকে যান্ত্রিকভাবে গ্রন্থিত করেছেন, যার ফলে একটি একক পরিকল্পনা হিসাবে তার চরিত্র খুবই দুর্বল; (ঘ) সর্বোপরি, এ ধরণের পরিকল্পনাকে হতে হবে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়ন ও পারদর্শিতার ভিত্তিতে গৃহিত একটি উদ্যোগ, যার সভাব প্রকৃত বাস্তবতা থেকে এই পরিকল্পনাকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। আশা করা যায় যে, 'বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' সম্পর্কে ভবিষ্যৎ সরকারের সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণে নজরুলের এই সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ সহায়ক হবে।

পরিচ্ছেদ ৫. গ্রাম পরিষদ গঠন

গ্রাম পরিষদ গঠনের প্রস্তাবটি অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস, পরিবেশের সুরক্ষা, সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি, ইত্যাদি বেশ কিছু প্রস্তাবিত করণীয়র সফল বাস্তবায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই প্রসঙ্গে লেখক সুদূর অতীতকাল থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বশাসিত গ্রামের ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন ১৯৭২ পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন উদ্যোগ, বিশেষ করে ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ ঘোষিত প্রতি গ্রামে 'বহুমুখী সমবায়ে'র কর্মসূচি; জিয়াউর রহমানের 'গ্রাম সরকার' গঠনের উদ্যোগ; এরশাদ সরকারের 'পল্লী পরিষদ' গঠনের উদ্যোগ; এবং খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, এক-এগারো, ইত্যাদি বিভিন্ন সরকারের প্রবর্তন, পুনঃপ্রবর্তন, ও সংশোধনের সিরিজ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে, গ্রাম পর্যায়ে একটি কার্যকর ও যুগোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনো অনুপস্থিত।

লেখকের প্রত্যাশা যে, বর্তমানে অনুপস্থিত হলেও আগামীতে বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট ভিত্তি আছে। এই আশাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি আগামী বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর একটি রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি প্রস্তাব করেন

> ক) এই কাঠামোর নাম হবে 'গ্রাম পরিষদ' (স্থানীয় সরকারের অন্যান্য ধাপের নামের – যেমন 'জেলা পরিষদ' এবং 'ইউনিয়ন পরিষদ' – সাথে সামঞ্জস্য রেখে);

খ) এর সীমানা নির্ধারিত হবে গ্রামের ঐতিহ্যগত সীমানা দ্বারা; কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ওয়ার্ড দ্বারা নয়;

গ) এর গঠন ও পরিচালনা করা হবে নির্বাচনের মাধ্যমে।

এরপর লেখক প্রস্তাবিত গ্রাম পরিষদের প্রশাসনিক ও আর্থসামাজিক করণীয়গুলির একটি তালিকা উপস্থিত করেন, যার মূল সুর হল গ্রামের স্বনির্ভর উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের যৌথ মোকাবেলাসহ সার্বিক গ্রামীণ কল্যাণের অভিভাবক হিসাবে ভূমিকা পালন করা।

শেষ করার আগে লেখক বিদ্যমান ইউনিয়ন পরিষদের সাথে গ্রাম পরিষদের সম্পর্কের সম্ভাব্য ধরন নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেন। গ্রাম পরিষদ গঠনের এ যাবত গৃহীত প্রয়াসসমূহের টেকসই না হওয়ার একটি কারণ হিসেবে তিনি ইউনিয়ন কাউন্সিলের কায়েমি স্বার্থকে দায়ী করেছেন। পর্যবেক্ষণটি অনেকাংশে সত্য হলেও এটাই সম্পূর্ণ সত্য কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। সঠিক পরিমিতি ও কাঠামোর উপর সম্পর্ক গড়ে না উঠলে কোন ব্যবস্থাই টেকসই হবে না। তাই গ্রাম পরিষদের টেকসই না হওয়ার বিষয়টি সম্ভবত আরো গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে[১০]।

পরিচ্ছেদ ৬. আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ

পুঁজিবাদী উন্নয়নের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর বিভিন্নমুখী অসম বিকাশ। ধ্রুপদী পুঁজিবাদী দেশগুলির জন্য যেমন এটি সত্য ছিল, তেমনি বর্তমানে পুঁজিবাদে অগ্রসর হওয়া দেশগুলির জন্যও তা সমানভাবে সত্য। শ্রেণী বৈষম্যের কথা বাদ দিলে অঞ্চলসমূহের অসম বিকাশ তাই বর্তমানে পুঁজিবাদী দেশগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলার অপেক্ষা রাখে না, যে সমস্ত দেশ আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখতে চায় তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে এই ধারার বিপরীতে অগ্রসর হতে হয়। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশ কোন সময়েই আঞ্চলিক বৈষম্যকে গুরুত্ব দেয়নি। তাই একদিকে যেমন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়নের তারতম্য বেড়ে চলছে, অন্যদিকে বেড়ে চলছে শহর-গ্রামের বৈষম্য। তাই, দশ করণীয় এর মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং উন্নয়নের ঢাকা কেন্দ্রিকতার অবসানের অন্তর্ভুক্তি একটি যুগোপযোগী এবং সঠিক সিদ্ধান্ত।

আলোচনার প্রথমেই বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মাধ্যমে নজরুল ইসলাম দেখান যে, দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরও বেশি বাস করে ১৬ টি জেলায়, আর এই বৈষম্যের একটি প্রধান কারণ হল শিল্পায়ন হারের আঞ্চলিক বৈষম্য। যেসব জেলায় নগরায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়নের মান, অর্থায়ন-লভ্যতা, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত, সেসব জেলায় দারিদ্র্যের হার কম। এই উন্নয়ন আবার অতিমাত্রায় ঢাকা-কেন্দ্রিক। সাধারণভাবে বলা যায়, উন্নয়নের সাথে দেশের সামগ্রিক নগরায়ন বৃদ্ধি পায়; কিন্তু সমগ্র দেশকে দরিদ্র রেখে একটি-দু'টি শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য উন্নয়ন নয়। লেখক বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনা করে দেখান, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন কতটা ভারসাম্যহীন।

তার স্বভাবসুলভ সমস্যার গভীরে যাওয়ার প্রবণতা থেকেই লেখক অনুধাবন করেন যে, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করতে হলে এর মূল কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। সাধারণভাবে, এই বৈষম্যের একটি কারণ যেমন হতে পারে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের লভ্যতার তারতম্য, যাকে বলা যায় বাস্তব ও অবস্থানগত কারণ। আরেকটি কারণ হতে পারে কোনো অঞ্চলের প্রতি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব বা বিরূপতা।

বৈষম্য হ্রাসের জন্য লেখক দুদিক থেকেই অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী। যেমন, বাস্তব ও অবস্থানগত পার্থক্য হ্রাস করার জন্য সমুদ্র বন্দরের সাথে দেশের সব অঞ্চলের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা, সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রাপ্তির ঘাটতি দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া, ভৌত কাঠামোগত আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা, ইত্যাদি বিষয়কে তিনি সামনে নিয়ে আসেন। লক্ষণীয় যে, লেখক এখানে যান্ত্রিকভাবে সব অঞ্চলের জন্য সব কিছু সমান করে দেওয়ার মত অলীক কোন প্রস্তাব করেন না, বরং অর্থনীতির অতি প্রাচীন 'আপেক্ষিক সুবিধা' (*কম্প্যারিটিভ অ্যাডভান্টেজ*) তত্ত্বের আলোকে সমাধানের পথ খোঁজেন। অন্যদিকে, নীতির ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস করার জন্য সরকারি বাজেট বরাদ্দের অসমতা হ্রাস, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, উন্নয়নের ঢাকা-কেন্দ্রিকতার হ্রাস, ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর তিনি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে ঢাকা-কেন্দ্রিকতা হ্রাসের জন্য তার আলোচনা খুবই বিশ্লেষণধর্মী এবং সময়োপযোগী। তিনি এজন্য শ্রীলঙ্কা

এবং চীনের দুটি উন্নয়ন মডেলের উদাহরণ দেন, যার মূল বিষয় হল গ্রামের মানুষকে স্বস্থানে রেখেই শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের সুফল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। বিগত সময়কালে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে এ ধরনের উন্নয়ন এখন আর অবাস্তব মনে হয় না। এই মডেল বাস্তবায়নের জন্য লেখক কিছু প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন, এবং এজন্য প্রশাসন সংস্কার এবং অর্থায়ন সংস্কার কমিশন নামে দুটি কমিশন গঠন করার প্রস্তাব দেন। এক কথায় বলতে গেলে, দেশের শিল্পায়ন নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা যে সম্ভব নয় সেদিকে নজরুলের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট।

পরিচ্ছেদ ৭. সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি

লেখক পরিচ্ছেদটি শুরু করেন একটি হতাশা ব্যক্ত করে। তা হল, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির যে সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীতে সেই সম্ভাবনাটি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে বা হওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। ফলে সমাজে উল্লম্বিক এবং অনুভূমিক দুদিক থেকেই ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং সমাজকল্যাণমূলক সরকারের যে কোন কর্মকান্ডে ধনী-গরিবের যে ব্যবধান তাই হল উল্লম্বিক ফাটলের প্রধান কারণ। অন্যদিকে নানামুখী ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, পাহাড়ি-বাঙালি দ্বন্দ্ব, সমতলে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর প্রতি অবিচার, ইত্যাদি হল অনুভূমিক সংহতি বিনাশের কয়েকটি প্রধান দিক[১১]। এরপর লেখক একে একে শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা, ধর্মীয় সম্প্রীতি, নৃতাত্ত্বিক সম্প্রীতি, ইত্যাদি বিষয়ে যে নিবিড় বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসব সামাজিক ফাটলের উৎস সন্ধান এবং নিরাময়ের উপায় উপস্থাপন করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

যেমন, লেখক প্রথমে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখান যে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বৃহদাংশ সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত (প্রাথমিক এবং উচ্চ শিক্ষার স্তরে সরাসরি এবং মাধ্যমিক স্তরে এমপিও ভুক্তির মাধ্যমে)। তারপর তিনি তুলে ধরেন অল্প সংখ্যক ব্যয়বহুল কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের সাথে সরকারি

প্রতিষ্ঠানগুলি মানের যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান তার প্রধান কারণগুলি। শিক্ষক স্বল্পতা, সুযোগ-স্বল্পতা, সিলেবাসের মানের আকাশ-পাতাল তারতম্য, ইত্যাদির মাধ্যমে যে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি চৌকস এলিট এবং একটি নিম্নমানের শিক্ষিত, এই দুই শ্রেণীর নাগরিক তৈরি হচ্ছে, এ বিষয়টি তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। এরপর আসে মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়টি। সেখানেও বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী পাঁচ-সাতটি ধারায় বিভক্ত হয়ে আধুনিক শিক্ষার বাইরে থেকে বা নামমাত্র আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়া পেয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে।

এভাবে একই দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি ভিন্ন মানের এবং ভিন্ন ধারার সহাবস্থান শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি, বেকারত্ব এবং বিশেষজ্ঞ-ঘাটতির অদ্ভুত সহাবস্থানসহ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভক্তিতে কী গভীর ভূমিকা রাখছে তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন লেখক। বাংলাদেশে এই বিভক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে বিভিন্ন উন্নত দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত একীভূত এবং মূলত গণখাতের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার সুফলসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার একীভূত করার একটি প্রস্তাব পেশ করেন।

চিকিৎসার ক্ষেত্রেও নজরুলের পর্যবেক্ষণ অনেকটা শিক্ষার মতই। সেই খন্ডিতকরণ! সেই আধুনিক এবং সনাতনী (*ট্র্যাডিশনাল*)-এর মিশ্রণ! সেই গ্রাম-শহরের পার্থক্য! সেই অব্যবস্থাপনা! শিক্ষার মত চিকিৎসার ক্ষেত্রেও গড়ে উঠেছে দু'টি আলাদা জগত। এক জগতে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা পাচ্ছে টাকার বিনিময়ে উন্নত চিকিৎসা। আরেক জগতে নামকাওয়াস্তা চিকিৎসার নামে বৃহৎ এক জনগোষ্ঠী নিজেকে সমর্পণ করেছে এবং করে চলেছে নেহায়েতই ভাগ্যের কাছে। অর্থনীতির ভাষা অনুসরণ করে নজরুল এই অবস্থাটির নাম দিয়েছেন 'পৃথকীকৃত ভারসাম্য' (*সেপারেটিং ইক্যুলিব্রিয়া*); অর্থাৎ দুটি চরম বিপরীত মান ও বৈশিষ্টপূর্ণ ব্যবস্থা কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে যুগযুগ ধরে সহাবস্থান করে চলেছে।

এই ব্যবস্থার বিপরীতে তিনি গড়ে তুলতে চান 'সর্বজনীন ভারসাম্য'সম্পন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থা। এজন্য তিনি অগ্রাধিকার দেন গণখাতের চিকিৎসা সেবার শক্তিশালীকরণকে, যার ভিত্তি হবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলি। তার

সাথে অবশ্যই যুক্ত হবে ব্যক্তিখাতের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি, তবে অবশ্যই সেগুলিকে হতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত এবং মানসম্পন্ন এবং জনগণের ব্যয় সক্ষমতার মধ্যে।

উল্লম্বিক বৈষম্যের আর যে একটি দিক প্রায়শই অনালোচিত থাকে তা হল সামাজিক নিরাপত্তা। বৃদ্ধ বয়সে বা বিভিন্ন আপৎকালে ধনী এবং গরীব সমান নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয় না। তাই নজরুল ইসলাম একটি একীভুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির একটি উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেন।

এ প্রসঙ্গে কথা বলতে যেয়ে নজরুল যখন বলেন, আমাদের শুরু করতে হবে একেবারে শূন্য থেকে, তখন মনে হয় তিনি সমস্যাটির একেবারে গভীরে প্রবেশ করেছেন। সরকারি চাকুরিজীবীদের অবসরকালীন অপর্যাপ্ত পেনশন এবং কিছু কিছু বেসরকারি চাকুরীতে অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির (*মাইক্রোস্কপিক*) কিছু সুবিধাদি ছাড়া দেশের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য বৃদ্ধ বয়সে অথবা আপৎকালীন সময়ে টিকে থাকার জন্য কোন অবলম্বনই নেই। বিধবাভাতা কিংবা বয়স্কভাতার মত কিছু ব্যবস্থা চালু হলেও তা সিন্ধুতে বিন্দুর মত। তবে আরম্ভটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। নজরুল এতদসম্বন্ধীয় চ্যালেঞ্জগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরলেও এর থেকে উত্তরণের সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব রাখেননি। তবে একটি দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য হিসাবে এ নিয়ে ভাবার কথা তিনি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেন।

অনুভূমিক বৈষম্য বিষয়ে আলোকপাত করতে যেয়ে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন মূলতঃ ধর্মীয় এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির পুনরুদ্ধারের মত বিষয়গুলির প্রতি। ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রশ্নে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শত্রু সম্পত্তি আইন, সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্র ধর্মের সংযোজন এবং নৃতাত্ত্বিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্রগ্রাম সমস্যা বা সমতলে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর প্রতি স্থানীয়ভাবে সংঘটিত অন্যায়সমূহ নিয়ে লেখক আলোচনা করেন। এসম্বন্ধীয় আলোচনার একটা বড় অংশ তিনি ব্যয় করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতময় অবস্থার উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারণসমূহ বিশ্লেষণে এবং ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের প্রধান বাধাগুলি শনাক্তকরণে। পাহাড়ি এবং সমতলী, উভয় ক্ষেত্রেই ভূমি

মালিকানা এবং ভূমি ব্যবহারের ন্যায্যতার মধ্যেই সম্প্রীতির বীজ নিহিত রয়েছে -- এই হল লেখকের উপসংহার। এছাড়া বৃহত্তম নৃগোষ্ঠী হিসাবে বাঙালি জনগণের আরো সহিষ্ণু ও মানবিক আচরণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসাবে দেখেন লেখক।

পরিচ্ছেদ ৮. নারী, শিশু, যুব, এবং বয়স্কদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান

জনমিতির দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুল ইসলামের এই বিভক্তিটি কিছুটা ব্যাখ্যার দাবী রাখে। শিশু, যুব, এবং বয়স্ক, এই তিনটি জনমিতিক বিভাগই লিঙ্গনিরপেক্ষ। অর্থাৎ, নারী পুরুষ উভয় লিঙ্গই এই বিভাগগুলির অন্তর্গত। একদিকে, নারীদের মধ্যে শিশু, যুবক, এবং বয়স্ক রয়েছে, আবার শিশু, যুবক, এবং বয়স্কদের অর্ধেকই হল নারী। অর্থাৎ, নারীর– তা সে যে ক্যাটাগরিতেই থাকুক– প্রতি রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে। আবার লিঙ্গ নির্বিশেষে শিশু, যুবক, এবং বয়স্কদের প্রতিও সমাজের রয়েছে বিশেষ দায়িত্ব। এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে নজরুল বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছেন।

ঐতিহাসিকভাবেই আমাদের দেশে পরিবার পর্যায়ে নারী ও শিশুরা তুলনামূলকভাবে অবহেলিত থাকে। তাই, পুষ্টি এবং শিক্ষায় পিছিয়ে থেকেই নারীর জীবন শুরু হয়। বাল্যবিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বৈষম্য, মজুরি বৈষম্য, শিশুপালন-কর্মজীবন দ্বন্দ্ব, ঘরে ও বাইরে নির্যাতন, পাচার, ইত্যাদি নানাবিধ সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রতিকূলতাকে দূর করে নারীর মানুষ ও নাগরিক হিসেবে মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং তাকে সমাজ এবং অর্থনীতির মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত করার নানামুখী সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছেন লেখক। এ প্রসঙ্গে লেখক হতাশার সাথে লক্ষ্য করেন যে, নানাবিধ ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন শক্তি নারী প্রগতির বিরুদ্ধে যতটা সোচ্চার ও সক্রিয় তার তুলনায় পক্ষের শক্তি ততটাই নিরব ও নিষ্ক্রিয়। তাই লেখকের অভিমত যে, নারী প্রগতির পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে আগামী বাংলাদেশের অন্যতম একটি করণীয়।

শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগের ক্ষেত্রে নজরুল প্রথমেই স্থান দিয়েছেন সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের বিষয়টিকে, কারণ অপুষ্টি ও শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য হলেও তা এখনো অভিষ্ট লক্ষ্যের চেয়ে অনেক পেছনে। অপুষ্টির একটি বড় কারণ অবশ্যই দারিদ্র, তবে কেবলমাত্র দারিদ্র দূরীকরণ করেই অপুষ্টি সমস্যা সমাধানের চিন্তাটি খুবই অবাস্তব এবং কালক্ষেপনের নামান্তর। তাই নজরুলের প্রস্তাব, সরাসরি শিশুকে টার্গেট করে পুষ্টি ও চিকিৎসা কর্মসূচি গ্রহণ করা। এরপর আসে শিশু-শিক্ষার কথা। শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য নানাবিধ কর্মসূচি সমৃদ্ধ একটি শিশু-শিক্ষা কার্যক্রম (সর্বজনীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ) গ্রহণ কেন দরকার সে বিষয়ে নজরুলের বিস্তারিত আলোচনা বেশ চিত্তাকর্ষক।

শিশুর পরে লেখক যুবসমাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। শিশু যদি হয় দেশের ভবিষ্যৎ তবে যুব সমাজ হল সেই ভবিষ্যতে যাওয়ার জন্য আজকের শক্তির উৎস। দেশের কর্মক্ষম মানুষের একটা বড় অংশ হল যুব সমাজ। তারাই অচিরে নেতৃত্ব দিবে দেশের বস্তুগত উন্নতি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার পথনির্দেশনায়। তাই যুবসমাজের সার্বিক বিকাশই নির্ধারণ করে দেবে আগামী বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। এ প্রসঙ্গে নজরুল বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন *ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড* বা 'জনমিতিক সুপ্রাপ্তি'র বিষয়টি নিয়ে[১২]। এটি হল জনমিতির এমন একটি অবস্থা যখন জন্মহার ও মৃত্যুহারের ঘাত-প্রতিঘাতে দেশে উপার্জনক্ষম জনসংখ্যা নির্ভরশীল (শিশু ও বৃদ্ধ) জনসংখ্যার চেয়ে বেশি থাকে। এই উপার্জনশীল জনসংখ্যার গড় বয়স যত কম থাকে, অর্থাৎ জনসংখ্যার মধ্যে যত বেশি যুবা বয়সী মানুষ থাকে, ততই দীর্ঘদিনের জন্য এই সুবিধাটি বলবৎ থাকে। নজরুল ইসলাম পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুব সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন যে, গত শতাব্দীর মধ্য-আশিতে বাংলাদেশ এই *ডিভিডেন্ডের* যুগে প্রবেশ করেছে এবং আর মাত্র এক দশক এই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারবে। পৃথিবীর অনেক দেশই এই সুফল ভালভাবে ব্যবহার করার জন্য আগে থেকে আটঘাট বেঁধে অগ্রসর হয়, এবং সে উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণসহ নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু, নজরুলের পর্যবেক্ষণ মতে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য (*পারফরম্যান্স*) খুবই হতাশাজনক। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য

নজরুল যুবশক্তিকে উচ্চস্তরের অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে সরকারের অধিকতর অংশগ্রহণসহ বেশ কিছু করনীয় চিহ্নিত করেছেন।

স্বভাবতই, বর্তমান আলোচনাটি শেষ হতে পারে সারা জীবন সমাজকে দিয়ে এসে আজ যারা নানাভাবে সমাজের মুখাপেক্ষী তাদের জন্য করণীয় নির্ধারণের মধ্য দিয়ে। নজরুল এই কাজটিও করেছেন যথেষ্ট মমত্ব দিয়ে। এটিকে তিনি কোন প্রকার অনুকম্পা কিংবা বদান্যতা হিসেবে দেখেন না, বরং এ হল প্রজন্মের কাছে প্রজন্মের ঋণ শোধ, এবং একটি নিরেট সামাজিক বাঁধুনীর অবিচ্ছেদ্য উপদান। অবসর গ্রহণের বয়স, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদন, আর্থিক নিরাপত্তা, ইত্যাদি নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে লেখক এই প্রসঙ্গটি সমাপ্ত করেন।

পরিচ্ছেদ ৯. সর্বজনীন সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন

বিগত আটটি পরিচ্ছেদে যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলা হল, এবং দশম পরিচ্ছেদে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হবে, সেগুলির প্রাসঙ্গিকতা কিংবা প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমার মনে যেমন কোন দ্বিধা ছিল না, তেমনি মনে হয় পাঠকের মনেও তেমন কোন দ্বিধা থাকবে না। তবে প্রস্তাবিত নবম করণীয়টি সম্বন্ধে মনে হয় এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কারণ, পূর্বে উল্লেখিত করণীয়গুলি ছিল বাংলাদেশের দুর্বলতা, অনাচার, ভ্রান্তি, স্বার্থান্ধতা, ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে লেখকের প্রস্তাব। সমস্যার সবগুলিই আমাদের কাছে কমবেশি পরিচিত। লেখক নানাবিধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যাগুলির ধরন, গভীরতা, সমাধানের প্রয়োজনীয়তা, এবং সুফল, ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নবম করণীয়টি একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থাকলেও বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ একটি প্রায় অপরিচিত ধারণা। আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের আশু সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষেত্রে এর কোন প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতা অনুমান করাও একটু কষ্টকর। তাই একটু সন্দেহের দোলাচলের মধ্যেই পরিচ্ছেদটি পাঠ করলাম। পাঠান্তে মনে হল, নানাভাবে বিভক্ত এই সমাজটিকে দেশপ্রেমের একক একটি মনো-

সামাজিক (socio-psychological) পাটাতনে দাঁড় করানোর জন্য এ ধরনের একটি সর্বজনীন উদ্যোগ খুবই প্রাসঙ্গিক। বহিরাবরণে সামরিক হলেও এরূপ ট্রেনিংয়ের বহিঃপ্রভাব হতে পারে সুদূরপ্রসারী, যার আভাস লেখক কিছুটা দিয়েছেন।

তাঁর ভাষাতেই বলি, 'সর্বজনীন সামরিক শিক্ষা বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে সততা ও শৃঙ্খলাবোধের বিস্তৃতি ঘটাবে; নিজেকে অন্তর থেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ভাবতে প্রস্তুত করবে; মুক্তিযুদ্ধের স্পৃহাকে জাগরুক রাখবে; এবং দেশের জন্য আত্মত্যাগের মনোভাব দৃঢ় করবে। ধনী-দরিদ্র, সমাজের সকল স্তর ও অংশ থেকে আগত যুবকদের একই ছাউনিতে থেকে সমতার ভিত্তিতে একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পাবে। সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ সমাজের মহা-সমতাসাধনকারী (*গ্রেট ইকুয়ালাইজার বা গ্রেট লেভেলার*) কর্মসূচি হিসেবে আবির্ভূত হবে'।

বিশ্বে বর্তমানে ৮৫টি দেশে সর্বজনীন সামরিক শিক্ষা চালু আছে। একেক দেশ তা একেকভাবে বাস্তবায়ন করছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে লেখক বাংলাদেশের জন্য সম্ভাব্য কিছু বিষয়, যেমন প্রশিক্ষণের শুরু ও শেষ করার বয়স, প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল, নারীদের জন্য প্রযোজ্যতা, অব্যাহতি লাভের সুযোগ, পুনঃপ্রশিক্ষণের বিধান, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের *রিজার্ভিষ্ট* হিসাবে থাকার আবশ্যকীয়তা, সর্বজনীণ প্রশিক্ষণের সাথে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির সম্পর্কসহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন, যা সামরিক শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। লেখকের আশা, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের প্রবর্তন সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং স্থায়ীরূপ দেবে।

পরিচ্ছেদ ১০. জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ

বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে করণীয় বিষয়টিকে একেবারে শেষে অর্থাৎ দশম পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, পরিচ্ছেদের নামটি, 'জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ'ও একইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান পৃথিবীতে ধনী-গরীব,পরাশক্তি-আঞ্চলিক শক্তি, বা এমন কি দুর্বল ও স্থানীয়ভাবে গুরুত্বহীন রাষ্ট্রের পক্ষেও নিজের অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলকে গুরুত্বের সাথে নেয়া এবং তার সাথে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারে সচেষ্ট থাকার কোন বিকল্প নেই। বিভিন্ন কারণে যে সমস্ত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে তাদের তো কথাই নেই। এই পরিচ্ছেদের আলোচনায় আমরা দেখতে পাবো, অভ্যন্তরীণ অনেকগুলি করণীয় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এমন কিছু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যার সমাধানের জন্য বৈদেশিক নীতির ব্যবহার অনিবার্য। আবার, এই করণীয়সমূহের বাইরেও বাংলাদেশের এমন একটি ভূরাজনৈতিক কৌশলগত অবস্থান রয়েছে যার জন্য নিজে না চাইলেও তাকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

যেমনটি বলা হয়েছে, পরিচ্ছেদের শিরোনামটিও বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। লেখক বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিকে সরাসরি সংযুক্ত করেছেন দেশের সম্পদ সুরক্ষার ঢাল হিসাবে। অর্থাৎ, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক, আর্থসামাজিক, কিংবা অবস্থানিক, যে সম্পদই থাকুক না কেন সেগুলি এতটাই অরক্ষিত যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পক্ষকে সামাল না দিয়ে সেগুলির ফসল তুলে আনা প্রায় অসম্ভব। উদাহরণ হিসাবে নজরুল অনেকগুলি অতীত অভিজ্ঞতাকে সামনে আনেন। যেমন, বাংলাদেশে গ্যাস প্রাপ্তির একটি সম্ভাবনা দেখা যাওয়ার প্রায় সাথে সাথেই বিদেশি কোম্পানিগুলির তৎপরতা শুরু হয়; তাদের নৈতিক-অনৈতিক স্বার্থ আদায়ের জন্য স্ব-স্ব রাষ্ট্রের দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। এরপর স্বল্প পরিসরে কিছু কয়লা খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পরও একইভাবে আন্তর্জাতিক চাপের সম্মুখীন হতে হয়। এসব চাপ মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন সময়ে যে

কূটনৈতিক তৎপরতা গ্রহণ করা হয় তার কিছু কিছু লেখক বেশ চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করেন।

নদনদী ও পানি সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত-নির্ভরশীলতা আমাদের আরেকটি দুর্বল স্থান। এক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সঠিক ও শক্তিশালী বিদেশ নীতি কিভাবে পরিস্থিতিকে আমাদের অনুকূলে আনতে পারে তার কিছু ধারণা পাই লেখকের বর্ণনায়। আমাদের জনসম্পদ ব্যবহারেও বিদেশ নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন লেখক। প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্স আমাদের দ্বিতীয় বৃহৎ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের খাত। শ্রমিক পাঠানো এবং গ্রহণ, দুটিই সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের সাথে জড়িত। অনেক সময় এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মিশনসমূহের কূটনৈতিক আনাড়িপনার খবর শুনতে পাওয়া যায়।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একাধারে শক্তির এবং আতঙ্কের জায়গাটি হল আমাদের ভৌগলিক অবস্থান। দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গমস্থলে অবস্থান এবং একটি দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল একদিকে যেমন বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র (হাব) হিসেবে গড়ে ওঠার এক অপার সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে তেমনি বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক পরাশক্তিসমূহের প্রতিযোগিতার দাবার ঘুটিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি করেছে। বৈদেশিক নীতিতে ভুল পদক্ষেপের কারণে অনেক সম্ভাবনাময় দেশের বিপর্যয় ইতিহাসে বিরল নয়। এই অঞ্চলে বিশ্বরাজনীতির বর্তমান প্রধান প্রধান খেলোয়াড়দের যে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত তৎপরতা চলছে তার বিশ্লেষণ করে নজরুল দেখিয়েছেন, একটি সমন্বিত বিদেশ নীতি আমাদের জন্য কত জরুরী এবং একটি ভুল পদক্ষেপ আমাদের জন্য কতটা বিপদের কারণ হতে পারে।

উপর্যুক্ত বিশদ আলোচনার পর লেখক বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির জন্য চারটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের সুপারিশ করেন। প্রথমত, দেশের উন্নয়নের প্রতি অগ্রাধিকার; দ্বিতীয়ত, নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি; তৃতীয়ত, নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা; চতুর্থত, জনগণকে আস্থায় নিয়ে বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। চারটি প্রস্তাবই স্ব-ব্যাখ্যাত। কার্যত যে নীতিই গ্রহণ করুক না কেন, পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ বাহ্যিক

ভাবে এ ধরনের একটি বৈদেশিক নীতিই ঘোষণা করে থাকে। এমনকি তৎকালীন পাকিস্তান 'সিয়াটো' এবং 'সেন্টো' নামক দুটি অতিমাত্রায় পশ্চিম ঘেঁষা জোটের সদস্য হয়েও জোরেশোরে 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়' নীতির প্রচার করত। শীতল যুদ্ধের অবসানের পর অধিকাংশ রাষ্ট্রই আপনা-আপনিই এ ধরনের পররাষ্ট্রনীতির অধিকারী হয়ে ওঠে।

তবে বিশ্ব রাজনীতিতে পরাশক্তিদের নতুন মেরুকরণের ফলে এই নিরপেক্ষ নীতি ধরে রাখা অনেকের পক্ষে কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। যেমন, ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার তেল কিনে ভারত এখন বিপদে আছে। ইরাক আক্রমনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সেই ধমকের উচ্চারণ – "যারা আমাদের সাথে নেই তারা আমাদের শত্রুর সাথে আছে" – অনেকেরই হয়তো মনে আছে।

সে যাইহোক, বাস্তবে একটি নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কার্যকর করা অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি কেন বিশেষ করে কঠিন তা নজরুল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। যে শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে এরকম একটি নীতি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা সম্ভব তা হল জনগণের উপর সরকারের এবং সরকারের উপর জনগণের পরিপূর্ণ আস্থা। এই আস্থার বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই লেখক আলোচনাটি সমাপ্ত করেন।

সামগ্রিক উপসংহার

নজরুল ইসলাম যখন বইয়ের সামগ্রিক উপসংহারটি লেখেন তখন, তাঁর ভাষায়, "আগের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অবসান ঘটেছে এবং নতুন বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলমান আছে"। তাঁর আশা, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টায় নতুন বন্দোবস্তটি আগের চেয়ে উন্নততর, এবং স্থিতিশীল হবে[২৪]। সেই বন্দোবস্ত যেরকমই হোক না কেন, তাকে অবশ্যই দেশের আর্থসামাজিক করণীয়র দিকে মনোযোগ দিতে হবে; এবং আশা করা যায় নজরুল প্রস্তাবিত দশ করণীয় কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা পাবে।

তাই তিনি সামগ্রিক উপসংহারে এই দশ করণীয়র মধ্যে পারস্পরিক এবং সময়ানুক্রমিক সম্পর্ক নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেন। আলোচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে তিনি দশ করণীয়র অন্যতম করণীয়,

'আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা'র প্রবর্তনকে অন্যান্য করণীয়গুলির পূর্বশর্ত হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। কারণ, তাঁর মতে, আনুপাতিক নির্বাচন ছাড়া অন্য কোন প্যাকেজ গৃহীত হলে স্বৈরশাসনের পুনরুদ্ভব ঠেকিয়ে রাখা কঠিন হবে; এবং ফলে দশ করণীয়র বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে।

বিশুদ্ধ যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুলের এই সরল রৈখিক অবস্থানটি হয়তোবা সঠিক। তবে কথাটির ভুল ব্যাখ্যা হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। অনেকেই মনে করতে পারেন, যেহেতু আনুপাতিক নির্বাচন ছাড়া যেকোনো সংস্কার কর্মসূচি শেষ পর্যন্ত কোন চোরাগলিতে গিয়ে ঠেকবে, তাই দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছি গৃহীত সংস্কার কর্মসূচিগুলির মধ্যে আনুপাতিক নির্বাচন সেই অর্থে নেই। অর্থাৎ, আছে কিন্তু যেখানে থাকা দরকার ছিল (সংসদের নিম্ন কক্ষে), সেখানে নেই; বরং, অপ্রয়োজনীয় ভাবে একটি উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করে অনেকটা গোঁজামিল দিয়ে আনুপাতিক নির্বাচনকে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে।

নজরুল এই দৃশ্যপটটি একেবারে উড়িয়ে দেননি। তাই সংলাপের ফলাফল 'বাঞ্ছনীয় দৃশ্যপট' (আনুপাতিক নির্বাচনসহ)-এর পরিবর্তে 'সমস্যাসংকুল দৃশ্যপট' (আনুপাতিক নির্বাচনবিহীন)-এর সৃষ্টি করলে দেশের জনদরদি শক্তি সমূহকে দশ করণীয়র জন্য রাজনৈতিক পূর্বশর্ত পূরণের কাজে অবতীর্ণ হতে হবে। তারা যত বেশী এসব করণীয়র যৌক্তিকতা জনগণের কাছে তুলে ধরতে পারবেন, তত বেশী জনগণ তাদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবেন। নজরুল আশাবাদী, "অবশেষে দশ করনীয় বাস্তবায়িত হবে"। এ প্রসঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন সামনে চলে আসে। একটি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুস্থাবস্থা কি এতটাই আনুপাতিক নির্বাচন-নির্ভর? পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস কী বলে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আরো কয়েকটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে[১৫]।

অন্ত্যটীকা

[১] চিত্র ১.১ এর সাথে সারণী ১.১ এর পরিসংখ্যানের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার একটি ব্যাখ্যা লেখক প্রথম পরিচ্ছেদের ৩ নং অন্ত্যটীকায় দিয়েছেন।

[২] এ প্রসঙ্গে তিনি রেহমান সোবহান, ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, প্রমুখ অর্থনীতিবিদের কিছু প্রস্তাবকেও আলোচনায় আনেন।

[৩] বলাবাহুল্য, লেখকের এই অভিমতের সাথে পাঠক একমত হবেন কিনা তা আমাদের বর্তমান চরম বিভাজিত সমাজে অনেকটাই নির্ভর করে পাঠকের নিজস্ব সামাজিক অবস্থান ও চিন্তার প্রসারতার উপর।

[৪] এ প্রসঙ্গে নজরুল ইসলামের ১৯৯৯, ২০০০, ২০১২, ২০১৬ সালের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

[৫] নজরুলের এই দাবিটি চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। আনুপাতিক নির্বাচনের অনেক দেশে দুই সাধারণ নির্বাচনের মাঝখানে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন ঘটে। এটিকে তো বড় ধরনের অস্থিতিশীলতা বলা যায়। বিশেষ করে যখন হর্স-ট্রেডিং এর সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন আমাদের মত নিম্ন-নৈতিকতার সমাজে কি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে তা নিঃসন্দেহে একটি চিন্তার বিষয়।

[৬] বাংলাদেশে আনুপাতিক নির্বাচনের সম্ভাবনা নিয়ে বর্তমান লেখকের নিজস্ব কিছু ধারণা নিম্নরূপ: সংলাপের ফলাফলে মনে হচ্ছে, আনুপাতিক নির্বাচন গৃহীত হলেও তা শুধু উচ্চকক্ষের জন্য কার্যকর হবে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েই বলা যায় যে, যে মৌলিক সমস্যা নিরসনের জন্য আনুপাতিক নির্বাচন জরুরী (সংসদে সরকারি দলের একচ্ছত্র আধিপত্য রোধ) তার সমাধান এই পদক্ষপ (শুধু উচ্চকক্ষের জন্য আনুপাতিক নির্বাচন প্রবর্তন)'র মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বরং, অযথা একটি উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করে শ্বেতহস্তি পালনের ব্যবস্থা করা হবে। একটি বিকল্প প্রস্তাব হতে পারে এরকম: সংসদ হবে এক কক্ষ বিশিষ্ট, তবে তার আসন সংখ্যা ৪০০তে বৃদ্ধি করা হবে। এর মধ্যে ২৫০টি হবে নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক (এলাকা পুনঃনির্ধারণ করে বর্তমান ৩০০ আসনকে ২৫০টিতে পরিণত করা হবে), বাকি ১৫০টি আসন বণ্টিত হবে প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে। এই ব্যবস্থায় একদিকে নির্বাচনী এলাকার জনগণ তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পাবেন (যে যুক্তিতে অনেকে আনুপাতিক নির্বাচনের বিরোধিতা করেছেন); অন্যদিকে, আনুপাতিক হারে বাকী ১৫০টি আসনের নির্বাচন সংসদে কোনো দলের একক আধিপত্য গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে অনেকখানি হ্রাস করবে। এই প্রস্তাবটিতে অনেক খুঁত থাকতে পারে, তবে আলাপ-আলোচনায় হয়তো তার অনেকখানিই কেটে যাবে। বর্তমানে যে সমস্ত প্রস্তাব আলোচনার মধ্যে আছে তার সাথে না হয় আরেকটি যুক্ত হল!

[৭] উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর উদ্যোগে গঠিত বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (BEN)

এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এদেশের পরিবেশ আন্দোলনে অন্যতম পরিচিত দুইটি নাম।

[৮] এরকম একটি দাবি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সবসময়ই ছিল, যদিও বিগত সরকার তা গ্রহণ করেনি।

[৯] এখানে যোগ করা যেতে পারে যে, 'বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নিয়ে নজরুল ইসলাম ইতিপূর্বে দুটি পুস্তকও প্রকাশ করেছেন।

[১০] এই পরিচ্ছেদের শুরুতেই প্রাচীন বাংলার উৎপাদনভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাকে আর একটু সামনে টেনে নিয়ে গেলে দেখা যাবে, উৎপাদন অংশটি বাদ দিয়ে তার সামাজিক অংশটির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বাংলাদেশের গ্রাম এখনো বয়ে চলেছে। গ্রামের প্রতিটি গোষ্ঠী (বংশ) থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি মজলিস থাকে যার একজন মুরুব্বিও থাকেন। সামাজিক বিচার-আচার বিয়ে, মৃত্যু, দুর্ঘটনা (বন্যা সহ), ইত্যাদির প্রেক্ষিতে তারা যৌথভাবে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনের আগের রাতে চুপি-চুপি এসে মুরুব্বির কাছে এসে অনেকে জেনে যান এবার কাকে ভোট দিবেন। অনেক সময় এই মুরুব্বিরাই ওয়ার্ড মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হন, কিন্তু ওয়ার্ড আর সমাজ এক হয়ে যায়নি। সুতরাং, গ্রাম পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের পরস্পর প্রতিযোগী অথবা পরিপূরক হওয়ার চাবিকাঠি এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির মধ্যেই লুক্কায়িত আছে। নজরুল নিজেও দেখিয়েছেন (অন্ত্যটীকা ৮) যে, বঙ্গবন্ধু সরকার থেকে খালেদা জিয়া সরকার পর্যন্ত গ্রাম পরিষদ/সরকার বিষয়ে যে চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার কোনটিতেই এই দুই প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনার বাইরে থেকে গিয়েছে।

[১১] এখানে অনুভূমিক এবং উল্লম্বিক শব্দদ্বয়ের ব্যবহারে অসাবধানতাপ্রসুত স্থানান্তর পরিলক্ষিত হয়।

[১২] নজরুল বিষয়টির নাম দিয়েছেন 'জনমিতি লভ্যাংশ'। তবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ডিভিডেন্ড যে অর্থে লভ্যাংশ (লাভের অংশ বিতরণ) ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড সেই অর্থে লভ্যাংশ নয়, বরং জনমিতির বিশেষ স্তরে একটি সুযোগ। সেজন্য এখানে আমি 'সুপ্রাপ্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছি, তবে পাঠ্যবইতে কী শব্দ ব্যবহার করা হয় তা আমার জানা নেই।

[১৩] 'পানির বিনিময়ে ট্রানজিট' ধারণাটি এক সময় মানুষের মুখে মুখে ফিরলেও আমাদের সরকার এ পথ মাড়াতে সাহস পায়নি। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নজরুল বিষয়টিকে আবার সামনে এনেছেন। তাছাড়া, সম্প্রতি উজানে চীন কর্তৃক ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে তার কাছে পাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছে তাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের আমাদের বিদেশ নীতিকে শাণিত করার প্রস্তাবটিও নৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী।

[১৪] বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আশাবাদ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে; এখন অনেকেরই আশঙ্কা পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে না যায়!

[১৫] দশ করণীয়র সংগ্রামকে চূড়ান্তভাবে আনুপাতিক নির্বাচন-নির্ভর কল্পনা করলে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। যেমন, (ক) আজকের উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলি কি প্রথম থেকেই আনুপাতিক নির্বাচনের চর্চা করেছিল? এর উত্তর অবশ্যম্ভাবীভাবে 'না'। (খ) বর্তমানে উন্নত দেশগুলির বাইরে অন্য যারা আনুপাতিক নির্বাচনের চর্চা করে (এই তালিকাটিও বেশ লম্বা) তারা সবাই কি অভিষ্ট আর্থসামাজিক অবস্থানে পৌছাতে পেরেছে, বা পৌছানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না এবং লেখকও সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে এই আলোচনাটি করেননি। তবে অনুমান করা যায়, এর উত্তর মিশ্র হবে। (গ) আনুপাতিক নির্বাচন ছাড়া কি সুশাসন এবং আইনের শাসন একেবারেই সম্ভব নয়? (এটিকে প্রশ্ন (ক)-এর বর্ধিত রূপ বলা যেতে পারে।) বাংলাদেশের জন্য এই প্রশ্নসমূহের উত্তর খোঁজা খুবই জরুরী। আর একটি বিষয়ও এখানে প্রাসঙ্গিক। আইন দ্বারা আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকার পর বিএনপিই বাংলাদেশে এখন বৃহত্তম কার্যকরী রাজনৈতিক দল এবং ক্ষমতার এক নম্বর দাবিদার। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দলের এই অবস্থানের কারণেই তারা আনুপাতিক নির্বাচনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আর সেই একই কারণে জামাতে ইসলামী, যার সমর্থকের তুলনায় সংসদে আসন প্রাপ্তি কম, তারা পক্ষ নিয়েছে আনুপাতিক নির্বাচনের। অন্যান্য ছোট দলগুলির প্রায় সবাই আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে কথা বলছে একই কারণে। তাই প্রশ্ন ওঠে, কয়টি দল প্রকৃত সুশাসন অর্জনের জন্য আনুপাতিক

বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক নজরুল ইসলামের কিছু প্রকাশনা

ইসলাম নজরুল (১৯৮১), *জাসদের রাজনীতি – একটি নিকট বিশ্লেষন*, প্রাচ্য প্রকাশনী, ঢাকা

ইসলাম নজরুল (১৯৮৪), *বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল প্রসঙ্গ*, সমাজ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৭), *বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা: বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকট ও বিকল্প পথের প্রশ্ন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা

Islam, Nazrul (2001), "*The institutional approach to political stability in Bangladesh*," *The Journal of Social Studies*, 93 (July-September), pp. 80-100

ইসলাম, নজরুল (২০১১ক), *বাংলাদেশের গ্রাম: অতীত ও ভবিষ্যত*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০১১খ), "*বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে দুটি প্রস্তাব*," প্রতিচিন্তা, প্রথম সংখ্যা

ইসলাম, নজরুল (২০১২), *আগামী দিনের বাংলাদেশ*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

Islam, Nazrul S. (2016), *Governance for Development: Political and Administrative Reforms in Bangladesh*, Palgrave-Macmillan, New York

ইসলাম, নজরুল (২০১৭), *বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম*, ঈস্টার্ন একাডেমিক, ঢাকা

Islam, Nazrul S. (2018), *Bangladesh Delta Plan: A Review*, Eastern Academic, Dhaka

Islam, Nazrul S. (2020*), Rivers and Sustainable Development: Alternative Approaches to Rivers and Their Implications*, Oxford University Press, New York

Islam, Nazrul S. (2022a), *Water Development in Bangladesh: Past*, Present, & Future, Eastern Academic, Dhaka

Islam, Nazrul S. (2022b), *A Review of Bangladesh Delta Plan 2100*, Eastern Academic, Dhaka

Islam, Nazrul S. (2022c), *Looking at the Past to See the Future*, BIDS public lecture, Bangladesh Institute for Development Studies, Dhaka, Bangladesh

ইসলাম, নজরুল (২০২৪ক), *অনুপাতিক নির্বাচন – কী এবং কেন*, বাংলা ধরিত্রী, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০২৪খ), *রাষ্ট্রসংস্কার ও সংবিধান সংশোধন*, প্রথমা, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০২৫ক), *উন্নয়নের জন্য সুশাসন: বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও প্রসাশনিক সংস্কার*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০২৫খ), *বাংলাদেশের রাজনীতি: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, দ্যু-প্রকাশন, ঢাকা।

স্মরণ: যতীন সরকার

যতীন সরকার (১৯৩৬-২০২৫)

যতীন সরকার

এম. এম. আকাশ*

যতীন সরকার (জন্ম: ১৮ আগস্ট ১৯৩৬ - মৃত্যু: ১৩ আগস্ট ২০২৫) মৃত্যুকালে যতীন সরকরের বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। এই দীর্ঘ বর্ণাঢ্য জীবনে তাঁর কীর্তির সংখ্যা কম নয়। ২০১০ সালে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেই (৭৪) তিনি লাভ করেছিলেনব বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরুষ্কার স্বাধীনতা পুরষ্কার। এছাড়াও তাঁর অর্জনের তালিকায় রয়েছে ড. এনামুল হক স্বর্ণ পদক (১৯৬৭), বাংলা একাডেমী পুরষ্কার (২০০৭), প্রথম আলো বর্ষ সেরা গ্রন্থ পুরষ্কার (২০০৮), ব্র্যাক ব্যাংক ও সমকাল সাহিত্য পুরষ্কার (২০১৭)। তাছাড়া ২০১৩ সালে বিশ্ব শিক্ষক দিবসে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা কল্যাণ সমিতি তাঁকে 'বরেন্য শিক্ষক সম্মানানা' প্রদান করেন।

যতীন সরকার যতদিন বেঁচে ছিলেন, ক্লান্তিহীন ও ক্ষান্তিহীন ভাবে কলম ও বক্তৃতা চালিয়ে গেছেন অনির্বার। তাঁর লেখনী ছিল সরস, তীক্ষ্ম-গভীর এবং তলদেশস্পর্শী। মূলতঃ প্রবন্ধ সাহিত্যেই তিনি মনোনিবেশ করেন। এমনকি বাংলা ব্যাকরণও লিখেছেন। এছাড়া তিনি ছিলেন সুবক্তা। তার বক্তৃতা বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, কৌতুক, ও রসবোধে ভরপুর থাকতো। লোকেরা ও ছাত্ররা ক্লাসে ও পাঠচক্রে তাঁর বক্তৃতা ঘন্টার পর ঘন্টা অখন্ড মনোযোগে শুনতেন, উদ্দীপ্ত হতেন এবং জীবন পথে তা কাজে লাগাতেন। তিনি ছিলেন তাঁদের সকলের শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশাই। যতীন সরকার নিজেই নিজের পরিচয় দিতেন 'মাস্টার' হিসাবে। নিজের লেখা 'আদর্শ শিক্ষকের জন্য প্রত্যাশা' প্রবন্ধে যতীন সরকার লিখেছেন, 'আমি নিজে একজন মাস্টার। "শিক্ষক" শব্দটা অনেক ভারি, লোকে মাস্টারই বলে। জীবিকার জন্য আমি মাস্টারি করেছি। জীবিকাই হচ্ছে মানুষের জীবনের আশ্রয়। মাস্টারি করেই আমি জীবিকা নির্বাহ করেছি। তবে মাস্টারি না করে অন্য কিছুও তো করতে পারতাম। কিন্তু আমি অন্য কিছু করতে চাই নি। মাস্টারি করতে চেয়েছি এবং মাস্টারিটাকেই আমার জীবন ও জীবিকার

*অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সভাপতি, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অবলম্বন করে নিয়েছি। মাস্টারি করেই আমি পরিপূর্ণ সুখী। হ্যাঁ, "সুখী" শব্দটাই ব্যবহার করতে চাই আমি। মাস্টারি ছাড়া যদি অন্য কিছু করতাম, তাহলে আমার জীবিকার মধ্য দিয়ে জীবনের স্বস্তি ও তৃপ্তি আমি পেতে পারতাম বলে মনে করি না। আমার সৌভাগ্য যে আমি মাস্টার হতে চেয়েছিলাম মাস্টারই হতে পেরেছি।' (স্বপন পাল, গ্রন্থনা), যতীন সরকার, মহা জীবনের প্রতিকৃতি, নেত্রকোনার নাগরিক শোক সভার স্মারক প্রকাশনা ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

যতীন সরকারের জীবিকা শিক্ষকতা হলেও তিনি কোনো প্রথাগত শিক্ষক ছিলেন না। জীবনই ছিল তার শ্রেষ্ঠ পাঠশালা। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েই তিনি ছাত্রদের শেখাতেন। তিনি শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বিপ্লবী ধারণা ব্যক্ত করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়,

প্রথাগত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয় প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তথা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার দিকে লক্ষ্য রেখেই। ... প্রকৃত শিক্ষিত তো তিনিই যিনি তার বুদ্ধিকে ঘোলা জলের ডোবায় আবদ্ধ করে রাখেন না; যার শিক্ষা সমাজের প্রগতিতে অবদান রাখতে পারে; যিনি প্রগতির শত্রুদের চিনতে পারেন এবং চিনে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে নিজেও রুখে দাঁড়াতে পারেন ও অন্যকেও রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। (স্বপন পাল, প্রাগুক্ত)

যতীন সরকার তাই সব সময় প্রাতিষ্ঠানিক মাস্টারির চেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন বাইরের পড়াশুনার প্রতি; বিপ্লবী পরিবর্তনের নিয়ম জানা ও তাতে সহায়ক ভূমিকা রাখার প্রতি। স্বপন পাল উল্লেখ করেছেন যে, যতীন সরকার নিজেকে 'কষ্ট লেখক' বলে পরিচয় দিতেন। সারা জীবন তিনি মেনে চলেছেন ম্যাকলের সেই কথা, 'ছয় লাইন লিখতে হলে ছয়শ লাইন পড়তে হয়'।

যতীন সরকার ছিলেন কাজের লোক এবং কাজ করতে চেয়েছেন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির মাঝে। গ্রামীণ লোক সমাজের সংলগ্ন থেকে তাদের জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করা, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজ-সাহিত্য-রাষ্ট্র নিয়ে জীবন্ত তত্ত্ব নির্মাণ করে তার মাধ্যমে নাগরিক সমাজকে ধাক্কা মেরে দেখাতেন এবং তাদেরকে সে বিষয় স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করতেন তিনি। একজন ভাষ্যকার লিখেছেন। যতীন সরকার হচ্ছেন 'এমন একজন প্রান্তসস্থিত লেখক যিনি কেন্দ্রকে কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন'।

যতীন সরকার খুব উচ্চবিত্ত শহুরে পরিবারের থেকে আসেন নি। তাঁর জন্ম হয়েছিল নেত্রকোনা শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে কেন্দুয়া উপজেলার ভেতরে অবস্থিত এক গ্রামে। সেখানে তিনি যখন জন্ম নেন সেটা ছিল পারিবারিক ভাবে এক অতি কাঙ্ক্ষিত জন্ম। তাঁর জন্মের আগে তাঁর পিতা-মাতার কয়েকটি কন্যা সন্তান হয়ে মারা যায়। ফলে তার ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা বংশলোপের আশংকায় অস্থির ছিলেন। তাই যতীন সরকারের জন্মের পর তার ঠাকুরদা রামদয়াল সরকার বলেছিলেন, 'আজ থেকে আমার সব অশান্তি দুর হলো'। সেজন্য তিনি যতীন সরকারের নাম দিয়েছিলেন 'শান্তি'। শান্তি ছোটবেলা থেকেই তার ঠাকুরদার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে মানুষ হয়েছেন। তার ঠাকুরদা তাঁকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শোনাতেন, বিশেষ করে গীতা। কিন্তু তিনি জাতিপ্রথা মানতেন না। তিনি বলতেন, জন্মগত ভাবে কেউ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বা সূদ্র হয়ে জন্মায় না। এক সাক্ষাৎকারে তাঁর ঠাকুরদার প্রভাব তাঁর মনন গঠনে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে যতীন সরকার বলেছিলেন,

আমাদের পরিবারটি ছিল অত্যন্ত দরিদ্র একটি পরিবার। ...তবে আমাদের পরিবারে লেখাপড়া, চিন্তাচর্চা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ...আমার ঠাকুরদা একজন যথার্থ এলিট ছিল। সেই যুগে গ্রাম্য পাঠশালায় যতটুকু লেখাপড়া শিখেছিলেন তা থেকেই তিনি একজন সুশিক্ষিত মানুষ হিসাবে বাংলা এবং সংস্কৃত দুটি বিষয়েই অত্যন্ত পারঙ্গম ছিলেন এবং আমার জীবন-গঠনে এবং চিন্তা-চেতনা তৈরিতে আমার ঠাকুরদা রামদয়াল সরকারের অসাধারণ অবদান। ছেলেবেলায় আমাকে নিয়ে তিনি পড়তে বসতেন, চিন্তা করতেন, শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত পড়তেন, গীতা পড়তেন, রামায়ন-মহাভারত পড়তেন। (স্বপন পাল, প্রাগুক্ত)

১৯৪৮ সালে যতীন সরকার প্রাইমারি স্কুল শেষ করে নেত্রকোনার তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয় এসে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৫০ পর্যন্ত তিনি এই স্কুলেই পড়েন। পঞ্চাশের দাঙ্গায় ৮ম শ্রেণীতে পড়ার সময় স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর পড়াশুনায় সাময়িকভাবে ছেদ ঘটে। অন্য স্কুলে ভর্তি হয়ে অবশেষে ১৯৫৪ সালে তিনি মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি নেত্রাকোনা কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। এ সময় তাঁকে অনেক কষ্ট করে, টিউশনি করে, লজিং-এ থেকে পড়াশুনা চালাতে হয়েছে। ১৯৫৭ তে এসে তিনি আনন্দমোহন কলেজে বি.এ.-তে ভর্তি হন। ১৯৫৯ সালে বি.এ. পরীক্ষার পর সরাসরি

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ তাঁর হয় নাই। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত তাঁকে বারহাট্টায় একটি স্কুলে মাস্টারির চাকুরি নিতে হয়েছিল। দুই বছর চাকুরি করে অর্থ জমানোর পর ১৯৬১ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন এবং নভেম্বরে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজে প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন। পরবর্তী প্রায় ৪০ বছর (২০০২ সাল পর্যন্ত) এখানেই তিনি শিক্ষকতা করে অবশেষে অবসর গ্রহণ করেন। এই দীর্ঘ সময়ে ধীরে ধীরে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। অব্যাহত লিখন-পঠন ও বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে তিনি বিদ্বৎ সমাজে একটি স্থায়ী সম্মানের আসন গড়ে তোলেন। তাঁর পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় স্বনামধন্য লেখক, বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের পথিকৃৎ, ও ছাত্রদের বিভিন্ন পাঠচক্রের অন্যতম উপদেষ্টা 'যতীন স্যার' হিসাবে।

এই সময় তাঁর অন্যতম কীর্তি ছিলো (লেখা বইগুলি ছাড়াও) অনেক গুলি "পাঠচক্র" প্রতিষ্ঠা। তিনি মনে করেছিলেন যে বাংলার নব জাগৃতির পথিকৃৎ ডিরাজিও-র মত তিনিও এই পাঠচক্রগুলির মাধ্যমে মফস্বল শহর ময়মনসিংহে একটি মুক্তবুদ্ধির চর্চার ট্র্যাডিশান তৈরী করবেন। এ কাজ অবশ্য তিনি শুরু করেছিলেন ছাত্র অবস্থাতেই। ছাত্রাবস্থায় তাঁর সৃষ্ট পাঠচক্রটির নাম ছিল 'আমরা সমুদ্রমুখী'। নাম থেকেই বোঝা যায় তরুণ যতীন সরকারের উদার মনোভংগী। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত যে পাঠচক্রটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন ১৯৮২ সালে, তার নাম দিয়েছিলেন 'মুক্ত বাতায়ন পাঠচক্র'। এই পাঠচক্রে অনেক পন্ডিত লোকেরা আলোচনা করতেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে ওয়াহিদুল হক, গোলাম সামদানী কোরাইশী, ড. গোলাম মুরশিদ, খগেশ কিরন তালুকদার, প্রমুখ।

যতীন সরকার স্কুল-কলেজে পড়ার সময় থেকেই দ্বান্দ্বিক বাস্তবাদী দর্শনের প্রতি আস্থা স্থাপন করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। অজয় রায় ও জ্যোতিষ বসু তাঁকে প্রথম পার্টির সংগে সংশ্লিষ্ট করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, 'মার্কসবাদকে' তিনি কখনোই কোন স্থির, বদ্ধ, মৌলবাদী বিশ্বাস হিসাবে দেখতেন না। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শ্লোগানটি ছিল, 'মার্কসবাদ ছাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রগতি, এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে আত্মঘাতি'। অর্থাৎ, মার্কসবাদের সঙ্গে থাকতে হবে, একে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না, তবে আবার মার্কসবাদে আটকে না থেকে তাকে অতিক্রম করে তার বাইরে থেকেও নানা জ্ঞান ও পথের ঐশ্বর্য আহরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে

তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষনীয় ক্লাসিক গ্রন্থটির নাম মার্কসবাদের খন্ডীভবন ও সমাজতন্ত্রের সংকট। এছাড়া তাঁর আরেকটি প্রবন্ধ সংকলন আছে, যার নাম 'সত্য যে কঠিন'। সেখানেও ১৯৯০ সালের পর সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরবর্তীতে চীনে যে নতুন ধরণের তথাকথিত 'বাজার সমাজতন্ত্র' গড়ে ওঠে তা নিয়ে অত্যন্ত গভীর প্রজ্ঞাময় বিশ্লেষণ উত্থাপিত হয়েছে। তিনি চীনকে প্রথমে 'প্রহেলিকা' বলে অভিহিত করেন। পরে উপসংহারে তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ভাষায় লিখেন,

"আশংকা বিহবল ও দ্বিধা-থর-থর চিত্তে আমি শুধু কামনা করি ঃ চীন বিপ্লবের সকল বালা-মুসিবত দূর হয়ে যাক। সকলের সকল আশংকা মিথ্যা প্রমানিত করে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সে বিপ্লব সম্পূর্ণ স্বার্থক হয়ে উঠুক" (যতীন সরকার, সত্য যে কঠিন, রোদেলা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ২০১০।)

যতীন সরকার সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি ছিলেন 'ত্রিকালদর্শী'। সেটা এই অর্থে যে, যেহেতু তিনি ১৯৩৬ সাল থেকে ২০২৫ সাল অবধি জীবিত ছিলেন তাই তিনি একই সংগে ব্রিটিশ যুগ, পাকিস্তানী যুগ, এবং বাংলাদেশী যুগের দ্রষ্টা। এই ত্রিকাল দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং এখনকার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে প্রাসংগিক গ্রন্থে, যার নাম পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন। এখন পর্যন্ত বইটির পাঁচটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। বইটি ২০০৮ সালে প্রথম আলো কর্তৃক বর্ষসেরা গ্রন্থ হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। এই বই একই সঙ্গে যতীন সরকারের জীবনচিত্র এবং চলমান অর্থনীতি-রাজনীতি-রাষ্ট্র-সমাজ ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক বিবর্তনের এক তথ্যনিষ্ঠ চিত্তাকর্ষক ইতিহাস।

এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে যতীন সরকারের কীর্তির কথা বলে শেষ করা কঠিন। তিনি ছিলেন শিক্ষক, লেখক, রাজনীতিবিদ, গণমানুষের এবং জীবন-সংলগ্ন এক বুদ্ধিজীবী, যিনি নানা সম্মান ও পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি দুইবার উদীচীর সভাপতিও ছিলেন। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং সবসময়ই আত্মসমালোচক ও নিজে নিজেকে অতিক্রমের জন্য সর্বদা সচেষ্ট এক ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থে একজন ভূমিপুত্র। তিনি কখনো ময়মনসিংহ ছেড়ে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার কথা ভাবেন নি। সারাজীবন নেত্রকোনা এবং ময়মনসিংহেই থেহকে গেছেন। এমনকি মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিলেন যে, নেত্রকোনার সাতপাই-এ নিজ

বাসভবন 'বাণপ্রস্থে' যেন তাঁর শেষ শয্যা হয়। সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন; রেখে গেছেন এক পুত্র, এক কন্যা এবং স্ত্রীকে, এবং সাথে আমাদের মত অসংখ্য গুণগ্রাহীকে।

নির্দেশিত রচনাবলী

স্বপন পাল (২০২৫), যতীন সরকার: *মহাজীবনের প্রতিকৃতি*, নেত্রকোণার নাগরিক শোকসভা আয়োজক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ, ১৮ সেপ্টেম্বর।

যতীন সরকার (২০১০), *সত্য যে কঠিন*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

যতীন সরকার (২০০৫), *পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

যতীন সরকার: বুদ্ধিজীবিতা ও সাধারণ মানুষের জীবন

আহমাদ মাযহার*

ভূমিকা

আমাদের কৈশোরোত্তীর্ণ কালে শহুরে সমাজেরও কিছু মানুষকে দেখতাম যাঁরা দৃশ্যত খুব সাধারণ জীবন যাপন করলেও বিদ্যায়, রুচিতে, মূল্যবোধে ছিলেন ঋদ্ধ। এমনকি ক্ষমতা কাঠামোর অংশী কিংবা অর্থবিত্তে সমৃদ্ধিশালী লোকজনও অনেকটাই মান্য করতেন এই ধরনের মানুষদের। এমন কিছু মানুষও দেখেছি, কৃষিসংস্কৃতির মধ্যে থেকেও উচ্চতর ও মানবিক বিবেচনাবোধে যাঁদের শ্রেয়োতা দৃশ্যমান থাকত। এমন কিছু স্কুল-কলেজের শিক্ষককে দেখতাম তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কৃষকতায়ও ছিলেন অন্য সাধারণ কৃষকদের মতোই কর্মশীল। তাঁদেরও কখনো কখনো হালচাষ করতে দেখেছি, কিংবা দেখেছি ক্ষেতে নিড়ানি দিতে বা ফসল মাড়াই করতে। জ্ঞানের দিক থেকে সক্রেটিস, প্লেটো, রুশো, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শহীদুল্লাহর মতো উচ্চ মানবেরা যেমন তাঁদের যাপিত জীবনে প্রাসঙ্গিক ছিলেন তেমনই আউশ আমন বোরো কিংবা রবিশস্য নিয়ে তাঁদের যাপিত জীবন ছিল সাধারণ আর দশজন কৃষকেরই মতো! ফলে তাঁদের আচরিত জীবনবোধে যেমন ধান্ধার কোনো তাৎপর্য ছিল না তেমনি অচেনা অভিব্যক্তির আশ্রয় নিতে হতো না জীবনের দর্শন অনুধাবনকে ভাষায় প্রকাশ করতে! হয়তো সেকারণেও সমাজের কোনো স্তরের মানুষের পক্ষেই তাঁদের ভাষা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হতো না।

বিশ্বায়ন প্ররোচিত উন্নয়ন আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে উত্তরোত্তর নানা নতুন সূচকে উন্নত করে তুললেও তা আমাদের চারপাশে সহজ সরল সেই ধরনের বৌদ্ধিক মানুষগুলোকে নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকতে দিচ্ছে না! আবার বুর্জোয়া সংস্কৃতির পরিশীলন না হওয়ায় বিত্ত ও ক্ষমতাশালীরা বুর্জোয়া ন্যায়বোধের সংস্কৃতিতেও নিজেদের উত্তীর্ণ করতে পারেননি। সম্ভবত এই জন্যই চারপাশে দেখা যায় রুচির দুর্ভিক্ষ! সংগঠনে চাঁদা দিয়ে তাঁরা বিশেষজ্ঞসুলভ বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। কবিতা বিবেচনায় যতটা নয়, ক্ষমতাকাঠামোর নৈকট্যের বিবেচনায় তাঁরা হন

*লেখক, গবেষক ও সম্পাদক।

পুরস্কৃত! সমাজে সম্মান তাঁরা অর্থ, রাষ্ট্রীয় পদবী বা কোনোভাবে ক্ষমতাশালী হওয়ার বিনিময়ে 'ক্রয়' বা 'আদায়' করেন।

ওপরে যে ধরনের মানুষের স্মৃতিচারণ দিয়ে এই রচনার শুরু, যতীন সরকার জীবনবোধে, প্রজ্ঞায়, রুচিতে সেই ধারাই মানুষ। তাঁর জীবনপটভূমি থেকে সমতুল্য মানুষ আর দু-চার জন আমাদের সমাজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। পাণ্ডিত্যে তাঁর চেয়ে শ্রেয়ো মানুষ কিছু থাকতে পারেন, কিন্তু যাপিত জীবনের সঙ্গে বৌদ্ধিকতাকে সমন্বিত করে চলা তাঁর মতো মানুষ আমি বেশি দেখিনি। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁকে হয়তো বামপন্থী বা বামপন্থার নিকটজন বলা যাবে, কিন্তু কখনোই তাঁকে বামমোল্লাদের কাতারে ফেলা যাবে না। বামপন্থার সমর্থক তিনি বঞ্চিতের বেদনার সঙ্গি বলে। বামপন্থার মানবিকতা তাঁর আপন আচরণীয় যেমন তেমন তিনি এর সৌন্দর্যেরও অনুরাগী। অন্য দিকে তাঁর মনন কোনোরূপ সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন নয় বলে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি ইকবাল কেন আমাদেরও তা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয় নি! আমাদের আধুনিকবাদী জীবনদৃষ্টি যে গ্রামীণ আত্মনির্ভর শ্রমশীল মানুষদের সঙ্গে সাঁকো বাঁধতে পারেনি সেই ভ্রান্তিকে তিনি আধুনিকতা অভিমুখী সাহিত্যের মধ্যেকার সীমাবদ্ধতা হিসাবে দেখেছেন। পশ্চিমের আধুনিকবাদের চেয়ে আমাদের দৃষ্টি কেন আলাদা হওয়া উচিত সে অনুভবের সন্ধানও তিনি আমাদের দিয়েছেন। পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দেখতে দেখতে এগিয়ে চলা নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়ে তুলে এনেছেন তাঁর কালের প্রবহমান দেশজ সমাজচৈতন্যকেই। আমাদের সমাজে বৌদ্ধিকতার এই ধারাটি যদি শক্তিশালী হতে পারতো তাহলে গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন এমন পরস্পর জটিল সম্পর্কে নিপতিত হতো না।

বয়সে তিনি আমার পিতার চেয়েও জ্যেষ্ঠ! তিনি সক্রিয় চিন্তায় বেঁচে আছেন এই ধারণা আমাকে স্বস্তি দিত, কারণ সব সময় মনে হতো মুক্ত মনে শ্রদ্ধা করার মতো এই মানুষটির কাছে আমি পৌঁছতে পারব। তাঁর জীবনাবসানের খবর শুনে মন গভীরভাবে বিষণ্ন হয়ে পড়েছে। একজন মানুষের জীবনের দৈর্ঘ্য বিবেচনায় তাঁর জীবন হ্রস্ব ছিল বলা চলে না, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতি রিক্ত করে দিয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনবোধকে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, আমাদের এই দীনতার কথা অনুভব করে এর থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ ও সেই অনুসারে অনুশীলনই হতে পারে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর উপায় হিসাবে সবচেয়ে বেশি করণীয়!!

তিনি ছিলেন পেশায় সাহিত্যের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশের খ্যাতিমান একজন মননশীল লেখক, ইতিহাসসচেতন সমাজবিশ্লেষক; একই সঙ্গে দার্শনিক ও রসিক সত্তার অধিকারী একজন মানুষ। একজন সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে সক্রিয় ছিলেন। সাধারণত সাহিত্যিক বা সৃজনশীল মানুষেরা রাষ্ট্রের ক্ষমতাবলয়ের কাছাকাছি বসবাস করেন; যতীন সরকারের বেলায় তেমনটি ঘটেনি। তিনি মূলত মফস্বল শহরেই বসবাস করেছেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্বসূত্রে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশজুড়ে। শুনেছেন সাধারণ মানুষের অন্তর্ভাষ্য। এই মানুষটি যখন স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনী লেখেন তখন তাতে বাঙ্ময় হয় দেশের সাধারণ মানুষের বৌদ্ধিক ভাষ্য। পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখবার সময়ও হয়ে ওঠেন সমাজের বহমান নানা সমসাময়িক ঘটনার ব্যাখ্যাতা। আর তাঁর মতো জীবন-পটভূমির মানুষ রবীন্দ্রনাথের মতো মহীরুহপ্রতিম ব্যক্তিত্বশালী কবিকে যে চোখে দেখেন তা-ও হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে।

পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন, *পাকিস্তানের ভূত দর্শন*, *সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাচার* এবং *আমার রবীন্দ্র অবলোকন* যতীন সরকারের ভিন্ন ভিন্ন পটভূমির ও বিভিন্ন সময়ের লেখা বই হলেও চিন্তার ঐক্যে গ্রথিত। বর্তমান রচনাটি বিভিন্ন সময়ের ঐ চারটি বইয়ের পর্যালোচনামূলক ঐক্যবদ্ধ উপস্থাপনা। প্রথম দুটি বইয়ে পাওয়া যায় সমাজ ও রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তাঁর চেতনাপ্রবাহ। ব্যক্তি এখানে যতটা না আত্ম তার চেয়ে বেশি সমাজের প্রতিনিধি। তাই হয়তো এই স্মৃতিকথাদুটিতে নিজের ব্যক্তিজীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা আলোচনা না করে সমাজের চেতনাপ্রবাহে যেন ব্যক্তি হিসেবে নিজের অস্তিত্বকে ভেসে চলতে দেখেছেন। *সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাচার* শীর্ষক তৃতীয় বইটি আরো একটু নৈর্ব্যক্তিক; সমাজের সামগ্রিক সাংস্কৃতিকতার মধ্যে একজন বৌদ্ধিকতা-অনুশীলনকারী ব্যক্তির টানাপড়েনের আলোকে সময়খণ্ডকে দেখেছেন। *আমার রবীন্দ্র অবলোকন* শীর্ষক চতুর্থ বইটি প্রকৃতপক্ষে বাঙালির সৃষ্টিশীলতা ও মনীষার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথকে লেখকের যাপিত জীবন ও সমাজপটভূমিতে খুঁড়ে দেখার প্রয়াস। এই চারটি বইকে হয়তো একত্রে বলা যায় যতীন সরকারের জীবনপরিসরের দর্শনরূপেরই সামগ্র্যসূত্র। তাই আমরা এই চার বইয়ের সামগ্র্যের মধ্যে প্রতিফলিত যতীন সরকারের মানসভুবনকে খুঁজে দেখতে চেষ্টা করব।

আত্মজীবনীর আয়নায়

আত্মজীবনী এক মিশ্র আঙ্গিকের স্বাধীন সাহিত্যমাধ্যম। প্রধানত লেখকের ব্যক্তিজীবন এর উপজীব্য হলেও তা একই সঙ্গে ইতিহাস, কথাসাহিত্য, সমাজবিশ্লেষণ, দার্শনিকতা ও রসিকমনের সমন্বয়ে সৃষ্ট এক মুক্ত সংরূপ। লেখকের ব্যক্তিসত্তা এই আঙ্গিকের কেন্দ্রে থাকে বলে সমকালীনের কাছে তা এক ধরনের অর্থ বহন করে আর উত্তরপ্রজন্মের পাঠকেরা পায় ভিন্ন আস্বাদ।

আত্মজীবনী কথাসাহিত্য নয় বলে কল্পনার অবকাশ এখানে নেই। বিশুদ্ধ ইতিহাস না হলেও ইতিহাসের উপকরণ সরবরাহকারী হিসেবে এর তাৎপর্য বিরাট। প্রধানত গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আত্মজীবনীর কাঠামো গড়ে ওঠে না। কিন্তু ব্যক্তির প্রত্যক্ষে ও শ্রবণে যে তথ্য থাকে তার সঙ্গে সেই ব্যক্তির উপলব্ধির মিথষ্ক্রিয়ায় যে সত্য গড়ে ওঠে তা-ই আত্মজীবনীর ফল। তাই ইতিহাসের ব্যাখ্যায় আত্মজীবনীর সাক্ষ্য পেতে পারে অপরিসীম গুরুত্ব। আত্মজীবনীকার যেমন সহজে তাঁর কালের মানুষের মনোজগতের চিহ্নগুলোকে উপস্থাপন করতে পারেন সে-ক্ষমতা একমাত্র উপন্যাস ছাড়া আর কোনো সাহিত্যমাধ্যমের নেই। আমাদের দেশেও আত্মজীবনী লেখার ঐতিহ্য গড়ে উঠতে শুরু করেছে। যাঁরা নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করে থাকেন তাঁদের অনেকেই হয়তো আত্মজীবনী লেখেন, কিন্তু সাধারণত আত্মজীবনী লেখকদের সকলেই সাহিত্যিক নন। বিশেষ বিশেষ সময়ের বিচিত্র পেশার মানুষের লেখা আত্মজীবনীর মধ্য দিয়ে একেকটা সময়ের যুগমানসের অখণ্ড রূপ ফুটে ওঠে।

সচেতন মনের মানুষেরাই আত্মজীবনী লেখেন। জীবনের চলার পথের দু পাশের ছবিগুলোকে তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন গভীরভাবে। শুধু পর্যবেক্ষণই করেন না, নিজের জীবনের 'বেদনার সঙ্গে মিশে থাকা অমোঘ আমোদ'কেও ভাগাভাগি করে নিতে চান সমসময়ে ও উত্তরকালের মানুষের সঙ্গে। তাঁদের জীবনের ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তাঁদের চেতনার বিবর্তনের নানান অনুষঙ্গ। উত্তরপ্রজন্মের মানুষের কাছে পূর্বপ্রজন্মের শক্তিসামর্থ্য ও ভুলত্রুটির জমাখরচের হিসাব হচ্ছে এই আত্মজীবনী। নিজের যুগের সংগ্রাম ও শান্তির পদচিহ্ন উত্তরকালের কাছে রেখে যায় গন্তব্যের দিকনির্দেশনা। তাই আত্মজীবনীর গুরুত্ব অপরিসীম।

আর তা যদি হয় যতীন সরকারের মতো প্রজ্ঞাবান মানুষের তা হলে তার মূল্য আরও বেড়ে যায়।

যতীন সরকার ছিলেন আমাদের সাহিত্যের একজন সদাসক্রিয় ও মননশীল সমাজবোধসম্পন্ন প্রাবন্ধিক। তাঁর সাহিত্য বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে দর্শন, সমাজ, ও রাজনীতির সচেতন অনুভব থেকে। একদা তিনি নিজেও ছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। অন্ধ, নিষ্প্রশ্ন কর্মী নয়, আকৈশোর জিজ্ঞাসু, বিচারশীল প্রাণবান এক কর্মী। মানুষের কল্যাণ কামনায় বেদনাবান তাঁর মতো একজন মানুষ যেকোনো সমাজেই বিরল। ষাটোর্ধ্ব বয়সে এসে নিজের সমকালের দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে তিনি লিখতে বসলেন আত্মজীবনীমূলক দুটি বই, *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন* এবং *পাকিস্তানের ভূতদর্শন*। এগুলো কোনো নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসের বই নয়; বরং বাংলার বিকাশশীল মুসলিম সমাজের নানা জটিল আবর্তের মধ্যে বিলীয়মান, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের মধ্যে বসবাসকারী একজন ইহজাগতিক মানুষের বয়ান। পেশাগত জীবনে যতীন সরকার প্রধানত ছিলেন সাহিত্যের শিক্ষক। তাঁর ছিল সংবেদনশীল ও সচেতন মন। এই মন সমাজজীবন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার হতে গিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। সমাজের গভীরে ক্রিয়াশীল ভাবনাগুলোকে এই রকম মনই উপলব্ধি করতে পারে।

পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন

ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কালে যতীন সরকারের জন্ম ও বিকাশ। তাঁর শৈশবে জন্ম হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের। পাকিস্তান এমন একটি দেশ যে দেশের দুই অংশ জীবনযাত্রায়, সংস্কৃতিতে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও শুধু ধর্মীয় কারণে এক রাষ্ট্রভুক্ত হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ যে দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তান চেয়েছিল তাতে ধর্মপরিচয়ের ভূমিকা থাকলেও এর গভীরে অন্তঃশীল ছিল মূলত অর্থনৈতিক ও জীবনবোধের বিকাশাকাঙ্ক্ষা অর্জনের সুযোগের বৈষম্য। ফলে যেমন দ্রুত বাঙালিরা একত্র হয়েছিল পাকিস্তানের স্বপ্নে উজ্জীবিত হয়ে প্রায় তেমনই দ্রুত তারা তাদের ধর্মপরিচয় সর্বস্বতার ভ্রান্তিকে সংশোধন করে নিতে পেরেছিল পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটিয়ে। যতীন সরকার ইতিহাসের এই ওলটপালটের চাক্ষুষ সাক্ষী। *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন* বইটি এই সাক্ষ্যেরই এক আন্তরিক বয়ান। শুধু সময়খণ্ডের বিবেচনাতেই নয়, যে অঞ্চলে তাঁর জন্ম ও বেড়ে-ওঠা সেই এলাকার মানুষের মনোজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের প্রাণকে

যেভাবে অনুভব করেছিলেন তার আন্তরিক মমতাপূর্ণ বর্ণনা এই বইয়ে আঁকা রয়েছে।

যতীন সরকার জন্মেছিলেন বর্তমান নেত্রকোণা জেলার এক গ্রামে। *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন* সাধারণ আত্মজীবনীর মতো বই নয়। বাল্যকাল থেকে জীবনের চলার পথে যে-সব সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে অতিক্রম করেছেন তার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়েছেন লেখক এই বইয়ে। চমৎকারভাবে বিবৃত হয়েছে তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবনে দেখা সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি। শুধু দেখাই নয়, নিজের ভাবুক-সত্তার দ্বিধা ও বিকাশপ্রবণতা এই দুয়ের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কীভাবে বেড়ে উঠেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। বইটির নাম যদি হতো 'আমার জীবন-কথা' বা এই জাতীয় কিছু, তাহলে হয়তো বইটির কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যেত না। হয়তো তাহলে আমরা একটা সময়খণ্ডকে তাঁর এমন সমগ্রদৃষ্টির আয়নায় প্রতিফলিত দেখতে পেতাম না। সুতরাং, বইটির *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন* নামটি ঐ সময়ের বাংলাদেশের মানুষের, বিশেষ করে মধ্যবিত্তের মানসে সামাজিক-সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতগুলো কী রূপ পেয়ে চলছিল তার একটা ভাবকল্প আমাদেরও মনে জাগিয়ে দেয়। বইটির সামগ্রিক অভিপ্রায়কে আমাদের কাছে সজীবভাবে প্রকাশ করে, কৌতূহলকে উসকে দেয়। সূচনাংশেই লেখক জানিয়ে দেন যে, এই বইয়ে তিনি 'এককালের পাকিস্তানের প্রবক্তা এবং এ-কালেরও বাংলাদেশি পাকিস্তানপন্থিরা যে পাকিস্তানের দর্শন বা ফিলসফির কথা বলে, সেই দর্শনটিকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা' করেছেন। তাঁর এই বই লেখার লক্ষ্য হচ্ছে 'সেই দর্শন, যার অর্থ দেখা ও ফিলসফি দুই-ই।' পাঠকের কৌতূহলকে এভাবেই তিনি সুনির্দিষ্ট করে দেন।

একেক সময়ের গুরুত্ব একেক রকম। যে সময়খণ্ডের কথা যতীন সরকার লিখেছেন, বাঙালির জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠবার জন্য সে-সময়টার গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয়তা নিয়ে এই সময়ের বাঙালির মনে অনেক প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। বলা যেতে পারে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি সেই জিজ্ঞাসারই পরিণাম। কোন পটভূমিতে সে-সময়ের মানুষের মনে প্রশ্নগুলো জেগে উঠেছিল তা ধরা পড়েছে যতীন সরকারের প্রাজ্ঞ কলমে। হিন্দু সমাজে জন্ম ও বেড়ে ওঠা বলে এবং মুক্ত দৃষ্টির বলে বইটির এই তাৎপর্য গড়ে উঠেছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী-খুলনা-ময়মনসিংহ ইত্যাদি কয়েকটি প্রধান জেলা শহর ছাড়া আর সবই ছিল গ্রাম। যতীন সরকারের জন্ম ও বিকাশ নেত্রকোণার

গ্রামাঞ্চলে বলে তৎকালীন বাংলার গ্রামের রাজনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক স্পন্দন শোনা যায় এই বইয়ে। যে-সময়ের কথা বইয়ে বর্ণিত, সেই কাল কিন্তু আর এক দিক থেকে সাম্প্রদায়িকতা অনুভবেরও সময়। পাকিস্তানের ভাবনা এই জাতির মনোজগতে জেগে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা এতটা সর্বব্যাপী বিষক্রিয়াঘনও হয়ে ওঠে নি। সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার কারণগুলোকে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করে দেখেছেন। ফলে এই বিচিত্রমাত্রিক ব্যাপারগুলো অনেকটা ঔপন্যাসিকের বস্তুনিষ্ঠতায় বর্ণনা করতে পেরেছেন তিনি। ফলে বইটি একদিকে যেমন ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে তুলে ধরতে পেরেছে, অন্যদিকে হয়ে উঠেছে রসঘনও।

লেখক তাঁর শৈশবের পারিপার্শ্বিকতা থেকে কীভাবে নিজের বিবেচনাকে আহরণ করেছেন তারও দলিল *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন*। নিজের মনের দ্বৈরথগুলো উল্লেখেও তিনি কার্পণ্য করেন নি। কুণ্ঠিত হন নি নিজের ব্যর্থতার ক্ষেত্রকে শনাক্ত করতেও। একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। অনেক বামভাবুকদের মতো শেখ মুজিবের ৬ দফা সম্পর্কে তাঁর মনেও সে সময় সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণগুলো যে পুরোপুরি ঠিক ছিল না তা তিনি অকপটে উল্লেখ করেছেন। অল্পবয়স কখনো কখনো পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে যে তাঁর মনও কিছুটা সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছিল সে-কথাও তিনি অড়াল করেন নি।

বইটি যে কেবল রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঘটনার বর্ণনা হয়েই থাকে নি, তার কারণ তিনি প্রতিটি ঘটনার পেছনের মনস্তত্ত্বকে গভীরভাবে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। একই ঘটনার স্বীয় ব্যাখ্যা যেমন দিয়েছন তেমনি দেখেছেন সমকালীন ও অগ্রজদের অন্যতর ভাবনা বা অন্যদের বিবেচনাকেও তুলনা করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলোচনা হয়ে উঠেছে তত্ত্বীয়, কিন্তু তা নিষ্প্রাণ নয়। কারণ, তত্ত্ব এখানে এসেছে ঘটনাবলির মধ্যকার দ্বান্দ্বিকতা থেকে নিষ্কাশিত হয়ে, শিখিয়ে দেয়া দলীয় আদর্শের বাঁধা বুলি হয়ে নয়। বইটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠবার এটিও একটি কারণ।

ষাটের স্বাধীনতা-অভিমুখী ঘটনাপঞ্জির ইতিহাসধর্মী বইপত্রে সাধারণত ঢাকা শহরের ইতিহাসই উঠে আসে। কিন্তু এর ফলে ইতিহাসের এক পিঠই আমরা দেখতে পাই। যতীন সরকারের এই বইয়ে পাকিস্তানি চেতনার বিরুদ্ধে জেগে ওঠা বাঙালিত্বের জাগরণকে গ্রামবাংলার পটভূমিতে দেখতে

পাই। তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে নেত্রকোণায়, যৌবনে থেকেছেন ময়মনসিংহ শহরে। সে আমলে ময়মনসিংহ ছিল ঢাকা থেকে দূরে এক জেলা শহর। সেখানকার রাজনৈতিক তৎপরতার ইতিকথা আমাদের ইতিহাসের বইগুলোতে তেমন একটা আসে নি। ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে গ্রামের মানুষদের ভূমিকার ইতিকথা সামগ্রিকভাবেই এসেছে কম। এখানে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাস প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এদিক থেকেও *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন* বইটি মূল্যবান।

একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে উজ্জীবিত ত্যাগী রাজনীতিকদের দেখা যেত। তাদের ত্যাগ, সততা, নিষ্ঠা ছিল কিংবদন্তির মতো। এক সময় বৃটিশবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে যেমন দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হতে দেখা গিয়েছিল তেমনি ছিলেন এই কমিউনিস্টরাও। যতীন সরকার এ-রকম কয়েকজন কমিউনিস্টের পরিচয় তুলে ধরেছেন এই বইতে।

পাকিস্তানের ভূত দর্শন

*পাকিস্তানের ভূতদর্শন*কে বলা যায় লেখকের আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিকথা পাকিস্তানের *জন্মমৃত্যু দর্শনে*র পরের খণ্ড। এই খণ্ডের বিষয় স্বাধীনতা-উত্তর কালের প্রথম কয়েক দশক। ভারতের শরণার্থী শিবিরের আশ্রয় থেকে দেশে ফেরার স্মৃতি দিয়ে বইয়ের শুরু। বিজয়ের মুহূর্তে ভারতে যে আশ্রয়কেন্দ্রে তিনি ছিলেন সেখানে আশ্রিতদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। মুসলিমরাই সেখানে ছিল সংখ্যালঘু। কিন্তু সেখানকার হিন্দুদের যে মনোভঙ্গি তিনি দেখেছিলেন তার সাম্প্রদায়িকতা তাঁকে পীড়িত করেছিল। পরবর্তীকালে স্বল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানের ভূত হয়ে যে সাম্প্রদায়িকতার ফিরে আসা তার জন্য তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের এই মনোভঙ্গির দায়ও দেখতে পেয়েছেন। এই দেখা তাঁর বস্তুনিষ্ঠতা অনুসারী জীবনানুশীলনেরই পরিচায়ক।

বিজয়ের উল্লাসে নিজ জনসমাজের এই মনোভঙ্গিকে 'বিপন্ন বিষাদ ও অসুস্থ সাম্প্রদায়িকতা' বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে। তিনি ব্যথিত হয়েছেন স্বাধীন দেশের সামাজিক নেতৃত্বের নগদ প্রাপ্তিমূলক অভিব্যক্তির প্রাধান্য দেখতে পেয়ে। স্বাধীনতার পরপরই লক্ষ করেছেন মতলববাজেরা কিভাবে

সংশয়ের জাল বিছিয়ে দিচ্ছে চারপাশে। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের সময়ের ভাবাবেগের মধ্যেই নেতৃবৃন্দের আত্মতৃপ্তির ভাব তাঁকে অস্বস্তি দিয়েছে, করেছে শংকিত। লক্ষ করেছেন 'হাজি' আর 'রাজাকারে'র নকল ঝগড়ায় কিভাবে আসল রাজাকারদের পোয়াবারো হচ্ছে! দেখেছেন কিভাবে অসত্য, অর্ধসত্য, ও বিকৃত সত্যের রাহুগ্রাসে আসল সত্যের সূর্য আড়ালে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষকের প্রত্যয়ে আশাবাদিতাও যে জাগেনি তা নয়; তিনি অনুভব করেছেন গাঁয়ের কৃষকের ঐকতান সংগীত ও শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্য বেসুরো বাঁশির সুর।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গণপরিষদ গঠনের আইনগত ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের বিষয়েও কানাঘুষা তিনি শুনেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যাথার্থ্যকে যারা সমর্থন করেনি মূলত তাদের অসন্তুষ্ট কণ্ঠ থেকেই যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল তা তাঁর নজর এড়ায়নি। গণপরিষদের মাধ্যমে প্রণীত ও গৃহীত সংবিধানের আওতায় অনুষ্ঠিত উনিশশো তেয়াত্তর সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়কার ঘটনাবলি ও মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে তিনি বিচলিত বোধ করেন। সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সংঘটিত কারচুপির ঘটনা তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত ও শংকিত করেছিল। যে গুটিকয়েক আসনে আওয়ামী লীগের বিরোধিরা প্রকৃতপক্ষে জিতেছিল তাতে সংসদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কোনো সমস্যা হতো না! কিন্তু এই কয়টা আসনেও বিজয় নিশ্চিত করার জন্য যে আচরণ করা হলো তাকে তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারেন নি। স্বাধীনতার পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনেই কয়েকটি আসনে কারচুপি তাঁর মনে গভীর অসন্তোষের কারণ হয়েছিল।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট সরকারের অক্ষমতায় অচিরেই কৃষকমহলে সৃষ্ট হতাশা ও ঔদাসীন্য তাঁকে ক্রমাগত পীড়িত করতে থাকে। এরই মধ্যে নেমে আসে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে সর্বব্যাপী অবিশ্বাস ও অনাস্থা। অসহায়ের মতো তিনি দেখেছেন খাদ্যঘাটতির ছিদ্রপথে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশকে। অশনি সংকেত দেখতে পেয়েছিলেন পথের কাঁটার হিসাব না-রাখায়; বুঝতে পেরেছিলেন সময় গেলে সাধন হবে না; অথচ সময় বয়ে যেতে দেয়া হয়েছে হতাশার দিকেই! পর্যাপ্ত আলোচনা ছাড়াই অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে জাতীয় সংসদে বাকশাল নীতি গ্রহণের প্রক্রিয়া দেখলেন বিমূঢ় চিত্তে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির

(মোজাফ্ফর) বাকশালে একীভূত হওয়া নিয়ে এসব পার্টির নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। বরং, তাঁর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছিল এই নেতৃবৃন্দের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের অসাড়তা। তিনি দেখলেন বাকশালের প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গবন্ধুর অনির্ভরযোগ্য আত্মপক্ষ-সমর্থন। একই সঙ্গে তিনি দেখলেন বাকশাল নিয়ে নানা মহলের উল্লাস ও তার বিপরীত উদ্বেগকে।

অচিরেই তাঁকে দেখতে হলো বঙ্গবন্ধুহত্যা ও রাজনৈতিক নাটকের নতুন অঙ্ক। এরই ফলস্বরূপ তিনি দেখলেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধি মুসলেমউদ্দিনদেও 'খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ'। বঙ্গবন্ধু-হত্যার পরবর্তী এক মাসের পর্যবেক্ষণ এই বইয়ে তিনি তুলে ধরেছেন গভীর বেদনা ও হতাশার সঙ্গে; বিস্তার করেছেন বঙ্গবন্ধু-হত্যা নিয়ে তাঁর ভাবনা। তিনি অবলোকন করেছেন শিক্ষায় ও পরীক্ষায় হতাশাজনক বিপর্যয় ও ছাত্র আন্দোলনে দুর্যোগের সূত্রপাত। পাকিস্তান আমলের মতোই কতিপয় নেতার উল্টোদৌড় দেখলেন। বিকশিত হতে দেখলেন পাকিস্তানের মদদ-পুষ্ট বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে। এই বইয়ে তিনি আরও তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারতের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিত, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি এবং বাঙালিত্বের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকেও।

স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের মালিকানা ছিনতাই হতে দেখে তাঁর মনে মুক্তিযুদ্ধের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে। কিন্তু তাঁর মনের এই প্রত্যয়কেও অস্বীকার করতে পারেন না যে, বেঁচে থাকতে হলে আশাবাদী হতেই হবে। বহুদিন আগে থেকেই লক্ষ করছিলেন পাকিস্তানের ভূতও কৃত্রিম এক জাতিতত্ত্ব হয়ে যেন ফিরে আসছে। খন্দকার আবদুল হামিদের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের তত্ত্বের অন্তরালে যে পাকিস্তানি ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি লুকানো তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠানে তিনি এই মনোভঙ্গির সমালোচনা করতে ভুল করেননি। কিন্তু অনুষ্ঠানে দর্শকের পেছন সারিতে থাকা প্রাবন্ধিক আবদুল হক ঠিকই বুঝেছিলেন শুধু এই বক্তৃতার জন্যই তাঁকে জেলে যেতে হবে। অনুষ্ঠানশেষে তাঁর পিঠে হাত রেখে সে-কথা বলেও গেলেন। কার্যত ঘটলও তাই। কয়েক দিন পরেই গ্রেপ্তার হলেন তিনি। তবে মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতায় পুলিশের কতিপয় কর্মকর্তার সদাচরণকে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধজাতই মনে হয়ছিল তাঁর।

তবে এমনও ভেবেছিলেন এমন সদাচরি পুলিশ আনুপাতিক হারে কতজনই বা হবে!

সাক্ষর শিক্ষাভিমানী এবং অনক্ষর প্রাকৃতজন উভয়ের মধ্যে থেকে তিনি লক্ষ করেছেন অনক্ষরদের নিখাদ দেশপ্রেম। অথচ রাজধানীর মোনাফেক মধ্যবিত্তের স্বার্থপূরণ ও বাংলাদেশের পাকিস্তানিকরণ চলছিলো জোর কদমে। এই নিকষ আঁধারে মফস্বলই তাঁর কাছে আলোর রেখা হিসেবে ধরা দিল। সেখানে তিনি উজ্জীবিত বোধ করেন পাঠচক্রে মুক্তবুদ্ধির চর্চা দেখে। তিনি মনে করেন, সংস্কৃতিই লক্ষ্য, এবং রাজনীতি সেই লক্ষ্যে পৌঁছার উপায়। তিনি উপলব্ধি করেন, অপসংস্কৃতির ধারক অপরাজনীতির কবলে প্রাকৃতজনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও কাঙ্ক্ষিত রাজনীতি। তিনি আশাবাদিতা হারান না যে, একসময় মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের স্ফুলিঙ্গই জ্বলে উঠবে মশাল হয়ে। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে লড়াই চলবে ধর্মতন্ত্রী জঙ্গিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে; সংকোচে সত্রাসে তারা অপসৃত হবে একসময়।

পাকিস্তানের ভূতদর্শনের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে আশা-নিরাশার দ্বৈরথ দেখতে পেয়েছিলেন। যতীন সরকারের এই স্মৃতিকথাদ্বয়ের পুনর্পাঠেও আমরা চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিত দেখতে পাব। তাঁর প্রজন্মের যে মানুষেরা পাকিস্তানবাদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন তাদের মাধ্যমেই আবার পাকিস্তানের ভূত ফিরে আসছিল–এই বেদনা তিনি অসহায়ভাবে অনুভব করছিলেন। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ঘটতে পারার পটভূমি তাঁর এই স্মৃতিকথার দ্বিতীয় পর্বে যেন অনেক আগেই আভাসিত ছিল। *পাকিস্তানের ভূতদর্শন* বইয়ে উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের ঘটনার তাৎপর্য তাঁর কাছে যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান দৃশ্যত সামরিক বাহিনির কতিপয়ের অভিলাষ চরিতার্থের ঘটনা ছিল না। কিন্তু অভ্যুত্থান সফল হওয়ার পর যা ঘটতে থাকল তা প্রায় সেই সামরিক কতিপয়ের অভ্যুত্থানেরই পুনরাবৃত্তির মতো। মানবতার লাঞ্ছনা, নানা রকম পরিচয়বাদী রাজনীতির বোধগত সীমাবদ্ধতা উপলব্ধিতে যতীন সরকার ছিলেন চক্ষুষ্মান। এই পরিস্থিতি গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই বই দুটির বার বার পাঠ জরুরী।

রাজনীতি ও দুর্নীতি বিষয়ক কথাবার্তা

পাকিস্তানি আমলের শেষের দশক থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনে যতীন সরকার যে একটি উজ্জ্বল নাম ছিলেন তা বাংলাদেশের সাহিত্য সংশ্লিষ্ট যে কেউই স্বীকার করবেন। দীর্ঘকালীন সাহিত্যচর্চা সত্ত্বেও এবং ঢাকা মহানগরীর বিদ্বৎমহলে নিতান্ত অপরিচিত না হলেও তাঁর রচনা গ্রন্থভূত হতে অনেক সময় লেগেছে। ষাটের দশকে আমাদের সাহিত্যিক মহলে যে অবক্ষয়ী আধুনিকবাদী আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল চেতনাগত দিক থেকে তিনি তখনই ছিলেন এর বিরোধী। তবে আধুনিকবাদী সাহিত্য বিচার থেকে তিনি দূরে থাকেন নি কখনো; বরং অবক্ষয়ী সাহিত্যের একটা অন্যতর ব্যাখ্যা তিনি সত্তরের দশকেই হাজির করেছিলেন। সমকালে খানিকটা বিতর্ক সৃষ্টি করলেও তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আধুনিকবাদী হুল্লোড়ের কারণে অনেকটাই যেন চাপা পড়ে গিয়েছিল। তবে নব্বইয়ের দশকে এসে তাঁর সেই ব্যাখ্যা পুনরায় তরুণতরদের কলমে নতুন করে ফিরে আসতে থাকে। যতীন সরকারের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে নবীনেরা। অবশ্য সমাজমনস্ক সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়ে উঠেছিল মূলত তাঁর *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন* বইটির ২০০৫ সালের 'প্রথম আলো বর্ষসেরা মননশীল বইয়ের পুরস্কার' প্রাপ্তি-সূত্রে। অনেক আগেই প্রাপ্য হলেও বাংলা একাডেমি পুরস্কারও তিনি লাভ করেছিলেন অনেক পরে, ২০০৭ সালে।

দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীর পাতায় প্রায়ই তাঁর উপস্থিতি চোখে পড়লেও সমাজের বহমান নানা সমসাময়িক ঘটনার ব্যাখ্যাতা-কলামনিস্ট হিসেবে তাঁকে খুব বেশি দেখা যায় নি। *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন* ও *পাকিস্তানের ভূতদর্শন* বইয়ের লেখাগুলোর সমসাময়িক কালেই বিশেষ কওে *দৈনিক যুগান্তর* পত্রিকায় তাঁর এই ধরনের কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। ছোট কাগজেও প্রকাশিত হয়েছিল কোনো কোনো লেখা। এরকম কিছু রচনারই সংকলন *রাজনীতি ও দুর্নীতি বিষয়ক কথাবার্তা*। এক দিক থেকে *পাকিস্তানের ভূতদর্শন* বইয়ের অনেক সম্পূরক কথাবার্তা এই বইয়ে রয়েছে।

নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ কাটিয়ে উঠে সামগ্রিক পুনর্গঠনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনায় অনভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের শ্রেণিগত দুর্বলতা, বৈদেশিক ষড়যন্ত্র, ইত্যাদি নানামুখী

টানাপড়েনের কারণে উনিশশো একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার সত্যিকার সুফল যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করতে পারে নি। এর ওপর রয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা প্ররোচনা। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাববলয় বিশ্বব্যাপী চালু করেছে একমুখী বিশ্বব্যবস্থা–যার নাম বিশ্বায়ন। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে পাশ্চাত্য দেশগুলো যে ব্যবস্থাপত্র নানা ছদ্ম উপায়ে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে তারই অন্যতম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে দুর্নীতি। এরই পটভূমিতে বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে দুর্নীতির সম্পর্ক হয়ে উঠেছে ক্রমশ নিকটতর। এর কবলে পড়ে বাংলাদেশের মতো অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল একটি দেশ যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে দিশাহারা হয়ে পড়বে তা সহজেই অনুমেয়। যতীন সরকারের *রাজনীতি ও দুর্নীতি বিষয়ক কথাবার্তা* বইয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পটভূমিতে দুর্নীতির উত্থানের আর্থ-সামাজিক কারণগুলো বিশ্লেষিত হয়েছে।

এই বইয়ের 'সব সত্যকথাই হক কথা নয়' শীর্ষক প্রথম লেখাটিতেই রয়েছে একটি দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর লাভের চেষ্টা। বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে যতীন সরকারের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ প্রতিফলিত হয়েছে এই রচনাটিতে। তিনি বলেছেন আমাদের সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থানকারী অনেকেই। অনেক সত্য কথা হয়তো তাঁরা বলেন, কিন্তু 'হক কথা' সব সময় বলতে পারেন না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনাকারী। তারাই বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের ঘৃণ্য দুশমন। নিজেদের সকল কুকর্ম ও অপরাধ তারা অস্বীকার করে। অথচ আমাদের অনেক সুধীজনই মানবাধিকারের কথা বলেন, কিন্তু দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে সেই হক কথাটি বলেন না। যতীন সরকারের বক্তব্যের এই পর্যবেক্ষণটি তুলে ধরা যায়। তিনি পেশায় ছিলেন শিক্ষক। দীর্ঘকালের শিক্ষাজীবনে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অসাড়তাকে তিনি অনুভব করেছেন গভীরভাবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতাগুলোর কারণও অনেক ক্ষেত্রে তিনি নির্দেশ করেছেন স্পষ্ট ভাষায়। তিনি মনে করেন আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেবল 'স্টুপিড' তৈরি করার ব্যাপারেই সুবিধা করে দেয়। তাঁর মতে, আমাদের ছাত্রদের অধ্যয়নের বিষয়াবলি অবশ্যই এমন হতে হবে যাতে তাদের বুদ্ধির মুক্তি ঘটে; সাম্প্রদায়িকতা-

ধর্মান্ধতা-মৌলবাদের বিরুদ্ধে তাদেও চৈতন্যে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয়; এবং বৈষম্যমূলক পচাগলা সমাজটিকে ভেঙে একটি নবীন সাম্যসমাজ তৈরিতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়। এ-রকম বিষয়াবলিকে যখন আমাদের ছাত্রদের সামনে অধ্যয়নের জন্য তুলে ধরা হবে, কেবল তখনই সেই অধ্যয়ন হবে ছাত্রদের তপস্যা।

বাংলাদেশে শিক্ষকসমাজের দুরবস্থাকে তিনি শিক্ষকদের অবস্থান থেকে এবং সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থার দিক থেকে–এই উভয় দিক থেকেই বিচার করে দেখেছেন। আমাদের সমাজে শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানানোটা একেবারেই ওপরিতলের ব্যাপার বলে শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যথার্থ দায়িত্ববোধের অভাবের দিকটিও তিনি আঙুল তুলে দেখিয়েছেন। নিঃসঙ্গ বিবেকবান, মুক্তচেতা ও পরিবর্তনাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকদের সংগঠিত হবার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করছেন।

বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি নিয়ে অনেক বিদ্যায়তনিক গবেষণা হয়। এর অধিকাংশই সাধারণের বোধ্য নয়। আনিসুজ্জামানের 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯১৮)' শীর্ষক গবেষণার গ্রন্থরূপ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, মুনতাসীর মামুনের *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ* ও মোরশেদ শফিউল হাসানের *পূর্ববাংলার চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০): দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া* গবেষণাগ্রন্থ হিসেবে বিদ্যায়তনিক মহলের কাছে সমাদৃত হয়েছে। এই বইগুলো সাধারণ সমাজসন্ধানী পাঠকের কাছেও আদরযোগ্য বলে তিনি মনে করেন। বইগুলোতে বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক বিবর্তনের চিহ্ন ধরা আছে। রাজনীতিকদের প্রতি তাঁর আহ্বান – এই গবেষণাকর্মগুলো যেন তাঁরা পাঠ করেন। এই ধরনের গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য ও বিশ্লেষণ তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণে সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করেন।

রাজনীতি ও দুর্নীতি বিষয়ক কথাবার্তা বইয়ের আরেকটি মূল বিষয় হলো রাজনীতি। এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত 'নেতা ও জনতা: ও জনতার কাঙ্ক্ষিত সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিত' রচনায় রাজনৈতিক নেতাদের কী করণীয় আর তারা বাস্তবে কী করেন সে-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এতে তিনি নেতার দায়িত্ব-কর্তব্য নির্দেশ করে তাঁর নিজের প্রত্যাশার কথা বলেছেন। এ বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ: সংখ্যায় নেতারা মুষ্টিমেয়, আর জনতা

অপরিমেয়। অথচ মুষ্টিমেয়ের যোগ্যতা ও কৃতির ওপর নির্ভর করে অপরিমেয়ের ভাগ্য। তবে অপরিমেয় জনমানুষ দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিইবা পেতে পারে! মুষ্টিমেয় নেতারা মতলব মতো সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে নিজেদের ভাগ্যই গড়ে নেয়; জনতার দুর্ভাগ্যের মূল্যেই নেতারা সৌভাগ্যের অধিকারী হয় ও হয়েছে। তিনি আরও মনে করেন, নেতাদের অন্যায় সুযোগ-সুবিধার পথ বন্ধ করতে না পারলে জনতার ভাগ্যোন্নয়ন অসম্ভব। এখানেই জনতার দায়িত্ব। কিন্তু অসচেতন ও অসংগঠিত জনতা তো অসহায়। সেই অসহায় জনতাকে সচেতন ও সংগঠিত হওয়ায় সহায়তা করার দায়িত্ব অনেকাংশেই বর্তে সচেতন বুদ্ধিজীবীদের ওপর। যতীন সরকার আশাবাদী মানুষ। এই রচনাতেই তাঁর এই প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে যে, বুদ্ধিজীবীরা যেমন জনতাকে প্রকৃত নেতার প্রতি সশ্রদ্ধ ও অনুগত হতে শিক্ষা দেবেন, তেমনি সকল নেতাকে সংযত রাখার জন্য উপযুক্ত লাগাম ও চাবুক জনতার হাতে তুলে দেবেন।

স্বাধীনতা লাভের অল্পকাল পর থেকেই এমন একটা ধারণার বিস্তার ঘটল যে, 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বাভাবিক পরিণতিই বাংলাদেশ রাষ্ট্র।' এই ধরনের মতলবি ধারণা যারা প্রচার করছে তাদেরকে যতীন সরকার আখ্যা দিয়েছেন জ্ঞানপাপী বলে। কারণ, এই ধরনের কথার মধ্যে বাঙালির শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সুদীর্ঘ সংগ্রামকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। পাকিস্তানি জাতীয়তার অসারতা পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই ধরা পড়েছিল বাঙালিদের মধ্যে। তাঁর মতে ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটিই ছিল ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বাঙালিরা এই ব্যত্যয়ের প্রতিকার করতে গিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছিল। পাকিস্তানপন্থিদের একটা অংশ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অসাম্প্রদায়িক, শোষণমুক্ত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন তার সম্পূর্ণ উল্টো প্রত্যাশায় স্বাধীন বাংলাদেশে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে চায় বাংলাদেশি পাকিস্তানপন্থিরা। তিনি বলেছেন বাংলাদেশ আমলের লাহোর প্রস্তাব আন্দোলনকারীদের ভাবখানা এই যে, লাহোর প্রস্তাবে তো পাকিস্তান নামটি ছিল না; লাহোর প্রস্তাব ছিল মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। এখন রাষ্ট্রের বাংলাদেশ নাম হয়েছে তো কী হয়েছে! এটা মুসলমানদের রাষ্ট্র। মুসলমানদের রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করবার জন্যই এই লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নকারীরা বাংলাদেশে

নতুনভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটাতে চান। এই মনোভাব থেকেই তাঁরা বলেন পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না। কিন্তু যতীন সরকার এই দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ নিষ্কাশন করে এনেছেন 'পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না?' – এই বাক্যটি থেকে। রচনাটিতে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন দ্বিজাতিতত্ত্বের এবং সাতচল্লিশ-উত্তর 'পাকিস্তানি' জাতীয়তার অসারতাকে। তিনি মনে করেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানবাদী চেতনা থেকে মুক্তি লাভ করেছে। কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এর প্রতিটি অসংগতি বাঙালিদের জীবনযাপনে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে বাঙালিদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিতে থাকে পাকিস্তানবাদের সকল ভ্রান্তি।

'বাংলাদেশের তিনটি যুগান্তর' রচনায় তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, পরাক্রান্ত মদগর্বী সাম্রাজ্যবাদকে পরাভূত করে আমাদের অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে হবে। কাজটি খুবই কঠিন। বাংলাদেশের তিনটি যুগান্তরেই কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ ঘরের শত্রু বিভীষণদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, কী করে আমাদের অর্জিত স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিত করেছে তা তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। 'আইনের শাসন মানেই ন্যায়ের শাসন'–এই কথা যে সত্য নয় তা তিনি দেখিয়েছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, আইন নিজের গতিতে সবসময় চলে না। তাঁর মতে, 'আইনের চোখে সবাই সমান' কথাটি ধূর্ত ধনতন্ত্রেরই সোচ্চার ঘোষণা। ঔপনিবেশিক নিগড় থেকে আপাত মুক্তি ঘটলেও আমরা ন্যায়ের শাসনাধীনে আসতে পারি নি। এর থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শাসিতদের সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি।

বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের শক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের মালিকানা অর্জন করেছে; মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে; অথচ এই মালিকানার প্রতিনিধি হিসেবে জনগণ যাদের নির্বাচিত করে তারাই শক্তিশালী হয়ে উঠে দুর্বল জনগণের ওপর চালায় ব্যাঘ্রতন্ত্র। বিমূঢ় জনগণ দীর্ঘকাল ধরে ব্যাঘ্রতন্ত্রের কবলে পড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়েছে। যতীন সরকার মনে করেন, জনগণ এই বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠছে। হয়ে উঠছে প্রতিবাদী। বিগত তিন দশকেরও বেশি সময়ে ধরে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তিনি মনে করেন, বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থাটি আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েও চলতে

পারে না। নতুন ব্যবস্থার নকীব বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাব ঘটবে। শ্রমজীবীসহ সকল প্রাকৃতজনের বৈপ্লবিক অভ্যুদয়ই এখন সময়ের দাবি।

যতীন সরকার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় আস্থাশীল। প্রতিটি ধর্মের যথাযথ মর্যাদা রক্ষার জন্য ধর্মকেও রাষ্ট্রনিরপেক্ষ হতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে কোনো ধর্ম বা ধর্মাবলম্বী মানুষই কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের সীমায় আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। এই অর্থে ধর্মমাত্রই রাষ্ট্রনিরপেক্ষ। আর সে-কারণেই তিনি মনে করেন প্রকৃত ধার্মিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন মানবতাবাদী। জনগণকে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামে শামিল হতে হবে। 'বিশ্বায়ন', 'মুক্তবাজার', প্রভৃতি শব্দের অন্তরালে যে প্রকৃতপক্ষে 'সাম্রাজ্যবাদ' ও 'পুঁজিবাদী' ব্যবস্থাই লুক্কায়িত তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের নতুন নতুন ফন্দি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। 'মুক্তবাজার অর্থনীতি'র বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের পূর্বতন অভিপ্রায়কে নতুনভাবে বাস্তবায়নের প্রয়াসকে রুখতে হবে। আত্মঘাতী হতে না চাইলে সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' আর 'সমাজতন্ত্র'-এর মতো স্তম্ভদুটোকে কিছুতেই উপড়ে ফেলতে দেয়া যাবে না। সমাজ থেকে যাঁরা দারিদ্র্য দূর করতে চান তাঁদের অধিকাংশই দারিদ্র্য সৃষ্টিকারী সমাজব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কিছু বলেন না। যতীন সরকার তাঁদেরকে স্থিতাবস্থার সমর্থক মনে করেন। এই ধারার বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্য চলমান সমাজব্যবস্থাকেই খানিকটা মেরামত করে চালু রাখা। তাঁরা দারিদ্র্যের সীমানাটাকে খানিকটা সীমিত রাখতে চান নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার স্বার্থেই। প্রসঙ্গত, তিনি প্রাচীন নীতিবেত্তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁরা বলতেন সর্বনাশ যখন আসন্ন হয়ে ওঠে তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাদের সঞ্চয়ের অর্ধেক ছেড়ে দেয়। কারণ অর্ধেকের মায়া ছাড়তে না পারলে তাদের পুরোটাই হারাতে হয়। তিনি আশা করেন, যাঁরা দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠানোর কথা বলছেন, তাঁদের কথার অসারতা কিছু সময় পার হলেই দারিদ্র্যের শিকার হওয়া মানুষেরা অনুভব করতে পারবেন এবং এর প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের কার্যকর পথে অগ্রসর হবেন।

রাজনীতি ও দুর্নীতি বিষয়ক কথাবার্তা শীর্ষক বইয়ে সাম্প্রতিককালে দুর্নীতির প্রসঙ্গ সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে সামনে এসেছে। এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত 'দুর্নীতি প্রতিরোধে নাগরিক সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে

তিনি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর জরিপলভ্য ফলের ওপর আলোচনা করেছেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, সামাজিক দুর্নীতির প্রতিকারের জন্য এ সম্পর্কিত কিছু তথ্য জড়ো করাই যথেষ্ট নয়। তাঁর মতে দুর্নীতির মূল কারণ হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বর্তমান রূপটিতে ঘটেছে ব্যাপক অবক্ষয়। সমাজের শ্রেণিগত বিভক্তিই দুর্নীতির মনস্তত্ত্বের উৎস বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মোহমুক্তিই হবে দুর্নীতির যথাযথ প্রতিকারের দিকে অগ্রসর হবার পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ। তিনি লক্ষ করেন যে, নিকট অতীতে কানসাটে বা শনির আখড়ায় যে ব্যাপক বিক্ষোভ ঘটেছিল তা ছিল এই সমাজব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো উন্মোচিত হয়ে পড়ার ফল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, বর্তমানে দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী যে অভিযান সাম্প্রতিককালে চলছে তার অসারতা সাধারণ মানুষের কাছে খুব শিগগিরই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একেও তিনি মনে করেন বৈপ্লবিক পরিবর্তনাকাঙ্ক্ষার পথে এক ধাপ এগিয়ে থাকা। সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে তিনি শ্রেণিসংগ্রামের বিশিষ্ট রূপ বলে মনে করেন। নাগরিক সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনই একদিন শ্রেণিসংগ্রামের জঙ্গি রূপ লাভ করবে বলে তিনি আশা করেন।

'বিশ্বায়ন' নামীয় যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়েছে তার স্রোতে আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবীকে পড়তে দেখা গেছে। যতীন সরকার নিঃসন্দেহে তার ব্যতিক্রম। *রাজনীতি ও দুর্নীতি বিষয়ক কথাবার্তা* বইয়ে সামগ্রিক যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে তাকে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদের নতুন ফন্দিসমূহের অনেকগুলোকেই তিনি উন্মোচন করেছেন। তবে তাঁর বক্তব্যে উগ্রতা নেই; যত কড়া ভাষ্যই হোক না কেন, তা তিনি উপস্থাপন করেছেন নরম স্বরে। বিপ্লবী জঙ্গিভাব নেই তাঁর বক্তব্যে। তাঁর আলোচনার কিছু সীমাবদ্ধতাও নজরে পড়ে। 'বিশ্বায়ন' ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক উন্মোচনী বক্তব্য রাখলেও তিনি বিভিন্ন দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খুব স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। যেমন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল উপস্থাপিত জরিপ সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ ভাষ্যে অনেক প্রয়োজনীয় কথাই তিনি বলেছেন, কিন্তু তাঁর মনে প্রশ্ন জাগেনি, কেন বিদেশি অর্থায়নে আমাদের দুর্নীতির জরিপ হচ্ছে? প্রশ্ন জাগেনি, আমাদের দুর্নীতি দূর করতে বিদেশিদের এত মাথাব্যথা কেন? দেশব্যাপী নাগরিক সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণে তাদের এত তৎপরতাই বা কেন? নাগরিক সমাজের আন্দোলন যদি করতেই হয় তাহলে তা করতে হবে

তাদের নিজেদের গরজে। নিজেদের দায় মোচন করতে হলে যদি সত্যিকারের নিজেদের গরজ না থাকে তাহলে তা কখনই অর্থবহ হবে না। বাংলাদেশে 'টিআইবি'র মতো প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগ এ কারণেই অর্থবহ হয় না। তাদের পরামর্শ শুধু কথার কথাই থেকে যায়; তাদের পরামর্শ তেমন কাজে আসে না বা সমাজে তার প্রতি তেমন প্রতিক্রিয়াও দেখা যায় না।

যতীন সরকার *রাজনীতি ও দুর্নীতি বিষয়ক কথাবার্তা* বইটি এমন এক সময়ে লিখেছিলেন যখন তিনি অনেক ঘটনার সাক্ষী এবং পরিণত বয়েসের জীবনাভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এর প্রতিফলন মাঝেমাঝেই ঝিকিয়ে ওঠে। তবে সাহিত্যিক রচনায় সমাজ-রাজনীতিমনস্কতার পরিচয়ে তিনি যতটা মৌলিক ও অন্তর্দৃষ্টিময়, এই বইয়ের রচনার ক্ষেত্রে ততটা নন। তাঁর কোনো কোনো বক্তব্যে বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্যের ভাবগত প্রতিধ্বনিও পাওয়া যায়।

আমার রবীন্দ্র অবলোকন

যতীন সরকার আমাদের সহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণশীল এমন একজন মানুষ ছিলেন যাঁর বিকাশ ঘটেছিল একই সঙ্গে লোকায়ত ও নাগরিক মানসপৃথিবীর মধ্যে। তাঁর চেতনাজুড়ে ক্রিয়াশীল থেকেছে বাংলাদেশের লোকায়তিক স্বজ্ঞা-প্রজ্ঞা এবং যুগপৎ পঠন-পাঠনের মাধ্যমে আহরিত পরিশীলিত আধুনিক-নাগরিক জীবনবোধ। পেশাগত সূত্রে তিনি অধ্যাপনা করেছেন সাহিত্যের। পঠন-পাঠনের সীমানায় রয়েছে যতটা গভীরভাবে সাহিত্য ততটাই দর্শন ও রাজনীতি। বসবাস করেছেন গ্রামজীবন-প্রভাবিত মফস্বল শহরে–যেখানে উন্মূল নাগরিকতা জীবনযাত্রায় কম প্রভাব ফেলে। প্রগতিশীল বামধারার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্বসূত্রে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা দেশে। মিশেছেন সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে। লোকায়ত জ্ঞানের দিকনির্দেশনায় তিনি অর্জন করেছেন বিজ্ঞানদৃষ্টি। ফলে সাংগঠনিকতাসূত্রে একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বলয়ে থাকলেও তাঁর সত্তা ছিল মুক্ত ও বিচরণশীল, এবং উচ্চ কাণ্ডজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত। এইরকম একজন মানুষ যখন বাঙালির চিন্তাজগতে দুকূলপ্লাবীভাবে অস্তিত্বশীল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন তখন তা কৌতূহলকর হয়ে ওঠে বৈকি! তাঁর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা বই *আমার রবীন্দ্র অবলোকন* রবীন্দ্রনাথকে

নতুনভাবে অনুভব করবার উপায় বলে দেয়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি নিজের জীবনোপলব্ধির আলোকে যে পটভূমিতে দেখেন তাতেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে নতুনভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এককথায় *আমার রবীন্দ্র অবলোকন* বইটিকে যতীন সরকারের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত নানা স্বতন্ত্র উপলব্ধির একখানি মালা বলা যায়।

আমার রবীন্দ্র অবলোকন বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১২টি প্রবন্ধ। এগুলো হলো: 'রবীন্দ্র-অবলোকন: "দুইবিঘা জমি"তে দাঁড়িয়ে', 'ইতিহাসগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'রাষ্ট্রবিরোধী রবীন্দ্রনাথ', 'রাজা ও রাজ-ব্যবস্থা :প্রকৃতজন-চেতনায় ও রবীন্দ্র-চেতনায়', 'রবীন্দ্রচৈতন্যে সমাজতন্ত্র', 'রবীন্দ্র-দর্শন ভাববাদের নির্মোকে বস্তুবাদের অন্তঃসার', 'রবীন্দ্র-মানসে প্রতিফলিত লৌকিক ধর্ম ও মানুষের ধর্ম', 'রবীন্দ্রনাথ: সামগ্রিক ও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টি', 'রবীন্দ্রনাথ: বেঁচে থাকার মন্ত্রসাধক', 'রবীন্দ্রনাথের নিন্দা ও নান্দী এবং হৃদয়বাঁধের ছিদ্র', 'কবিগুরুর নববর্ষভাবনা: জীবনের গোধূলি বেলায়', ও 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে'। এই বারোটি প্রবন্ধে লেখকের মুক্ত সত্তার চুম্বকে রবীন্দ্রনাথের সামগ্র্যকেই অনুভব করা হয়েছে বলা যায়।

আমার রবীন্দ্র অবলোকন যথার্থই যতীন সরকারের নিজস্ব রবীন্দ্রাবলোকন। নিজস্ব–কারণ, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অবলোকন অন্যের মতের সহযোগিতার চেয়ে অন্যের সঙ্গে ভিন্নমতের মাধ্যমে গড়ে উঠতে গিয়ে নিজস্ব হয়ে উঠেছে। এই রচনাগুলোকে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে গবেষণামূলক বলা যাবে না। অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাপক পঠন-পাঠন না থাকলে এই ধরনের রচনা যে লেখা সম্ভব নয় তা বোঝা যায়। এক কথায়, তিনি রবীন্দ্রজীবন ও সৃষ্টিশীলতার নানা স্বরূপ একান্ত নিজের সমগ্রসত্তা দিয়ে অনুভব ও আবিষ্কার করেছেন। আরও একটু পরিষ্কার করে বলা যায় যে, যতীন সরকার তাঁর নিজের সমগ্রসত্তা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্রসত্তাকে উপলব্ধি করেছেন। এই রচনার শুরুতে লেখকের যে জীবনপটভূমি তুলে ধরা হয়েছে, তাতে তাঁর সমগ্রসত্তার অভ্যন্তরের বিচূর্ণিত অনুষঙ্গের তাৎপর্যকে হয়তো খানিকটা অনুভব করা যায়। সেই অনুভব থেকে বর্তমান লেখকের কাছে বইটিকে মনে হয়েছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

যতীন সরকার সারা জীবন বাম রাজনীতির বলয়ে বিচরণশীল ছিলেন। তারুণ্যের দিনগুলোতে তিনি লক্ষ করেছেন যে, রবীন্দ্রানুভবের ব্যাপারে বামদের অনেকের মধ্যেই বিরূপতা ছিল। একই বলয়ের অধিবাসী হয়েও

যতীন সরকারের মনে সে-রকম বোধ জন্মায় নি। বরং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি 'সামাজিক বাস্তবতার একান্ত মূর্ত ও স্পষ্ট প্রকাশ, এবং একই সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের আর্তি ও আকুলতার সুনিপুণ উদ্ঘাটন' লক্ষ করেন ['রবীন্দ্র-অবলোকন: "দুইবিঘা জমি"তে দাঁড়িয়ে', পৃ. ১৪]। তিনি 'দুইবিঘা জমি' কবিতায় প্রকাশিত ভাষ্যে অনুভব করেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রবল কাণ্ডজ্ঞান'কে যা, তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথকে সারাজীবন আত্মসচেতন করে রেখেছে এবং সেই আত্মসচেতনতাই তাঁকে অন্যের অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কেও সচেতন করে তুলেছে ['পূর্বোক্ত, পৃ. ২১]। যতীন সরকারও যে রবীন্দ্রনাথকে এভাবে অনুভব করতে পারলেন তার মূলে ক্রিয়াশীল রয়েছে জীবন-অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য-পরিশ্রুত তাঁর নিজের 'প্রবল কাণ্ডজ্ঞান'। রবীন্দ্রনাথের প্রবল কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় তিনি খুঁজে পান তাঁর 'ইতিহাস-চেতনা'র মধ্যেও! যতীন সরকারের ভাষায়,

> তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) মনীষার দীপ্তি ইতিহাসের অনেক আঁধার কক্ষকেও আলোকিত করে তুলেছে। কবিতা-উপন্যাস-নাটকের মতো সৃষ্টিশীল সাহিত্যে যেমন তিনি তীব্র ইতিহাস-বোধের পরিচয় রেখেছেন, তেমনি নিছক তত্ত্ব আলোচনাতেও ইতিহাস-ব্যাখ্যার অনেক মৌলিক সূত্রের সংযোজন ঘটিয়েছেন। তাই ইতিহাসের পাঠ নিতেও যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্বকে অঙ্গীকার করে নিই, তাহলেও ঠকবার আশঙ্কা তো নেই-ই, বরং লাভের সম্ভাবনা প্রচুর। ['ইতিহাসগুরু রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ২৩]

এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে অতীতের জীবনপ্রবাহের মর্ম অনুভবে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি লক্ষ করে। কেবল এই প্রবন্ধেই নয়, অন্যান্য প্রবন্ধেও যতীন সরকার অনেকগুলি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসদৃষ্টির পরিচয় তুলে ধরে তাঁর এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেন। যেমন 'রাষ্ট্রবিরোধী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের নিম্নরূপ উদ্ধৃতি দেন,

> চিরদিন ভারতবর্ষ এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা–গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে

প্রতিষ্ঠিত করেছে। পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজশাসন তাকে অধিকার করলে। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দীঘিতে জল গেল শুকিয়ে, জীর্ণ মন্দিরে শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশ্বত্থ গাছ, জাল-জালিয়াতি মিথ্যা মোকদ্দমাকে বাধা দেবার কেউ কিছু রইল না, রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল। [পৃ. ৩৫]

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ইতিহাস-চেতনার পরিচয় যতীন সরকার বারবার অনুভব করেন। সমাজতন্ত্রী রাজনীতির সংগঠক ছিলেন বলে সমাজতন্ত্রের একটি অপেক্ষাকৃত শৃংখলাপূর্ণ ধারণার সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির অযান্ত্রিকতা তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষিত করে। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির পক্ষে যতীন সরকার নিম্নরূপ যুক্তি পরিবেশন করেন:

কল্পনাকুশল কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ দেশের অতীত ও বর্তমান বাস্তবকে একান্ত স্পষ্ট রূপে দেখতে পেরেছিলেন। আর নিজেদের বাস্তববুদ্ধির গোমরে যাদের পা পড়ে না আমাদের দেশের রাজনীতিকরা চোখে পশ্চিমা রাষ্ট্রতন্ত্রের ঠুলি এঁটে বসেছিলেন বলে আসল বাস্তবের কিছুই দেখতে পান নি। রাজনীতিক নেতারা বিদেশী রাজ তাড়িয়ে স্বরাজ আনতে চেয়েছিলেন। সেই স্বরাজ মানে নেতার নিজেরই রাজা হওয়া, দেশের সকল মানুষকেই রাজা বানানো নয়, সর্বত্র 'সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত' করাও নয়। বিদেশি তাড়িয়ে দেশে তাঁরা 'রাষ্ট্রতন্ত্র' বানাতে চেয়েছিলেন; দেশে যে আগে রাষ্ট্রতন্ত্রের বদলে 'সমাজতন্ত্র' ছিল, সেকথা বোঝার ক্ষমতাই তাদের ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'সমাজতন্ত্র' বলেছিলেন, সেটি ইংরেজি 'স্যোশালিজম'-এর বাংলা অনুবাদ মাত্র নয়। এই সমাজতন্ত্রে স্যোশালিজম অবশ্যই অঙ্গীকৃত, স্যোশালিজমের চেয়ে অনেক বড়। সেই স্যোশালিজমেই ছিল আসল 'গণতন্ত্র', যে গণতন্ত্রের অবস্থান বিলিতি 'ডেমোক্রেসি'র অনেক অনেক উপরে। সে গণতন্ত্রে একালীন রাষ্ট্রতন্ত্রের ভোটাভুটি ছিল না, কিন্তু গণমানুষের প্রকৃত অংশীদারিত্ব ছিল। [পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬]

যতীন সরকার উপলব্ধি করেছেন যে, রেনেসাঁসের মর্মচেতনা রবীন্দ্রনাথকে পথ দেখিয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথ সামাজিক বাস্তবতাকে এমনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বাংলায় রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এ-কথা সকলেই মানবেন যে, এর মানবতন্ত্রী চেতনা রবীন্দ্রনাথেই সমাহৃত হয়েছিল সবচেয়ে তীক্ষ্ণভাবে। মানবতন্ত্রী চেতনার প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথ কল্পজগতের স্রষ্টা হয়েও ছিলেন বাস্তববাদী মানুষ। এই বাস্তব পন্থা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বাংলার লোকায়তিক জীবনোপলব্ধি থেকে। যতীন সরকার এ-কথা স্পষ্টভাবে অনুভব করেন রবীন্দ্রনাথের যাপিত জীবনের ধারাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে। একারণেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে,

> ভাববাদী কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ 'ভাবোন্মাদ' ছিলেন না, বরং ছিলেন অনেক বস্তুবাদীর চেয়েও অনেক বেশি বাস্তব দৃষ্টির অধিকারী।... ভাববাদী পরিপার্শ্ব থেকে যাত্রা শুরু করলেও রবীন্দ্রনাথ হাঁটতে হাঁটতে যে-পথে চলে গিয়েছেন সে-পথ মোটেই ভাববাদের নয়; শেষ পর্যন্ত বস্তুবাদেও সৈদ্ধান্তিক ভূমিতেই নিজেকে তিনি উপনীত করেছেন। ['রবীন্দ্র-দর্শন: ভাববাদের নির্মোকে বস্তুবাদের অন্তঃসার', পৃ. ৭৯]

জীবনব্যাপী বিচিত্র কর্মপ্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে বাস্তবতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাকে অনুভব করে যতীন সরকার সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, 'যৌবনকালে ক্ষণিকার কবিতায় তিনি বাস্তবতাবোধের কারণেই লিখতে পেরেছিলেন, "ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যরে লও সহজে"।' কেবল তা-ই নয়, জীবনের শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছেন, 'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।' এই বিশ্বকে ও সত্যকে তার 'সমগ্র স্বরূপে' দেখতে পারতেন বলেই তিনি 'কঠিনেরে' ভালোবাসতে পেরেছিলেন। যতীন সরকার মনে করেন,

> দেশ-বিদেশ, নূতন-পুরাতন, অতীত-ভবিষ্যৎ ও জীবন-মরণের দ্বন্দ্বময়তার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বিশ্বের স্বরূপ দর্শন। ['রবীন্দ্রনাথ: সামগ্রিক ও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টি', পৃ. ৯৮]

আমার রবীন্দ্র অবলোকন বইটিকে যদি বলা হয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত একটি উৎকৃষ্ট ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-গ্রন্থ তাহলে ভুল হবে না। একে যথার্থ সমালোচনা-গ্রন্থ বলা যাবে এ-অর্থে যে, তা কেবল রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎকর্ষই নিরূপণ করেনি বরং নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেছে।

রবীন্দ্রনাথকে এই 'নতুনভাবে আবিষ্কার'ই প্রকৃতপক্ষে *আমার রবীন্দ্র অবলোকন* বইটিকে বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে এবং মৃত্যুর সত্তর বছর পরও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে-সব সমালোচনামূলক রচনা লেখা হয়েছে তার বেশিরভাগই জুড়ে আছে ভক্তিগদগদ চিত্তের প্রকাশ। যতীন সরকারের *আমার রবীন্দ্র অবলোকন*কেও যে পুরোপুরি ভক্তিপ্রবণতামুক্ত, তা বলা যাবে না। কিন্তু এতে যে অনুরাগের প্রকাশ ঘটেছে তাতে নির্মোহ বিচারশক্তি ও নতুনতরকে আবিষ্কারের তীক্ষ্ণ প্রচেষ্টা রয়েছে। এ আবিষ্কার প্রয়াসে যতীন সরকারের মন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইতিবাচকতারই বেশি সন্ধান করেছে, সীমাবদ্ধতাকে নয়। কিন্তু তাই বলে সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করতে এবং নির্মোহভাবে তা প্রকাশ করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। এটাই বোধহয় এই বইয়ের সবচেয়ে শক্তির দিক। 'রবীন্দ্র-মানসে প্রতিফলিত লৌকিক ধর্ম ও মানুষের ধর্ম' নামের যে রচনাটি এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাতে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে রবীন্দ্রনাথ লৌকিক ধর্মের ভেতর মানুষের ধর্মের মর্ম প্রত্যক্ষ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেছেন যে,

> রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলায় এমন কিছু বস্তুবাদী তত্ত্বদর্শীকে আমরা পেয়েছি যাঁরা বাঙালির লৌকিক ধর্মের স্বরূপ-অন্বেষায় আরো অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, যাঁরা লৌকিক ধর্মের আপাত প্রতীয়মান ভাববাদিতার অন্তরালবর্তী বস্তুবাদসম্মত সত্যবস্তুর উন্মোচন ঘটিয়েছেন। [প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫]

আমার রবীন্দ্র অবলোকন বইয়ের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে, গ্রন্থভুক্ত লেখাগুলোর মধ্যে 'রবীন্দ্রচৈতন্যে সমাজতন্ত্র', 'কবিগুরুর নববর্ষভাবনা: জীবনের গোধূলি বেলায়,' 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে'–এই তিনটি প্রবন্ধ তাঁর পূর্ববর্তী একটি গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও অন্যগুলো বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে বইটিকে একটি অখণ্ড ও সম্পন্ন চিন্তার প্রকাশ বলা যাবে না। বিভিন্ন প্রবন্ধে একই ভাষ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কোথাও কোথাও। যতীন সরকারের অনুরাগীদের কেউ ভবিষ্যতে যথাযথভাবে সম্পাদনা দ্বারা এসব পুনরাবৃত্তি ও অন্যান্য দুর্বলতা কাটিয়ে এই বইয়ের বিন্যাসে আরও সুসামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করায় উদ্যোগী হবেন বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে

যে চারটি বই নিয়ে ওপরে পর্যালোচনা করা হলো তার মধ্যে কেবল *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন* বইটি একটি সম্পন্ন অখণ্ড গ্রন্থ। কারণ এটি যথেষ্ট সংগঠিত। দ্বিতীয় বইটি একই ধারাবাহিকতার একটি সম্পন্ন রূপ বলা য়ায়। শেষের বইদুটির রচনাগুলো অখণ্ড অভিপ্রায়ে রচিত হয়নি বলে এবং রচনাগুলো পৃথক পৃথক কালে ও উপলক্ষে রচিত বলে যথার্থ গ্রথিত নয়। তবে এগুলোর মধ্যেও সামগ্রিক ভাবগত ঐক্য রয়েছে। সবগুলো রচনা যে ব্যক্তিমানুষটির মানসভুবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে তা এক বামপন্থি প্রগতিশীল জীবনদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিমানুষের। এই মানুষটির মন সংস্কারমুক্ত হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দ্বান্দ্বিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। গ্রামীণ নৃতাত্ত্বিক জীবনধারা এই বইগুলোর রচনাকে যে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তা-ও বোঝা যায়। ফলে উচ্চ মননশীল রচনা হওয়া সত্ত্বেও সবগুলো বইয়েরই ভাষা প্রাঞ্জল হতে পেরেছে, কারণ বিষয় উচ্চ স্তরের হলেও এর ভাষিক লক্ষ্য ও উপলব্ধিগত আধার ছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে বইগুলোর লেখকের যাপিত জীবন।

নির্দেশিত রচনাবলী

১. *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন* (২০২৫), সাহিত্যিকা, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫৫ (পরবর্তীকালে বইটির পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণও বেরিয়েছে)।

২. *পাকিস্তানের ভূত দর্শন* (২০১৩), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০০।

৩. *সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাচার* (২০০৭ ফেব্রুয়ারি), বিজয় প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৫।

৪. *আমার রবীন্দ্র অবলোকন* (২০১০), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৮।

স্মরণ: বদরুদ্দীন উমর

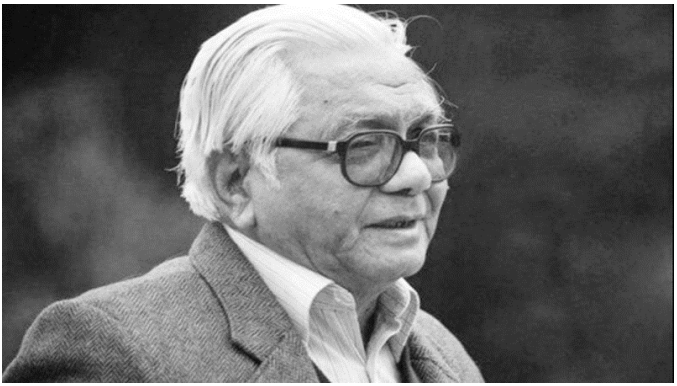

বদরুদ্দীন উমর (১৯৩১-২০২৫)

বদরুদ্দীন উমর: একজন প্রকৃত গবেষক এবং দায়বদ্ধ সংগ্রামীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

রেহমান সোবহান*

আমার আরেক ঘনিষ্ট বন্ধুকে চিরবিদায় জানাতে হলো। প্রায় ষাট বছর আগে এই বন্ধুর সাথে আমি একটি ন্যায্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছিলাম। ১৯৬১ সালের দিকে আমাদের অভিন্ন বন্ধু মুশাররফ হোসেন আমাকে বদরুদ্দীন উমরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। উমর তখন সবে অক্সফোর্ড থেকে রাজনীতি, দর্শন, ও অর্থনীতিতে পিপিই ডিগ্রী করে দেশে ফিরেছেন। মুশাররফ, আমি, এবং উমর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতাম। তবে সমাজতন্ত্র বিষয়ে উমরের ধারণা আমার চেয়ে অনেক বেশি গোঁড়াপ্রকৃতির ছিল এবং তা স্তালিনীয় সমাজতন্ত্রে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। উমর বিশ্বাস করতেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে, স্তালিনের মৃত্যু এবং তাঁর উত্তরসূরি নিকিতা খ্রুশ্চেভ কর্তৃক স্তালিনীয় ঐতিহ্য প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের অধোগতি এবং অবক্ষয়ের সূচনা ঘটেছিল।

পরবর্তী ৬২ বছর ধরে সমাজতন্ত্রের খুঁটিনাটি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের সঠিক ধরন নিয়ে উমরের সাথে আমার আলোচনা অব্যাহত থেকেছে। রাজনীতি ও অন্যান্য নীতি বিষয়ে আমাদের মধ্যে কড়া বাদানুবাদ হয়েছে এবং তা আরও তীব্র হয়েছে যখন আমি বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সাথে জড়িত হই। স্বাধীনতার পর যখন নূরুল ইসলাম, মুশাররফ হোসেন, এবং আনিসুর রহমানের সাথে আমি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করি তখন হলিডে নামক ইংরাজি পত্রিকায় উমর আমাদের কাজের সমালোচনা করে নিয়মিত কলাম লিখতেন, যদিও তা সবসময় সঠিক তথ্যভিত্তিক হতো না। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক বিরুদ্ধাচারিতার সেসব বছর সত্ত্বেও উমর মুশাররফ হোসেনের একজন ঘনিষ্টতম বন্ধু এবং আমারও ভাল বন্ধু থেকে যান।

---

*চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

আমরা তর্ক করেছি এবং ভিন্নমত পোষণ করেছি; কিন্তু আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক সবসময়ই সভ্য ছিল এবং কখনো তা শোভনতার সীমা অতিক্রম করেনি।

উমর শুধু আমার বন্ধুই ছিলেন না। আমার প্রথম স্ত্রী সালমা সোবহানের সূত্রে তিনি আমার আত্মীয়ও ছিলেন। সালমার মা, শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ, এবং উমরের মা, মেহেরবানু ফুপাতো বোন ছিলেন। উমরের নানী এবং সালমার দাদা, অধ্যাপক হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দী উভয়ে ছিলেন ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ, বিখ্যাত গবেষক উবায়েদুল্লাহ উবায়েদির সন্তান। সুতরাং, উমর একটি বনেদী রাজনৈতিক পরিবারের উত্তরসূরি ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ আব্দুল জব্বার খান, পিতামহ আবুল কাশেম খান, এবং পিতা আবুল হাশিম সকলেই প্রায় শতাব্দীব্যাপী বাংলার রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তবে আমাদের এই পারিবারিক সম্পর্ক কদাচিৎ আমাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত সম্পর্কে অনুপ্রবেশ করতো। ১৯৬১ সালে কামাল হোসেন এবং আমি *'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এন্ড ইকনমিক প্রগ্রেস (ন্যাসেপ)'* নামে একটি চিন্তাগার (*থিংক ট্যাংক*) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেই। মুশাররফ হোসেন তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার (সহযোগী অধ্যাপক)। আমাদের এই উদ্যোগে আমরা তাঁকে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রিডার বদরুদ্দীন উমরকে জড়িত করি। সেসময় আমরা পাকিস্তানে রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক চরিত্র এবং তার ফলশ্রুতিস্বরূপ বাঙ্গালীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থেকে বঞ্চিত করাকে মূল দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছিলাম। আমরা আরও বিশ্বাস করতাম যে, দেশের জন্য প্রয়োজন একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমতাধর্মী সমাজব্যবস্থা, যেটা বলতে আমরা নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য উপযোগী একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বুঝতাম। ন্যাসেপের মাধ্যমে আমরা তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য সম্ভাব্য নীতিমালা সম্পর্কে বিতর্কের সূচনা করতে সচেষ্ট হই। সেলক্ষ্যে আমরা গণতন্ত্র, বৈষম্য, শিক্ষা, এবং সম্প্রদায়িকতার চ্যালেঞ্জ নিয়ে বেশ কিছু প্রচারপত্র (*প্যাম্ফলেট*) তৈরি করি। এরমধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক প্রচারপত্রটি তৈরি করেন উমর।

ন্যাসেপের অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় আওয়ামী লীগের উমরের আস্থা ছিল সবচেয়ে কম, যদিও আওয়ামী লীগের তখনকার নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন উমরের মামা (এবং সালমারও মামা)। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যে ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে তার অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট সিয়েটো এবং সেন্টো থেকে বেড়িয়ে আসা। কিন্তু এই বিজয়ের পর সোহরাওয়ার্দী যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন তখন তিনি এই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেন। উমর এই নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর তীব্র সমালোচনা করেন। এ বিষয়ে আমরা অন্যরাও উমরের সাথে একমত ছিলাম। বস্তুত, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশীয় শিক্ষার্থী সংগঠন, মজলিশ, এবং কেম্ব্রিজ রক্ষণশীল সমিতির মধ্যে "এই হাউস সিয়েটো প্রত্যাখ্যান করে" প্রস্তাব নিয়ে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে আমি, অমর্ত্য সেন, এবং আরিফ ইফতেখার এই প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলাম। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মৈত্রী এবং পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ইস্যুতে যখন আওয়ামী লীগ বিভক্ত হয়ে যায়, তখন উমর মওলানা ভাসানী এবং তার নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-র জোরালো সমর্থকে পরিণত হন।

ন্যাসেপে আমরা যারা ছিলাম তাদের মধ্যে উমর সবচয়ে রাজনীতি-মনস্ক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাজনীতি নিয়ে লেখা এবং বিতর্ক করাই যথেষ্ট নয়; বরং, আমাদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ১৯৬৮ সালের দিকে উমর – শুধু খন্ডকালীন নয় বরং সার্বক্ষণিকভাবে – রাজনীতিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য, এটা ছিল তাঁর জীবনের মোড়-পরিবর্তনকারী সিদ্ধান্ত। বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবিদের মধ্যে অনেকে রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছিলেন; তবে তাঁরা একটা করেছিলেন তাদের পেশা উপার্জনের উপায় পরিত্যাগ না করে। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই সার্বক্ষণিকভাবে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন ন্যাপের নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। উমরের জন্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থ ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ। রাষ্ট্রীয় নীতিমালার বিরুদ্ধে স্বীয় লেখালেখির জন্য তিনি ইতিমধ্যেই পূর্ব-পাকিস্তানের তদানিন্তন গভর্নর মোনেম খানের রোষানলে পড়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি সহ অন্য কয়েকজন শিক্ষকের জন্যও একই

পরিণতি ঘটেছিল উমর কিংবা তাঁর স্ত্রী কারোরই আয়-প্রদানকারী কোনো সম্পত্তি ছিল না। তাদের পরিবারের জন্য আয়ের একমাত্র উৎস ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত উমরের বেতন। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ তাঁর পরিবারের জীবিকার জন্য গুরুতর পরিণতি ডেকে আনে। সেময় স্ত্রী ছাড়াও উমরের ছিল এক ছেলে এবং দুই মেয়ে। নিয়মিত আয়ের অনুপস্থিতির এই সমস্যা উমরের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে, উমরের স্ত্রী সুরাইয়া স্বাধীনতার পর একটি ব্যাংকে চাকুরী পান এবং তিনিই পরিবারের মূল উপার্জনকারীর ভূমিকা পালন করেন। ব্যাংক থেকে অবসর গ্রহণের পর সুরাইয়া কিছু বছর আইন-ও-শালিশ কেন্দ্রে কাজ করেন। উমরের ছেলে, সোহেল, এখন একটি কোম্পানিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সে পরিবারকে সহায়তা করতে সক্ষম হয়।

তবে এটা বলা ঠিক হবে না যে, উমর সম্পূর্ণত পরিবারের অন্য সদস্যদের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অবিরাম লেখক। বাংলাদেশ, ভারত, এবং বহির্বিশ্বে তাঁর প্রচুর পাঠক-পাঠিকা ছিলেন। (এ বিষয়ে পরে আমি আরও কিছু বলবো।) তার লেখা বইপত্র থেকে প্রাপ্ত রয়ালটি বাবদ অর্থও তাঁর পরিবারের ভরণপোষণে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা তাঁর প্রামাণ্য বই ষাট বছর পর এখনও বাজারে চালু আছে এবং রয়ালটি প্রদান করে আসছে। অন্যান্য বই থেকেও তিনি ভাল রয়ালটি পেয়েছেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, উমরের রাজনীতিতে সার্বক্ষণিকভাবে যোগ দেওয়ার নীতিনিষ্ঠ এবং বীরোচিত সিদ্ধান্ত একটি দুঃসময়ে গৃহীত হয়। তিনি রাজনীতিতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার জন্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ১৯৬০-এর দশকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মস্কো-পিকিং বিভক্তির জেরে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (ইপিসিপি) বেশ কয়েকবার ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। এই বিভক্তির ফলে ইতিপূর্বের ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক সমর্থিত ন্যাপের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা শক্তিশালী বাম আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইপিসিপির পিকিংপন্থী অংশ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের পেছনে থাকে। অন্যদিকে মস্কোপন্থী অংশ মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপের সাথে থাকে।

১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে পিকিং-পন্থী ন্যাপ-ইপিসিপি চার ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি অংশ ছিল ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ। দ্বিতীয়টি ছিল মোহাম্মদ তোয়াহা এবং আব্দুল হকের নেতৃত্বাধীন অংশ, যার সাথে উমর যোগ দেন। তৃতীয় ছিল মতিন-লাউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন অংশ; এবং চতুর্থ ছিল ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আবুল বাশার এবং কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন অংশ। সে সময় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে এবং বঙ্গবন্ধুর ছয়-দফা দাবীর মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে সে বিষয়ে চীনপন্থী দলসমূহ পরিষ্কার ছিল না। স্বীয় লেখালেখির মাধ্যমে উমর বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের সাথে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হওয়ার জন্য বামপন্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু চীনপন্থী বাম দলসমূহ তাঁর এই অভিমত ও আহ্বানের সাথে পুরোপুরিভাবে সম্মত হয় না। এ বিষয়ে উমর তাঁর দি ইমারজেন্স অফ বাংলাদেশ শীর্ষক বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেন যে,

> ভাসানীকে চীন সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তিনি ১৯৬৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর চীনের পথে রওয়ানা হন। পথে তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খানের সাথে দেখা করেন এবং এক ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হন। এসময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আইয়ুব খানের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পরিবর্তন হয় এবং ভাসানীর চীন সফর ছিল আইয়ুব খানের সাথে তাঁর এই নবলব্ধ সম্পর্কের ফলশ্রুতি। এই সম্পর্ক তাঁর (ভাসানীর) সাথে চীনপন্থী কমিউনিস্টদের বন্ধন আরও শক্তিশালী করে এবং আইয়ুব খানের প্রতি তাঁর মনোভাবকে নমনীয় করে। আইয়ুব খানকে তিনি এই অঞ্চলের মধ্যে একটি 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী' উপাদান হিসেবে গণ্য করেন (পৃ ৮৩)।

মুক্তিযুদ্ধের সময় উমর তোয়াহার সাথে জড়িত ছিলেন; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তোয়াহার দলের ভূমিকার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত এই দল ত্যাগ করেন। উমর স্বাধীনতার ৫৪ বছরের বেশিরভাগ সময় দেশের বামপন্থী আন্দোলনের সাথে তৃণমূল পর্যায়ে এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জড়িত ছিলেন। তাঁর এবং অধ্যাপক শহিদুদ্ধরের নেতৃত্বে গঠিত একটি বাম গ্রুপ পরিচালনা করেন। একসময় উমর তাঁদের একটি আলোচনা গ্রুপে কৃষি সংস্কার নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানান। এ বিষয়ে কিছুকাল আগে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। উমরের রাজনৈতিক

জীবনের শেষের দিক সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা নেই। তবে বাম রাজনীতি বিভক্ত এবং অকার্যকরই থেকে যায়; ফলে মনে হয় না যে, তাঁর অংশগ্রহণের ফলে বাম রাজনীতি তেমন অগ্রসর হতে পেরেছিল।

উমরের রাজনৈতিক সক্রিয়তার ফলাফল যাই হোক না কেন, একজন গবেষক এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিরাজ করেন। গবেষক হিসেবে উমরকে আমি বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতির ঐতিহাসিক বলে মনে করি। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের উপর তাঁর গ্রন্থ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্ব নিয়ে এ যাবত সর্বাধিক প্রামাণ্য কাজ। তাঁর এই কাজটি নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে রচিত; তবে, বিশেষত তাজউদ্দিন আহমেদের বিস্তারিত ডায়রি এবং অন্যান্য প্রাথমিক সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে রচিত গবেষণা হিসেবে এটা অতুলনীয়। কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন এবং আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া গভীর গবেষণার ভিত্তিতে রচিত এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে উমরের ভালবাসার শ্রম এবং প্রকৃত গবেষকের একটি ফসল। ষাট বছর পরও এই বইটি বাজারে চালু এবং উমরের মৃত্যুর পরও বহুকাল পঠিত হবে।

রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ে উমরের অন্যান্য প্রকাশনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার মধ্যে একটি হলো দুই খণ্ডের *দি ইমারজেন্স অফ বাংলাদেশ* (OUP ২০০৪)। এই গ্রন্থের সূচনা হয় সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত নিবন্ধ আকারে। আমি মনোযোগের সাথে এগুলো পড়ি এবং এগুলোতে প্রদত্ত তথ্য এবং বিশ্লেষণের মান দ্বারা চমৎকৃত হই। আমি মনে করি যে, এগুলো বর্তমান প্রজন্ম, যাঁদের বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে স্মৃতি আদৌ নেই অথবা থাকলেও তা সীমাবদ্ধ, তাদের ব্যাপকভাবে পড়া প্রয়োজন। সেজন্য আমি উমরকে এই নিবন্ধগুলি একত্র করে রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ক বই হিসেবে প্রকাশ করার পরামর্শ দেই। ইতিহাস সংক্রান্ত তাঁর ভার্শান প্রকাশে বাংলাদেশের প্রকাশকেরা উৎসাহী হবে কিনা এ বিষয়ে উমর নিশ্চিত ছিলেন না। সেজন্য আমি প্রস্তাব করি যে, আমি বইটি প্রকাশের বিষয়ে করাচিস্থ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে (ওইউপি)'র পাকিস্তান শাখার সাথে যোগাযোগ করবো। আমার ধারণা ছিল যে, যেহেতু বইটি ১৯৭১ পর্যন্ত পুরো পাকিস্তান পর্ব নিয়ে রচিত, সেহেতু পাকিস্তানেও এই বইটি ভাল বাজার পাবে।

এই ধারণা থেকে আমি পাকিস্তান ওইউপি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আমিনা সাঈদের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি আমার পূর্ব-পরিচিত ছিলেন। তিনি পাকিস্তান ওইউপি'কে বিশ্বের একটি স্বীকৃত ব্রান্ডে পরিণত করেছিলেন, যার ফলে এই প্রকাশনা সংস্থার বই শুধু পাকিস্তান এবং ভারতের নয় বরং সারা বিশ্বের বইয়ের দোকান এবং পাঠাগারে স্থান পেত। আমিনা আমার প্রস্তাবে সহজেই রাজী হন এবং ওইউপি'র সম্পাদক এবং উমরের সাথে কিছু বিবাদ নিরসনের পর এই বইয়ের উভয় খন্ড প্রকাশিত হয় এবং তা সমাদর লাভ করে। পাকিস্তানে এই বই বিক্রির সম্ভাবনা নিঃশেষিত হওয়ার পর পাকিস্তান ওইউপি এই বইয়ের কপিরাইট উন্মুক্ত করে দেয় এবং তখন ভারতের কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস এই বই পুনরায় প্রকাশ করে। আমার স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে আমি বইয়ের উভয় খন্ড পুনরায় পড়ি, অনেক কিছু শিখতে পারি, এবং ব্যবহার করি। এটা বাম-ভাবাদর্শের প্রেক্ষিত থেকে চমৎকার গবেষণার ভিত্তিতে লেখা একটি বই। বস্তুত, বইটির প্রথম খণ্ডের উপ-শিরোনাম হলো *পূর্ব পাকিস্তানে শ্রেণি সংগ্রাম ১৯৪৭-৫৮*। উমরের রাজনৈতিক বিশ্বাস এই বইয়ে পরিবেশিত গবেষণার ব্যাপ্তি এবং গভীরতাকে ক্ষুণ্ন করেনি।

গবেষণা এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তার পাশাপাশি উমরের অন্য যে বৈশিষ্ট্য, তা হলো তিনি একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন। নিজের পরিবারকে তিনি অত্যন্ত মূল্য দিতেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরিবারের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। স্ত্রী সুরাইয়া ছিলেন তাঁর জীবনের স্তম্ভ। সুরাইয়া শুধু পরিবারের মূল উপার্জনকারী ছিলেন না, মাঠের কাজে উমরের লম্বা সময় ধরে ঘর ছেড়ে থাকা এবং ঝুঁকিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তাঁর সম্পৃক্ততা পরিবারের জন্য যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করতো তা মোকাবেলায়ও সুরাইয়া স্তম্ভের ভূমিকা পালন করতেন। মুশাররফের স্ত্রী ইনারি এবং সালমা দুজনেই সুরাইয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিলেন এবং সুরাইয়া তাদেরকে বড় বোনের মতো মনে করতেন।

অনেক উত্থান-পতন এবং বিশ্বাসের প্রাবল্য এবং আবেগের কারণে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন সরকারের সাথে এবং এমনকি বিভিন্ন বামপন্থীদের সাথে সংঘাতের মধ্য দিয়ে গেলেও উমর কখনো তাঁর সামাজিক জীবনে ভদ্রতা এবং রসবোধ হারান নি। এ বছরের (২০২৫ সালের) এপ্রিল মাসে যখন তিনি শেষবারের মতো আমার বাসায় আসেন

তখনও তিনি ছিলেন যেন সবচেয়ে তরতাজা। তিনি শ্রবণশক্তি হারিয়েছিলেন, কিন্তু তার ক্ষুরধার চিন্তাশক্তি এবং বাগ্মিতা মোটে হারান নাই। অসুস্থতার কারণে তিনি আমার ৯০তম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি। সেজন্য তিনি একজন পুরানো বন্ধু হিসেবে আমার জন্মদিন উদযাপনে শরীক হওয়ার জন্য আমাকে দেখতে আসেন। তাঁর চুটকিগুলো ছিল রসে ভরা, এবং তিনি হাস্যচ্ছলে লক্ষ্য করেন যে, জীবনে সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা তিনি পেয়েছেন শাসক শ্রেণিশত্রুদের কাছ থেকে নয় বরং বহুধা বিভক্ত বামপন্থীর কাছ থেকে।

বামচিন্তা ও রাজনীতির একজন আপসহীন মহীরুহ হিসেবে উমর স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। নিজের গবেষণা এবং গণসক্রিয়তাকে তিনি নিবেদিত করেছিলেন শ্রমজীবীদের বিভিন্ন সংগ্রামের প্রতি, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত আন্দোলনের প্রতি, এবং গভীর-বিভাজনকারি এবং অশুভ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি। তবে শেষ বিচারে, তিনি চিরজীবী হয়ে থাকবেন তাঁর মহতী গবেষণা কর্মের জন্য।

(*ডেইলি স্টার*'র ২০২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় পূর্ব-প্রকাশিত এবং সম্পাদক নজরুল ইসলাম কর্তৃক ইংরেজি থেকে অনুদিত।)

বদরুদ্দীন উমর চিরন্তন দীপশিখা

রওনক জাহান*

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের সুবাদে বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। আমাদের প্রথম যোগাযোগ হয় লেখালেখির মধ্য দিয়ে। ১৯৬৪ সালে আমার এমএ পরীক্ষার ফল বের হয়। প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হই। এর আগের বছর বিএ (অনার্স) পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণি পেয়েছিলাম। তবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে কোনো পদ খালি না থাকায় আমার তাৎক্ষণিক চাকরির সম্ভাবনা ছিল না। অধ্যাপক রাজ্জাক পরামর্শ দিলেন, আমি যেন বদরুদ্দীন উমরকে লিখি। উমর তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ গড়ে তুলছিলেন। তাঁকে চিঠি লিখলাম। উমর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে রাজশাহীতে প্রভাষকের পদে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব পাঠালেন। দীর্ঘ বেকারত্বে আত্মসম্মানবোধ ক্ষয়ে যাচ্ছিল। তাঁর চিঠি আমাকে উদ্দীপিত করেছিল। তবে রাজশাহী যাওয়ার আগে আরেক সুখবর এলো। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাঁচ শিক্ষার্থীর একজন হিসেবে আমি তিন বছরের জন্য বিদেশে উচ্চশিক্ষার রাষ্ট্রীয় বৃত্তি পেলাম। আমি সেই বৃত্তি নিয়ে পিএইচডির জন্য হার্ভার্ডে রওনা হলাম। যদিও আমার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া হয়ে ওঠেনি, তবু উমরের দেওয়া প্রভাষক হওয়ার প্রস্তাব আমার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছিল। বিদেশে চ্যালেঞ্জিং শিক্ষাযাত্রা শুরু করার আগে এই আত্মবিশ্বাস জরুরি ছিল।

উমরের সঙ্গে আমার পরবর্তী আলাপও লেখালেখির মাধ্যমেই। এবার তাঁর তিনটি বইয়ের মাধ্যমে 'সাম্প্রদায়িকতা' (১৯৬৬), 'সংস্কৃতির সংকট' (১৯৬৭), ও 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' (১৯৬৮)। ১৯৬৮ সালে মাঠপর্যায়ে গবেষণার জন্য ঢাকায় থাকার সময় আমি বইগুলো সংগ্রহ করি। এগুলো আমাকে ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে বাঙালির জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের বিকাশ বুঝতে সাহায্য করে। হার্ভার্ডের পিএইচডি থিসিসে (১৯৬৯) আমি উমরের যুক্তি ব্যবহার করি। পরে সেই গবেষণা কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে *পাকিস্তান: ফেইলিওর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন*, (১৯৭২) শিরোনামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। সেখানে বিশেষভাবে

*সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

উল্লেখ করি উমরের প্রবন্ধ 'মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন'-এর কথা। প্রবন্ধটি আমাকে দেখিয়েছিল, ভাষা আন্দোলন কেবল এলিট শ্রেণির আন্দোলন ছিল না, বরং এটি ছিল সর্বজনীন জনপ্রিয় এক দাবি, যে দাবি এলিট ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল।

এই তিনটি প্রভাবশালী বইসহ তাঁর সব লেখাতেই আমি দেখেছি, উমর সবসময় রাজনীতির উৎপত্তি ও বিকাশকে সমাজ ও শ্রেণিগত ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত করে বিশ্লেষণ করেছেন। আমি নিজে মার্কসবাদী নই এবং বিশ্লেষণে মার্কসবাদী কাঠামোও ব্যবহার করি না। তবু উমরের লেখালেখি আমাকে সবসময় উপকৃত করেছে। তিনি সবসময় মনে করিয়ে দিতেন তথ্য ও পরিসংখ্যান নিরপেক্ষ নয়, এগুলোকে শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। এই শিক্ষা আমি মনে রাখার চেষ্টা করেছি। নিজের লেখাতেও আমি অনুসন্ধান করেছি কীভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ রাজনৈতিক বিকাশকে প্রভাবিত করে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ফিরে আমি এশিয়ান সার্ভে পত্রিকার জন্য সদ্য জন্ম নেওয়া রাষ্ট্রের বার্ষিক পর্যালোচনা লিখতে শুরু করি। তখনও উমরের লেখালেখি আমাকে দারুণ সাহায্য করেছে। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত ১৯৭২ সালের পর্যালোচনায় আমি বাংলাদেশের সংবিধানের সমালোচনা তুলে ধরি। সেখানে আমি ব্যবহার করি উমরের দুটি প্রবন্ধের যুক্তি ব্যাবহার করি। এ প্রবন্ধগুলি হলো: 'দি প্রপোজড কন্সটিট্যুশান: এ ফান্ডামেন্টাল মেজার এগেইন্সট সোশ্যালিজম, ডেমোক্র্যাসি, এন্ড সেকুলারিজম' (*হলিডে*, ২২ *অক্টোবর* ১৯৭২) 'এ কন্সটিট্যুশান ফর পারপেচুয়াল এমারজেন্সী' (হলিডে, ২৯ অক্টোবর ১৯৭২)। একইভাবে, ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারির *এশিয়ান সার্ভেতে* প্রকাশিত ১৯৭৩ সালের রাজনৈতিক পর্যালোচনায়ও আমি উমরের আরেকটি প্রবন্ধ ব্যবহার করি। সেটা হলো 'দি পলিটিক্যাল সিগনিফিক্যান্স অফ দি এমারজেন্সী প্রভিশনস' (হলিডে, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩)। তখন উমর ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে সরব ও স্পষ্টভাষী সমালোচক। নিয়মিত তাঁর লেখা পড়ার অপেক্ষায় থাকতাম। সেগুলো আমার নিজের বিশ্লেষণেও ব্যবহার করতাম।

ষাট দশকে তিনি প্রকাশ করেন ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি', যা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি ব্যবহারের মতো নতুন পদ্ধতি দ্বারা তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে ইতিহাসের গবেষণা করা যায়। কোনো আর্থিক সহায়তা বা গবেষণা-সহকারী ছাড়াই তিনি এই বিশাল কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তখন তিনি সক্রিয়ভাবে বামপন্থি রাজনীতিতেও যুক্ত ছিলেন। মোট তিন খণ্ডের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেন তিনি।

পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, যখনই তিনি সময় পেতেন, তখনই তিনি লিখতে বসতেন। এমনকি আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি করতে গিয়ে যে লম্বা সময় গোপনে থাকতে হয়েছে, সেই সময়কেও তিনি লেখালেখির কাজে ব্যবহার করেছেন! দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকজন বিরল রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তিনিও একজন, যিনি কারাবন্দি বা আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার সময়কে ব্যবহার করেছেন ইতিহাস বা স্মৃতিকথা রচনার কাজে; যা অন্য গবেষকদের জন্য অমূল্য আকরগ্রন্থস্বরূপ।

প্রথমবার সরাসরি উমরের সঙ্গে আমার দেখা হয় ১৯৭২ সালে। অধ্যাপক রাজ্জাকের বাসায় এক মধ্যাহ্নভোজে। ১৯৭২-৭৫ এবং পরে ১৯৭৭-৮২ সালের সময়ে আমার দেখা হতো উমর এবং তাঁর স্ত্রী সুরাইয়ার সঙ্গে, হয় অধ্যাপক রাজ্জাক বা অধ্যাপক মুশাররফ হোসেনের বাসায়। লেখালেখিতে তিনি যতই তীক্ষ্ণ সমালোচক হন না কেন, সামাজিক পরিবেশে তাঁকে আমি পেয়েছি আনন্দময়, রসিক, ও সহনশীল একজন মানুষ হিসেবে। ভিন্নমতের মানুষদের সঙ্গেও তিনি সহজে মিশতেন। দারুণ উপভোগ করতেন সুস্বাদু খাবার ও প্রাণবন্ত আলাপচারিতা, যার কোনো অভাব অধ্যাপক রাজ্জাক কিংবা অধ্যাপক মুশাররফের বাসায় ছিল না।

সত্তর দশকের শুরুর দিকে আমি নিয়মিতই যেতাম শান্তিনগরে, বদরুদ্দীন উমরের বাসায়। তখন তিনি ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিয়েও গবেষণা করছিলেন। আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে আমার ধারণা সীমিত ছিল। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় আমি নতুনভাবে ঘটনাগুলোকে দেখতে শিখলাম। আমার মতে, তাঁর দুটি বই, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক' (১৯৭২)

ও 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ' (১৯৭৩) প্রত্যেক ইতিহাসবিদের পড়া উচিত।

১৯৮২ সালে আমি প্রথমে জাতিসংঘে যোগ দিই এবং পরে ১৯৯০ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। আশির দশকের শুরু থেকে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ কমতে থাকে। কেবল কয়েকজনের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক রয়ে যায়। তাদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর রাজ্জাক, ড. কামাল হোসেন ও হামিদা হোসেন, রেহমান সোবহান ও সালমা সোবহান, মুশাররফ ও ইনারি হোসেন। অন্যদের মতো বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গেও যোগাযোগ শিথিল হয়ে যায়।

নব্বই দশকের মাঝামাঝি শুনলাম উমর যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন। আমি তখন তাঁকে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনার দেবার আমন্ত্রণ জানালাম। বাংলাদেশে তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন বামপন্থী রাজনীতিক হিসেবে; কিন্তু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর পরিচয় ছিল গবেষক ও লেখক হিসেবে। কলাম্বিয়ার সাউদার্ন এশিয়ান ইনস্টিটিউটের ইতিহাসবিদ সহকর্মীরাও তাঁর লেখার ভক্ত ছিলেন। ফলে উমরের বক্তৃতায় প্রাণবন্ত এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো।

সেমিনারের পর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি নিউইয়র্কে কোথাও ঘুরতে যেতে চান কিনা। তিনি জানালেন, হারলেম দেখতে চান। সাধারণত দর্শনার্থীরা হারলেম এড়িয়ে চলেন, কারণ এটি আফ্রো-আমেরিকানদের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, এবং বহুদিন ধরে 'বিপজ্জনক' হিসেবে এর কুখ্যাতি ছিল। যেহেতু হারলেম কলাম্বিয়ার কাছেই, আমি সেখানে তাঁকে নিয়ে গেলাম। আমরা ঘুরে দেখলাম বাড়িঘর, বাজার, গির্জা আর বিখ্যাত অ্যাপোলো থিয়েটার। এই থিয়েটার আফ্রো-আমেরিকান বিনোদনের ঐতিহাসিক স্থান। উমর দারুণ আনন্দ পেলেন। কয়েক ঘণ্টা হারলেম ঘোরার পর আমি তাঁকে ডিনারে নিয়ে গেলাম কলাম্বিয়ার শিক্ষকদের প্রিয় এক রেস্টুরেন্টে। সেখান থেকে পুরো ম্যানহাটানের স্কাইলাইন দেখা যায়। উমর সেখানেও সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন এবং রুচিশীল পরিবেশ উপভোগ করেছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত, গত কুড়ি বছরে যখন আমি বাংলাদেশে বেশি সময় কাটাতে শুরু করি, তখন উমরের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করার সুযোগ আর হয়ে

ওঠেনি। প্রফেসর মুশাররফ হোসেন বেঁচে থাকতে আমাকে কথা দিয়েছিলেন, উমরের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে যাবেন। উমর মিরপুরে থাকতেন। আর যাওয়া হলো না।

হঠাৎ গত দুই বছরে আবার তিনবার তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হলো। ২০২৪ সালে প্রথমবার দেখা হয় জ্ঞানতাপস রাজ্জাক ফাউন্ডেশনের বোর্ড মিটিংয়ে। সেখানে ঢুকেই উমর উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, তিনি ভালো শুনতে পান না। পাশে দাঁড়ানো হামিদা হোসেন বললেন, তিনি ভালো দেখতেও পান না। কিন্তু আমরা দেখলাম, উমরের মেধা ও বাকশক্তি এখনও আগের মতোই তীক্ষ্ণ। আমরা তাঁকে লিখিত প্রশ্ন দিতাম, তিনি সেগুলোর জবাব জোরে ও স্পষ্টভাবে দিতেন। সেদিন তিনি চমৎকার মেজাজে ছিলেন। সন্ধ্যার শেষে ইংরেজি, বাংলা, ও উর্দু তিন ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করলেন। সত্যিই এক স্মরণীয় সন্ধ্যা!

উমরের সঙ্গে আবার দেখা হয় বেঙ্গল ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। অধ্যাপক রাজ্জাককে স্মরণ করার জন্য সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা অনেকে সেখানে গম্ভীরভাবে রাজ্জাক স্যারের স্মৃতিচারণ করছিলাম। শ্রোতারা প্রায় বিরক্ত হয়ে উঠছিল। উমর হাস্যরসাত্মক স্মৃতি আর কৌতুকপূর্ণ ঘটনা শুনিয়ে পুরো পরিবেশ প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন।

সবশেষে উমরের সঙ্গে দেখা হয় ২০২৫ সালের এপ্রিলে। রেহমান সোবহানের ৯০তম জন্মদিন উপলক্ষে আমরা তাঁকে মার্চ মাসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারেননি। পরে ছেলে সোহেলকে নিয়ে আমাদের বাসায় আসেন। তাঁকে তখনও আগের মতোই পেলাম তর্কপ্রিয়, রসিক, ও প্রাণবন্ত। আমরা লিখে লিখে প্রশ্ন করছিলাম, আর তিনি সাবলীলভাবে উত্তর দিচ্ছিলেন। সেদিন তাঁর তিনটি মন্তব্য বিশেষভাবে মনে রয়ে গেছে। এক. তিনি বললেন, জীবনে ডানপন্থিদের চেয়ে বামপন্থিদের কাছ থেকেই তিনি বেশি গালমন্দ পেয়েছেন! দুই. নতুন ছাত্র আন্দোলনের দর্শন নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুললেন। বললেন, তাদের মতে তারা না বাম, না ডান, বরং মধ্যপন্থার অনুসারী। উমর বললেন: বাম কী, ডান কী, তা তিনি বোঝেন, কিন্তু মধ্যপন্থার মানে তিনি একেবারেই বোঝেন না। তিন, রসিক ভঙ্গিতে তিনি বললেন, অক্সফোর্ডে বহু বছর থাকার পর যখন তিনি পাকিস্তানে ফিরলেন, তখন

দুটি বিষয় তাঁকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল। এক, চরম দারিদ্র্য আর দুই, মানুষের অসভ্য আচরণ।

আমি উমরকে গভীরভাবে স্মরণ করি। তাঁকে সবসময় মনে রাখব একজন প্রকৃত গবেষক, প্রাণবন্ত আলাপচারী এবং আপসহীন সমাজকর্মী হিসেবে।

(*দৈনিক সমকাল*-এর ২০২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত।)

উমর ভাইয়ের সাথে

আনু মুহাম্মদ*

এক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে যাদের আমি আমার শিক্ষক হিসেবে বিবেচনা করি, যাদের প্রতি আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা, বদরুদ্দীন উমর তাদের অন্যতম। গত কয়েক দশকে যাদের সঙ্গে আমি এ জগৎ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছি এবং তা বাস্তবায়নে কাজ করেছি, বদরুদ্দীন উমর তাদের মধ্যে অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘ ২২ বছর আমরা সাংগঠনিকভাবে একসঙ্গে কাজ করেছি। একই সঙ্গে তাই তিনি আমার শিক্ষক ও সহযোদ্ধা।

আমার ওপর উমর ভাইয়ের চিন্তা ও কাজের প্রভাববলয় অবশ্য তৈরি হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যে অসংখ্য কিশোর-তরুণের মধ্যে নতুন একটি সমাজ-দেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও সক্রিয়তা তৈরি করেছিল, আমি তাদের একজন। স্বাধীনতার পর ক্রমে স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মতো আমার মধ্যেও যে পথ অনুসন্ধান চলতে থাকে, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই বদরুদ্দীন উমরের চিন্তা ও সক্রিয়তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তার সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের বেশ কয়েক বছর আগেই আমি তার লেখালেখির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম।

দুই

১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি আমি ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই। তখন আমার বাসা খিলগাঁও। সাইকেলে প্রতিদিন কলেজে যেতাম। সেই অস্থির সময় কলেজে ক্লাস হতো কমই। সাইকেল থাকায় আমি সে সময় আরো অনেক জায়গায় সময় কাটাতে পারতাম বেশি। বলতে দ্বিধা নেই, সেটাই আমার জন্য বেশি আনন্দদায়ক ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরি, তথ্য ও প্রকাশনা মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগার ছিল আমার নিয়মিত গন্তব্য। এ রকম একদিন, সম্ভবত বর্তমান নাটমণ্ডলে, একটি রাষ্ট্র রাজনীতিবিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন দেখে সেখানে বসলাম।

---

*অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্পাদক *সর্বজনকথা*।

আলোচকদের মধ্যে ছিলেন আহমদ শরীফ ও বদরুদ্দীন উমর। সেদিনই প্রথম তাদের বক্তৃতা শুনি। এর আগে উমর বাংলা একাডেমির পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেনড়এ রকম একটি খবর পত্রিকার পাতায় দেখেই মনে হয় তার ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। এ অনুসন্ধানী ঘোরাঘুরির মধ্যেই, ১৯৭৪ সালে, উমর সম্পাদিত 'সংস্কৃতি' পত্রিকার সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ঘটে।

ওপরের কোনো একটি গ্রন্থাগারেই বদরুদ্দীন উমরের সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িকতা গ্রন্থদ্বয় পড়েছি। ষাটের দশকে বদরুদ্দীন উমর সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যে লেখাগুলো লিখেছিলেন, তা তাঁর ভাষায় 'বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের' পর্ব তুলে ধরেছিল। সে সময় পাকিস্তানি সংস্কৃতির নামে আপাদমস্তক সাম্প্রদায়িক জাতিবিদ্বেষী সংস্কৃতি দাঁড় করাতে সরকারের সঙ্গে বেশকিছু 'পণ্ডিত' নানা তত্ত্ব হাজির করছিলেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, এ কালেও কিছু পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রায় একই ধরনের যুক্তি দিতে দেখা যায়। সে সময় এসব তত্ত্বকে তাত্ত্বিকভাবে মোকাবেলা, বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজকে শিক্ষিত ও আত্মোপলব্ধিতে সক্ষম করে তুলতে এবং পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবস্থান স্পষ্ট করতে উমরের এ কাজগুলোর প্রভাব ছিল নির্ধারক।

যা-ই হোক, সত্তর দশকের শুরুতে, বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নানা বই নাড়াচাড়া করতে করতেই তাঁর *রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন ও পূর্ব-বাঙলার তৎকালীন রাজনীতি'র* প্রথম খণ্ড প্রথম আমার হাতে আসে। সে সময় আমার অন্যতম প্রিয় স্থান, তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে এটি পাঠ করি বেশ কয়েক দিন ধরে। অসাধারণ এ গ্রন্থ পাঠের পর শুধু ভাষা আন্দোলন নয় ড় এ সম্পর্কিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অনুসন্ধানে তাঁর গবেষণা ও লেখার পদ্ধতিও আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। আহমদ ছফা পরে যখন একদিন অধ্যাপক রাজ্জাকের সূত্র ধরে বললেন, 'আর কিছু দরকার নাই, উমর যদি জীবনে আর কিছু না-ও করতেন তবুও এ গ্রন্থের জন্যই তিনি বাঙালি সমাজে চিরস্মরণীয় থাকবেন,' তা খুবই ঠিক মনে হয়েছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে এরপর তিনি আরো অনেক কাজ করেছেনড় তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক।

আগেই বলেছি, বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত *সংস্কৃতি* পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। সেই পত্রিকার নিয়মিত প্রধান লেখক ছিলেন বদরুদ্দীন

উমর ও ডাক্তার সইফ-উদ-দাহার। গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে অনেকগুলো লেখা সে সময় তাতে প্রকাশিত হচ্ছিল। মূল বিষয় ছিল বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র বিশ্লেষণ ও বিপ্লবী আন্দোলনের গভীর নির্মোহ পর্যালোচনা করে সঠিক পথ সন্ধান। আমি নিয়মিত সংগ্রহ করতাম এবং খুবই মনোযোগের সঙ্গে এসব তত্ত্বচিন্তা বুঝতে চেষ্টা করতাম। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে জরুরি অবস্থা জারি ও সব পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে *সংস্কৃতি*ও বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হওয়ার আগে এ পত্রিকা পাঠ করে আমার নিজের উপলব্ধি ও প্রশ্ন নিয়ে আমি সম্পাদক বরাবর তখন একটা চিঠি লিখেছিলাম। অনেক পরে যখন আমরা একসঙ্গে সংগঠন করি, তখন উমর ভাই তার ফাইলে রাখা সেই চিঠিটি আমাকে দেখিয়েছিলেন। তার সব কাজ বরাবরই খুব গোছানো দেখেছি, তিনি বরাবরই সুশৃঙ্খল মানুষ ছিলেন।

উমর ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯৭৮ সালে, তখন তিনি বিপ্লবী রাজনীতিতে নতুন ধারা তৈরিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন এবং আত্মগোপনে ছিলেন। ততদিনে আমি বাংলাদেশ লেখক শিবিরে যোগদান করেছি। এর মধ্যে ১৯৮১ সালে আবারো *সংস্কৃতি* প্রকাশ শুরু হয়। এবারো বদরুদ্দীন উমর সম্পাদক হন এবং আমি নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব নিই। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত *সংস্কৃতি*'র এ দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত ছিল। ১৯৮১ সাল থেকে লেখক শিবিরের নতুন যাত্রা শুরু হয়, সেখানেও আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। ১৯৮৪তে আমি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিই, তিনি তখন সভাপতি ছিলেন। এরপর আরো তিন দফা আমি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি। সেসময় হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ, আবদুল মতিন খানও সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন। উমর ভাই তখনো কেন্দ্রেই ছিলেন।

ক্রমে আমি এ ধারার বিভিন্ন সাংগঠনিক ও মতাদর্শিক কাজে যুক্ত হয়েছি। সংস্কৃতি ও লেখক শিবির ছাড়াও পরের বছরগুলোয় কৃষক ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটসহ বিভিন্ন ব্যানারে সক্রিয় থাকি, অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করি। অসংখ্য সভা-সমাবেশ, সফর, কর্মশালা এবং প্রকাশনায় আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি।

বদরুদ্দীন উমরের সাংগঠনিক কিছু সিদ্ধান্ত ও কাজের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদের কারণে ২০০০ সালের শেষদিকে আমি সংগঠন ত্যাগ করি।

তিনি এতে খুবই অসন্তুষ্ট হন, পরে আমাকে বহিষ্কার করা হয়। আত্মজীবনীতে তিনি আমার সম্পর্কে কিছু কটূক্তি করেছেন, ভুল তথ্যভিত্তিক কিছু সিদ্ধান্তও টেনেছেন, যা আমার প্রাপ্য নয়। তবে এর কারণে তার শক্তি ও রাজনৈতিক মতাদর্শিক ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে আমার মূল্যায়নে কোনো পরিবর্তন হয়নি। সাংগঠনিক সম্পর্কেচ্ছেদ ঘটলেই পারস্পরিক বিদ্বেষ ও তিক্ততা সৃষ্টির যে সংস্কৃতি আমাদের বিপ্লবী রাজনীতির অনেক ক্ষতি করেছে, সেই পথ থেকে আমি প্রথম থেকেই সচেতনভাবে দূরে থেকেছি।

তিন

শুধু লেখক, গবেষক ও শিক্ষক হিসেবে উমরের যে অবদান, তার তুলনাই খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু তিনি এর মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখেননি। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মধ্য দিয়ে তাত্ত্বিক হিসেবে তার যে বিপ্লবী অবস্থান তৈরি হয়, তার পূর্ণতার জন্যই তিনি সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। আগেই বলেছি, ষাটের দশকে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে লেখালিখি করায় আইয়ুব-মোনেম সরকারের রোষানলে পড়ে তিনি এতটুকু উপলব্ধি করেন যে সেই সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত থেকে তার পক্ষে বেশি দূর কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। পরেও শিক্ষকতা বা অন্য কোনো পেশা গ্রহণ না করে, অনিশ্চয়তা ঘাড়ে নিয়ে, একদিকে সমাজ-রাষ্ট্র-ইতিহাস অনুসন্ধান এবং তার ওপর দাঁড়িয়ে নতুন ভবিষ্যৎ নির্মাণে রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে আজীবন একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর এ যাত্রা বদরুদ্দীন উমরকে এ দেশের ইতিহাসে অনন্য অবস্থানে স্থাপন করেছে। তবে তার এ কঠিন যাত্রা সফল করতে নিঃসন্দেহে যার সার্বিক ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তিনি উমরের স্ত্রী সুরাইয়া হানম।

আমি মনে করি সততা, নিষ্ঠা, আপসহীনতা, দৃঢ়তাড়এ সবক'টি শব্দই উমরের পরিচয়ের সঙ্গে নির্দ্বিধায় যোগ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে উমরের জীবনে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ এবং মানুষের মুক্তির রাজনীতির মধ্যে কোনো প্রাচীর নেই, একে অন্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। ষাটের দশকের শেষ থেকে সরাসরি রাজনৈতিক দলে যুক্ত হওয়ার পর গত কয়েক দশকে কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থীসহ সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে তিনি সাংগঠনিকভাবে কাজ করেছেন, বিপ্লবী রাজনীতি এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। হাল ছেড়ে দেননি।

এ দেশে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠন বিস্তারে ব্যর্থতা তো আছেই, নইলে বাংলাদেশের চেহারা তো ভিন্ন হতো। ব্যর্থতা না থাকলে ১৮ কোটি মানুষ নিজেদের মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করত; মানুষ ও প্রকৃতি মিলে এক অসাধারণ জীবন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। এটা যে আমরা এখনো পারিনি সেই ব্যর্থতা সামষ্টিক, আমাদের সবারই তাতে দায় আছে। কিন্তু এ ব্যর্থতা চিরস্থায়ী নয়। কারণ এ সময়ের সব কাজ, ভুল ও সঠিক, ভবিষ্যতের আরো শক্তিশালী যাত্রার ভিত নির্মাণে প্রয়োজনীয় শিক্ষা যোগ করছে। তাতে উমর ভাইয়ের উপস্থিতি অনিবার্য।

(*'দৈনিক সমকাল'র* ২০২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় পূর্ব-প্রকাশিত।)

বদরুদ্দীন উমর
কেন তাঁকে আমাদের মনে রাখতে হবে

মোরশেদ শফিউল হাসান*

মানুষ বা যে-কোনো প্রাণীরই দৈহিক অস্তিত্ব নশ্বর। চুরানব্বই বছর বয়সে বদরুদ্দীন উমরের জীবনাবসানকে কিছুতেই অকালমৃত্যু বলা যাবে না। অন্তত এই অর্থে যে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুর চেয়ে অনেক বেশিদিন তিনি বেঁচেছিলেন। তারপরও তাঁর ভক্ত-অনুরাগী কিংবা বিরোধী কেউই মনে হয় এ সময়ে তাঁর বিদায়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি নিজেও জীবনের শেষদিক অবধি নিজেকে সক্রিয় রেখেছিলেন। লেখালেখিতে যতটা না তার চেয়ে বেশি বক্তৃতা-বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। তাঁর ভক্ত-অনুসারীদের যেমন তেমনি সমালোচকদেরও যা তর্ক-বিতর্কের খোরাক যুগিয়েছে। রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে সমমতাবলম্বী না হয়েও কেবল পছন্দসই হওয়ায় অনেকে এ সময় তাঁর কিছু কিছু বক্তব্যকে লুফে নিয়েছে।

তাঁকে আমি প্রথম দেখি ১৯৬৮ সালে। আমি তখন অষ্টম বা নবম শ্রেণির ছাত্র। ম্যাক্সিম গোর্কির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তৎকালীন পাক-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে সেখানকার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত এক আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি অতিথি হিসেবে গিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তির প্রভাবে ততদিনে এদেশেও গোপন কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার প্রকাশ্য গণসংগঠনগুলো স্পষ্ট দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদল সোভিয়েতপন্থী ও অপর দল চীনপন্থী। বদরুদ্দীন উমর কিন্তু তখনও সোভিয়েতপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে অতিথি হন, মাঝে মাঝে দৈনিক *সংবাদ*-এ কলাম লেখেন। মনে আছে এমন একটি কলামে তিনি ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ছয় দফার সমর্থনে

---

*প্রাবন্ধিক ও গবেষক। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক

আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে তেজগাঁ ও নারায়ণগঞ্জে কারখানা শ্রমিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণের উল্লেখ করে লিখেছিলেন, সে আন্দোলনের বিপ্লবী সম্ভাবনা কীভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের শ্রেণিগত চরিত্র ও আপোসকামিতার কারণে ব্যর্থ হয়। যেভাবে পরেও তিনি মনে করেছেন ১৯৭১ এর ৭ মার্চ মুজিব যদি রেসকোর্সে সমবেত জনতার মিছিল নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ করতেন তবে সেদিনই এদেশে পাকিস্তানি শাসনের অবসান ঘটতো (তাঁর এ ভাবনাটি যে কেন ও কতখানি অবাস্তব ছিল সে বিষয়ে আমি অন্যত্র লিখেছি)। মস্কোপন্থী বামদের সঙ্গে উমর তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটান সম্ভবত ১৯৬৯-এ যখন তারা জামায়াত-নেজামসহ পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী দলগুলোর সঙ্গে আইয়ুব-বিরোধী ঐক্যপ্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। যা পরিণতি লাভ করে 'ড্যাক' গঠনে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী হিসেবে মুজিব তখন কারাগারে। তবে নিশ্চয় তাঁর সম্মতি নিয়েই আওয়ামী লীগও এই জোটে যোগ দেয়। ভাসানী-ন্যাপ ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি এই জোটে শরিক হয়নি। আমি যদি স্মরণ করতে ভুল না করি, তবে সে সময় থেকেই উমর সাহেব আওয়ামী লীগের পাশাপশি মস্কোপন্থীদের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। প্রথমদিকে জামায়াতের সঙ্গে ঐক্য করার বিষয়টিই তাঁর সমালোচনায় প্রাধান্য পায়। *সাম্প্রদায়িকতা ও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার* মতো বইয়ের লেখকের পক্ষে যে-অবস্থানটা তখন খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল।

গোর্কি জন্মশতবর্ষের সেই আলোচনাসভায় বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্য আমাকে এবং সম্ভবত উপস্থিত অনেককেই মুগ্ধ করেছিল। এর বছর তিন আগে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধ চলাকালে এবং তার পরও বেশ কিছুদিন আমাদের পত্রপত্রিকায় পাকিস্তানি বাহিনীর যেসব বীরত্বগাথা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যেত কোনো কোনো রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে ফেরেশতারাও যুদ্ধ করেছেন। সে প্রসঙ্গ টেনে উমর প্রশ্ন করেছিলেন, তবে বদর-ওহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করতে আসমান থেকে ফেরেশতারা নেমে এলেন না কেন? সেদিনের আলোচনাসভায় পূর্ববর্তী এক বক্তা মমতাজউদ্দীন আহমদ (তিনি তখন চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষক) গোর্কির *মা* উপন্যাসটির শিল্পমূল্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে এর সার্থকতা যতটা না উপন্যাস হিসেবে

তার চেয়ে বেশি প্রোপাগান্ডা লিটারেচার হিসেবে। বলেছিলেন, *মা*-র চেয়ে গোর্কির *ক্লিম সামাগিনের জীবন* উপন্যাস হিসেবে অনেক বেশি সার্থক (পরে আবিষ্কার করেছি, ট্রটস্কিসহ কেউ কেউ এমন মত প্রকাশ করেছেন)। তখন পর্যন্ত *মা* ছাড়া গোর্কির আর কোনো রচনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি (ওই বয়সে সে উপন্যাসটিরই বা কতটা কী বুঝেছিলাম?)। ফলে উমর সাহেব যখন তাঁর বক্তৃতায় *মা*-র পক্ষে দাঁড়িয়ে মমতাজউদ্দীন আহমদকে রীতিমতো তুলোধুনো করেন, আমিও সবার সঙ্গে বোধহয় রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানে তুমুল করতালিতে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলাম। সময়ের ব্যবধানে আজ নির্দ্বিধায় বলতে পারি, *মা*-র সঙ্গে তুলনায় গোর্কির বেশকিছু গল্প, দু-একটি নাটক এবং আত্মজৈবনিক উপন্যাসত্রয়ী অধিক শিল্প-সফল রচনা।

শিল্প-সাহিত্য বিচারে উমরের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় সমসময়ে *সুকান্ত সমগ্র*-এর ভূমিকা হিসেবে লিখিত তাঁর একটি ক্ষুদ্র রচনায়ও। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত *সুকান্ত সমগ্র*-এর ভূমিকায় কয়েকবারই সুকান্তের একুশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনের উল্লেখ করায় এতে তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে একহাত নিয়েছেন। তাঁর মতে এর দ্বারা সুকান্ত প্রতিভার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। যদিও *সুকান্ত সমগ্র*-এর এদেশীয় যে-সংস্করণটির ভূমিকা হিসেবে উমর তাঁর লেখাটি লিখেছিলেন তা ছিল প্রকৃতপক্ষে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *সুকান্ত সমগ্র*-এরই পুনর্মুদ্রণ। বদরুদ্দীন উমর তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন, "নজরুল ইসলাম সহ অন্যান্য যে সমস্ত কবি সামাজিক শোষণের উপর কবিতা রচনা করেছেন ... তাঁরা কেউই যথার্থভাবে শ্রেণী সচেতন ছিলেন না। তাঁরা কেউই শোষিত জনতার সাথে উপযুক্তভাবে একাত্মতা বোধ করেননি। দ্বিতীয়ত এই কারণেই তাঁদের এ জাতীয় রচনা তাঁদের সামগ্রিক রচনার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে ছিল। সুকান্তর সমগ্র কাব্য প্রচেষ্টাই কিন্তু শ্রেণী চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তিনি শ্রেণী সংগ্রামেরই কবি। ... এখানে সুকান্ত নিজের স্বাতন্ত্র্যে এমন উজ্জ্বল যে তার গৌরব বৃদ্ধি করা অথবা তার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে পাঠকদের কাছে তার একুশ বছরের উল্লেখ সবদিক দিয়েই সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।"

দুই

বদরুদ্দীন উমরের কাছে শ্রেণীই প্রধান বা একমাত্র সত্য : 'তাহার উপরে নাই'। ইতিহাস বা ব্যক্তিকে তিনি এই শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করেন। একজন কমিউনিস্ট হিসেবে তাঁর এই দেখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ কম। তবে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণে সরলীকরণের ঝোঁকটা যে কখনো কখনো খুব প্রবল হয়ে ওঠে তার নমুনা হিসেবে আমরা এখানে ২০১৭ সালের ২১ মে জ্ঞানতাপস আবদুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলাদেশ জাদুঘরে প্রদত্ত তাঁর লিখিত ভাষণটির উল্লেখ করতে পারি। এতে তিনি জিয়াকে 'মুজিবের ছোটভাই' বলে উল্লেখ করেছিলেন। আর যেহেতু শ্রেণি অবস্থানের দিক থেকে মুজিব, জিয়া, এরশাদ, খালেদা, হাসিনা ও ড. ইউনূসের মধ্যে কোনো তফাত নেই, সেহেতু তিনি তাঁদেরকে এক পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। তবে সে ভাষণেই তিনি বোধহয় প্রথমবারের মতো মুজিবকে একজন 'বড় মাপের নেতা' বলে স্বীকৃতি দেন। তারপরও তিনি সে বক্তৃতায় কিংবা তার আগেপরে সবসময় ও বারবার মুজিবকেই দেশের সব দুরবস্থার জন্য দায়ী করেছেন। কারণ তাঁর মতে এই দুরবস্থার সূচনা ১৯৭২ সালে কিংবা তারও আগে ১৯৭০ সালে মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ের মধ্য দিয়ে। উক্ত বক্তৃতায় উমর আরও বলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশে সমাজতন্ত্রের আদর্শ খুবই জনপ্রিয় ছিল। উমরের এই পর্যবেক্ষণটা কতটা সঠিক বা বাস্তবসম্মত? তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন তোলাই যায়, সমাজতন্ত্রের কোন্ মডেলটা জনগণ তখন পছন্দ করতো? সোভিয়েত, চীনা, কোরীয়, আলবেনীয় নাকি অন্য কোনো মডেল? নেতা হিসেবে ভাসানীর জনপ্রিয়তাকেও কি উমর সাহেবদের আকাঙ্ক্ষিত সমাজতন্ত্রের মডেলের সঙ্গে এক করে দেখা যায়? ১৯৬৯ সালের পর তো ভাসানী ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলতে শুরু করেন। যে-কারণে উমর সাহেব এ সময় তাঁর লেখায় ভাসানীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের অভিযোগ তোলেন। সারা দেশের মানুষ চেনে, আস্থা রাখতে পারে, এমন একজনও বাম নেতা কিংবা একটিও বাম রাজনৈতিক দল কি তখন দেশে ছিল? ১৯৭০-৭১ সালে কিংবা তারপর?

তিন

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা নিঃসন্দেহে বদরুদ্দীন উমরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তিনি যদি আর কিছু না-ও করতেন কেবল এই কাজটির জন্যই স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। তবে তিনি বোধহয় মনে করেন, ইতিহাস কেবল ঘটনার বর্ণনা নয়, একটি দৃষ্টিভঙ্গিও। সে দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত হওয়ার ফলে ভাষা আন্দোলনের দুটি পর্বেই এর পেছনে কমিউনিস্ট বা বামপন্থীদের ভূমিকাকে তিনি যে বা যতটা গুরুত্বে তুলে ধরেছেন, তমদ্দুন মজলিস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন বা শক্তির ভূমিকা সে তুলনায় কমই স্থান পেয়েছে। একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। তাছাড়া বইগুলো লিখিত হয়েছে প্রধানত তাজউদ্দীন আহমদের দিনলিপি ও তাঁর সরবরাহকৃত দলিলপত্র, মাহমুদ আলী সম্পাদিত *নওবেলাল* পত্রিকার ফাইল এবং কিছু ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিচারে যাঁদের অধিকাংশই সে সময় কমবেশি বামমনোভাবাপন্ন ছিলেন।

উমর নিজে জাতীয়তাবাদী নন। বাঙালি বা বাংলাদেশী কোনো অর্থেই নন। তবে ১৯৬০ দশকের শেষার্ধ থেকে ১৯৭১ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল অবধি এদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে তাঁর *সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৬), *সংস্কৃতির সংকট* (১৯৬৭) ও *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৮) বই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাঁর এই ঐতিহাসিক অবদানের কথা আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে। *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন'-এ আমাদের ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উমর লিখেছেন, "পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাঙালী মুসলমান 'মুসলমান বাঙালী'তে রূপান্তরিত হতে শুরু করলো ...। এইভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের জীবনে সূত্রপাত হলো এক অভূতপূর্ব চেতনার।" অবশ্য এর পরবর্তী বাক্যেই তিনি লিখেছেন : "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন সত্যিকার বিপ্লব ঘটে থাকে তাহলে এই হলো তার সঠিক পরিচয়।" জিন্নাহকে বদরুদ্দীন উমর দেখেছেন একজন বাস্তববাদী,

বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিক হিসেবে (এ বিষয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্য মিল লক্ষ করা যায়, দেখুন : *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*)। জিন্নাহর প্রতি উমরের শ্রদ্ধার প্রমাণ হিসেবে আমরা এখানে তাঁর *সাম্প্রদায়িকতা* বইটিতে জিন্নাহর উল্লেখে বা তাঁর নামের সঙ্গে সর্বত্র 'কায়েদে আজম' কথাটা ব্যবহারের উদাহরণ দিতে পারি (৩২ পৃষ্ঠার বইয়ে মোট ২১ বার)। উমর তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সততার পরিচয় দিয়েছেন বইটির বাংলাদেশোত্তর সংস্করণেও তা অপরিবর্তিত রেখে। বলা যায় এখানেই তিনি আমাদের লেখক-বুদ্ধিজীবীদের সারিতে ব্যতিক্রম।

চার

ভাষা আন্দোলনের সময় বদরুদ্দীন উমর ছিলেন বয়সে তরুণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে শিথিল ধরনের যোগাযোগ ছাড়া এ পর্যায়ে আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল বলে জানা যায় না। তিনি নিজেও তেমনটা দাবি করেননি। যদিও একই সময়কালে তাঁর বাবা আবুল হাশিম (যদিও তিনি তখন দৃষ্টিশক্তিহীন) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচিতে শুরু থেকে কখনো বক্তা আবার কখনো সভাপতি হিসেবে যুক্ততার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। একুশে ফেব্রুয়ারির পর বন্দি হয়ে তাঁকে দীর্ঘ সময় কারাগারেও কাটাতে হয়। তবে তারুণ্যের দিনগুলোতে ভাষা আন্দোলনে অংশ না নিলেও, পরবর্তীকালে উমর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দায় অনুভব করেছিলেন। কাজটি যখন শুরু করেন তখন তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

একইভাবে ১৯৬০ দশকের শেষার্ধে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধিকার সংগ্রামেও উমরের পিতা আবুল হাশিমের ছিল নেতৃস্থানীয় ভূমিকা। বেতারে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সপক্ষে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, সরকারি উদ্যোগে বাংলা হরফ সংস্কারের প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রবিরোধী অভিযোগে কয়েকটি বই (যার মধ্যে উমরের *সংস্কৃতির সংকট* ও *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা* বই দুটিও ছিল) নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি প্রতিটি ঘটনায় তিনি বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সামনের সারিতে থেকে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামী একাডেমীর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকায় এবং নিজেও তিনি ইসলামী

শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হওয়ায়, আবুল হাশিমের এই প্রতিবাদী অবস্থান সেদিন আমাদের স্বাধিকার সংগ্রামে বাড়তি বল সঞ্চার করেছিল। আর এ পর্যায়ে তাঁর পুত্র বদরুদ্দীন উমরের লেখা বইগুলো আমাদের সংগ্রামে তাত্ত্বিক আয়ুধের কাজ করেছে।

মার্কসবাদে বদরুদ্দীন উমরের দীক্ষা ঘটে ১৯৬০ এর দশকের গোড়ায় যখন তিনি বিলেতে পড়তে যান। উপমহাদেশের আরও অনেক অভিজাত বামপন্থীর মতো অক্সফোর্ডের পরিবেশেই তাঁর বিপ্লবী চিন্তার স্ফূরণ ঘটে। এই অভিজাততন্ত্রী বিপ্লবীয়ানার ঐতিহ্য তিনি আজীবন বহন করেছেন, শিষ্য-অনুরাগীদের মধ্যেও সঞ্চার করেছেন বললে ভুল হবে না। পরবর্তীকালে সক্রিয় রাজনীতি করতে গিয়ে কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন – অনেক কিছুই করার চেষ্টা করেছেন। সে প্রচেষ্টায় ব্যক্তিগতভাবে তাঁর হয়তো সততা ও আন্তরিকতারও কমতি ছিল না। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চম্মন্যতা মনে হয় সেখানে বাধ সেধেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নামটিও প্রায় সুশীলগন্ধী, কৃষক-শ্রমিকরা তো নয়ই, দেশের অল্প মানুষই সে দলটির নাম জানে। দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় বাম-বুদ্ধিজীবী ও চিন্তক পরিচয়েই শেষ পর্যন্ত বদরুদ্দীন উমর বেঁচে ছিলেন। যদিও নিজে তিনি সব সময় তাঁর কমিউনিস্ট বা একটিভিস্ট পরিচয়টিকেই মুখ্য করে তুলতে চেয়েছেন। বললে অত্যুক্তি হবে না, সাংগঠনিক কাজে তিনি বরং তাঁর প্রতিভার অপচয়ই ঘটিয়েছেন। তাঁর সফল সাংগঠনিক উদ্যোগ বলতে দীর্ঘজীবী *সংস্কৃতি* পত্রিকা এবং অধুনা হীনপ্রভ লেখক শিবির। সমাজতন্ত্র-অনুরাগী সাহিত্যকর্মীদের সংগঠন হিসেবে লেখক শিবির এ যাবত দেশে নতুন ধারার কোনো সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছে কি? বরং নিকট অতীতে এই সংগঠনের উচ্চপদাধিকারী কেউ কেউ উমরের বিপরীত পথেই হেঁটেছেন বলে জানি।

পাঁচ

বদরুদ্দীন উমরের প্রতিষ্ঠান বিরোধী অবস্থান, এমনকি রাজনৈতিকভাবে যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত নন, তাঁদের চোখেও তাঁকে শ্রদ্ধার উচ্চ আসনে বসিয়েছে। যে-দেশে পুরস্কার-পদক ইত্যাদির বিনিময়ে আনুগত্য ক্রয় একটি সাধারণ ব্যাপার, আর লেখক-শিল্পীদের অনেকে এগুলো পাওয়ার

জন্য পারেন না এমন কিছু নেই, সেদেশে একে একে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদক ফিরিয়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হয়ে উঠেছেন যাকে বলে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার প্রতীক। তবে এর আগেও তিনি আরেকটি কাজ করেছেন। পার্টির নির্দেশে নয়, আপন সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতার সম্মানজনক ও নিশ্চিত আয়ের চাকরি ছেড়ে সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মীর জীবন বেছে নেয়া। আর আজীবন তাতেই নিরত থাকা। ভুল হোক কিংবা শুদ্ধ, এমন উদাহরণ আমাদের দেশে বেশি নেই।

এক সময় আমরা জানতাম, পাকিস্তান আমলে বদরুদ্দীন উমর তাঁর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লেখাগুলোর জন্য সরকারের চক্ষুশূল হয়ে তাঁর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরিটি হারান। তবে ঘটনাটি ঠিক এভাবে ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল উমরের কাছ থেকেই তা জানা যায়। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান (যিনি ছিলেন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর) উপাচার্য মুহম্মদ শামসউল হককে বলেছিলেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বদরুদ্দীন উমরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। শামসউল হক বামপন্থী ছিলেন না, বরং রক্ষণশীল ধারারই মানুষ ছিলেন তিনি (পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে যথাক্রমে ইয়াহিয়া এবং জিয়াউর রহমান ও সাত্তার মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছিলেন)। তাছাড়া বর্তমানের মতো তখন বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসন পায়নি। তবে শিক্ষা প্রশাসনে তখনও বোধহয় শিরদাঁড়াসম্পন্ন মানুষের অভাব ঘটেনি। শামসউল হক গভর্নরকে জানিয়েছিলেন, শুধু লেখালেখির কারণে কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ তাঁর নেই। শামসউল হক রাজশাহী ফিরে গিয়ে উমরকে গভর্নরের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার বিষয়ে অবহিত করলে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওপর সরকারি চাপ কমাতে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেন। তবে উমর সাহেব নিজেই জানিয়েছেন, এটাও মূল কারণ নয়। যেহেতু ততদিনে তিনি সর্বসময়ের জন্য রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

উমর সব সময় বলে এসেছেন মনের তাগিদেই তিনি লেখেন, পুরস্কার বা স্বীকৃতির জন্য নয়। কিন্তু অন্যরাও কি সবাই পুরস্কারের আশায় লেখেন?

তাও বোধহয় না। তারপরও ১৯৭৩ সালে তাঁর বাংলা একাডেমি পুরস্কার গ্রহণ না করার পেছনে একটা শক্ত যুক্তি ছিল। এ ধরনের পুরস্কার বা সম্মাননা লেখকের চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর প্রভাব ফেলে, তাকে প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের অনুগত বা সেবাদাসে পরিণত করতে পারে। তাঁর সেদিনকার ভাষাটা ছিল স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষ করে সর্বশেষ স্বাধীনতা পদকের বেলায় তা অপারগতায় রূপ নিয়েছে। যেন পুরস্কারের ব্যাপারে পূর্বের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতেই এই সিদ্ধান্ত। অন্তত এ উপলক্ষে তাঁর দলের তরফ থেকে যে প্রেস-বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয় তাতে তেমন মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। তারপরও তাঁর পূর্বাপর স্ববিরোধিতাহীন এই ভূমিকা, চারিত্রিক সংহতির এই দৃষ্টান্তের জন্য বদরুদ্দীন উমর আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। চিরকাল শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবেন। এটাই বা কজন পারেন?

বদরুদ্দীন উমরের শিষ্য-অনুসারী কিংবা সাধারণভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল কেউ কিন্তু তাঁর এই প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার আদর্শ অনুসরণ করতে এগিয়ে আসেননি। আগামীতে আসবেন তেমন সম্ভাবনাও কম। সেই দায়ও কি কেউ অনুভব করেছেন? মনে হয় না। এখানেই তাঁর অনন্যতা, আবার এখানেই তিনি সম্পূর্ণ একা। সমাজ কিংবা জনগণের পাল্‌স বোঝার ক্ষেত্রে এদেশের ট্রাডিশনাল কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর অক্ষমতা বা ব্যর্থতার তিনি সমালোচনা করেছেন। বেশ কঠোরভাবেই করেছেন। তাঁর এই উপলব্ধির যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবনকালে তিনি বা তাঁর প্রতিষ্ঠিত পার্টি এক্ষেত্রে নতুন কোনো সম্ভাবনার সূচনা করতে পেরেছে কি?

এই দেশ ও সমাজ তাঁর কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করেনি বলে মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি একাধিক সাক্ষাৎকারে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। জীবনের উপান্তে পৌঁছে এই অনুভবজাত খেদই কি নানা প্রসঙ্গে তাঁর বিবিক্ত মনোভাবের পরিচয় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে?

ছয়

মৃত্যুর আগে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে দেওয়া বদরুদ্দীন উমরের কিছু বক্তব্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। মুক্তিযুদ্ধের 'সত্যিকার ইতিহাস', ২৫ মার্চ রাতে

মুজিবের স্বেচ্ছা-বন্দিত্ব ইত্যাদি নিয়ে এসব প্রশ্ন বা সমালোচনা একেবারে নতুন নয়। এর আগেও উমর নিজে এবং অন্যরা এ নিয়ে অল্পবিস্তর কথাবার্তা বলেছেন। লেখালেখিও কম হয়নি। তবে এবারে দেখা গেছে তাঁর মতাদর্শের বিপরীত অবস্থানের লোকজন এমনকি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতাকারীরাও তাঁর সে কথাগুলোকে নিজেদের সপক্ষে ব্যবহার করছেন। বদরুদ্দীন উমরের মতো একজন মানুষ বলেছেন বলেই কথাগুলোর মূল্য বা গুরুত্ব যেন তাঁদের কাছে বেশি। অত্যুৎসাহী কেউ কেউ সাক্ষাৎকারের ছলে তাঁকে দিয়ে কিছু কথা বলিয়েও নিয়েছেন বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর মতামত বা সমালোচনাগুলোর সবই অবান্তর, অযৌক্তিক বা ভিত্তিহীন তা বলবো না। কিন্তু তাঁর বিচারে বুর্জোয়া ধারার একজন রাজনীতিক দেশের ভেতরে আত্মগোপন করে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরিচালনা করবেন এটাই বা কতখানি প্রত্যাশিত? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই (আমি আমার অন্য লেখায় করেছি)। কিন্তু এ প্রসঙ্গে যে-প্রশ্নটি এড়ানো যায় না তা হলো, তিনি নিজে তো ওই সময়টিতে সক্রিয় রাজনীতি করতেন, ছিলেন একটি বাম রাজনৈতিক দলের (ইপিসিপি-এমএল) কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতা। তো একাত্তরের নয় মাসে তাঁর দলটি জনগণকে সংগঠিত ও তাদেরকে সশস্ত্র প্রতিরোধে শামিল করার ব্যাপারে কতটা কী করেছিল? তিনি ও দলের অন্য নেতারা তো এ সময় কেবল দলিল-পাল্টা দলিল রচনায়ই সময় ব্যয় করেছেন। তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী তিনি এ সময় প্রথমে ১৮ ও পরে ৬৪ পৃষ্ঠার দুটি দলিল রচনা করেন (দেখুন : দৈনিক *প্রথম আলো*র সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২৬ মার্চ ২০২৫)। পরিস্থিতি মূল্যায়নে পার্টির অন্য নেতাদের ব্যর্থতা উপলব্ধির পরও যুদ্ধের পুরো সময়টা তিনি দলেই রয়ে গেলেন কেন? কেন ১৯৭১ এর ডিসেম্বরের আগে তিনি পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারলেন না? বলা যায় জীবনের শেষদিকেই দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "লড়াই করতে গিয়ে আমি দেখেছি, আমি দক্ষিণপন্থীদের দিক থেকে বিরোধিতা পাইনি, সব বিরোধিতা পেয়েছি বামপন্থীদের কাছ থেকে।" (দেখুন : ঐ) ঘোষিতভাবে কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদী হয়েও তাঁর 'দক্ষিণপন্থীদের দিক থেকে বিরোধিতা না পাওয়ার' কারণটি তিনি কখনো অনুসন্ধান করে দেখেছেন কিনা জানি না। আজ তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর অনুসারী-

অনুরাগীদের এ বিষয়ে একটি আত্মানুসন্ধান বা আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

সাত

সবকিছুর পরও বদরুদ্দীন উমর আমাদের একজন ব্যতিক্রমী চিন্তক ও বুদ্ধিজীবী। সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর অনেক কটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁকে বহু আগেই দেশের একজন শ্রেষ্ঠ গবেষক ও পণ্ডিতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও খ্যাতি বা পরিচিতি এনে দিয়েছে। জীবনকালে তাঁর সংগঠক ব্যক্তিত্ব এবং সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে প্রতিক্রিয়াধর্মী বা সাংবাদিকতামূলক রচনা ও বক্তৃতা-বিবৃতিই হয়তো অনেকের কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এখন আমাদেরকে আবার তাঁর সেই কালোত্তীর্ণ কাজগুলোর দিকেই ফিরে তাকাতে হবে। সামনে এগোনোর জন্য সেগুলোই হবে আমাদের মহামূল্য পাথেয়।

(*টিবিএস* প্রকাশনা *ইজেল*-এর ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।)

বদরুদ্দীন উমর: সনিষ্ঠ গবেষক ও 'বিশুদ্ধবাদী' বিভ্রান্তির মূর্ত প্রতীক

কানাই দাশ*

উভয় বাংলার খ্যাতনামা বাম বুদ্ধিজীবী, প্রখ্যাত রাজনৈতিক ইতিহাস গবেষক, বহু প্রশংসিত গ্রন্থের রচয়িতা, চট্টগ্রাম কলেজ ও পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ১৯৬৮ সালে শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে সার্বক্ষনিকভাবে তৎকালীন পিকিংপন্থী কমিউনিষ্ট রাজনীতিতে যোগ দেয়া, আমৃত্যু চলনে-বলনে, বিশ্বাসে বস্তুবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী, নিজ বিশ্বাসে আমৃত্যু অটল বদরুদ্দীন উমরের ৯৪ বছরের দীর্ঘ এক বর্ণাঢ্য জীবনের পরিণত পরিসমাপ্তি ঘটল।

১৯৩১ সালে তিনি বধর্মান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে বধর্মান রাজ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হবার পর পরই তাঁর পিতা অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক, উদারবাদী রাজনীতিক আবুল হাশিমের সাথে দেশত্যাগ করে ঢাকা এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে ভর্তি হন। পরে সেখানেই কিছুদিন অস্থায়ী প্রভাষকের কাজ করেন। এরপর চট্টগ্রাম কলেজে এক বছরের মত দর্শনে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় 'বুধ গোষ্ঠী' বলতে যা বোঝায় সে ধরনের এক শিক্ষকমন্ডলী সেখানে ছিলেন এবং তাঁরা সবাই ছিলেন প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তার লোক। এক্ষেত্রে দর্শনে হাসান আজিজুল হক, ইংরেজিতে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও আলী আনোয়ার, ইতিহাসে সালাউদ্দিন আহমদ ও পরবর্তীতে বিচারপতি হাবিবুর রহমান, অর্থনীতিতে তখনকার কনিষ্ট শিক্ষক সনৎকুমার সাহা, প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁরা 'পূর্বমেঘ' বলে একটি সাহিত্য সাময়িকী চালু করেন। এই আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন বদরুদ্দীন উমর।

পারিবারিকভাবেই উমর রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। তাঁর পরিবারের মধ্যেই ই ছিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক

---

*রাজনৈতিক কর্মী।

লোকজন। স্কুলজীবন থেকেই তাঁর ঝোঁক ছিল কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শের প্রতি, যদিও ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। আবার সে সময় তিনি প্রায়ই পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেতা বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, তাঁর ফুফাতো ভাই মনসুর হাবিবুল্লার আলোচনা ও ক্লাশে উপস্থিত থাকতেন।

১৯৬০ এর দশকে তিনি পুরোদমে লেখালেখির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 'সংস্কৃতির সংকট,' 'সাংস্কৃতিক সাম্পধদায়িকতা' এ সময়ে তাঁর দুটি উৎকৃষ্ট প্রকাশনা। তবে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠকীর্তি বা 'ম্যাগনাম ওপাস' হল ভাষা আন্দোলনের উপর গবেষণাধর্মী ১৯৭০, ১৯৭২, এবং ১৯৮৫ সালে তিনখন্ডে রচিত ইতিহাস 'ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন পূর্ববাঙলার রাজনীতি'। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের পাঠক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণার জন্য এই গ্রন্থ এখনো গুরুত্বপূর্ণ।

বাম রাজনীতিতে বিশুদ্ধবাদীতার তত্ত্বতালাশের একটি বিশ্বজনীন বিভ্রান্তির ধারা সবসময় ছিল। যে লেনিন প্লেখানভকে রাশিয়ার প্রথম মার্কসবাদী বলে অভিহিত করেছেন সেই প্লেখানভই ১৯০৫ সালের গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও ১৯১৭ সালের রুশ নভেম্বর বিপ্লব উভয় ক্ষেত্রে লেনিনের ভূমিকার সমালোচনা করেন এবং নিজে মেনশেভিকদের নিয়ে জারের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানকে সমর্থন করে চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেন। ঠিক তেমনি বদরুদ্দীন উমর আমাদের দেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ঘটনা মহান মুক্তিযুদ্ধকে 'দুই কুকুরের লড়াই' বলে আখ্যায়িত করে কার্যত হানাদার পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থনকারী পার্টি, তথা তৎকালীন ইষ্ট পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) (সংক্ষেপে, ইপিসিপিএমএল)-এর নেতা হিসাবে তাঁরই সহকর্মী তিন নেতা (আব্দুল হক, সুখেন্দু দস্তিদার, এবং মোহাম্মদ তোয়াহার) সাথেই ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। পরে সেখান থেকে বেড়িয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর ৪০-পৃষ্ঠার এক পৃথক দলিল তৈরি করতেই ডিসেম্বর এসে যায়। অথচ তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর এবং তাঁর সমবয়সী অনেকেই তখন যুদ্ধে। এ দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তিনি মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। কিন্তু তিনিই আবার বঙ্গবন্ধুকে আত্মসমর্পণকারী বলে আখ্যায়িত করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই দলের অপর একটি তরুণ অংশ মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে দেশে থেকেই সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বদরুদ্দীন উমর বলেন যে, আওয়ামী লীগের মত সিপিবিও ১৯৭১ সালে ভারতে পালিয়ে যায়। অথচ প্রবাসী সরকার ও আওয়ামী লীগের বিরাট একটি প্রভাবশালী অংশের বিরোধিতার মুখে ন্যাপ-সিপিবি-ছাত্র ইউনিয়ন সেদিন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সহায়তায় আলাদা কমান্ডে বিশেষ গেরিলা বাহিনি গঠন করেছিল। তখন পাকিস্তান বাহিনীর নজিরবিহীন গণহত্যার মুখে নিরস্ত্র এক কোটি মানুষের ভারতে আশ্রয় নেওয়ার যেমন বিকল্প ছিল না, তেমনি পাক বাহিনীর আক্রমনের মুখে নিরস্ত্র রাজনৈতিক নেতাদের ভবিষ্যত মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ভারতে যাওয়ার কোন বিকল্প ছিল না। মওলানা ভাসানীও ভারতে পালিয়ে বেঁচেছিলেন কিনা উমর তা কখনো বলেছেন বলে শুনিনি। অনেক বছর আগে তাঁর দুটো বই *যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ* ও *যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ* পড়ে আমার সেদিনের অর্বাচীন বোধে এ ধারণা জন্মেছিল যে, কোন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীও এ লেখা লিখতে দ্বিধা করবে।

আমার মনে হয়, ভাবগত বিষয়ের দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে তাঁর লেখাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশ সনিষ্ঠ তথ্য ও গবেষণা নির্ভর; দ্বিতীয় অংশ বিভ্রান্ত রাজনৈতিক বয়ানে কন্টকাকীর্ণ। তিনি ইপিসিপিএমএল ছেড়ে ১৯৭১ সালে বেড়িয়ে আসেন এবং নানা পথ ঘুরে শেষ পর্যন্ত 'গণমুক্তি কাউন্সিল' নামে যে দল প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম, আমার মনে হয়, সাধারণ মানুষ দূরে থাক রাজনীতি সচেতন খুব কম মানুষ শুনেছে। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ করে বাম রাজনীতিতে 'বিশুদ্ধবাদী' বিভ্রান্তির একজন মূর্ত প্রতীক। ইপিসিপিএমএল-এ যোগদান করাই হল সেই বিভ্রান্তির মূল উৎস এবং তিনি তা সচেতনভাবেই করেছেন।

উমর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, মণি সিংহ তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁকে যোগ দিতে বলেছিলেন। খোকা রায়কে তাঁর কাছে সাম্পধদায়িক মনে হয়েছে। একমাত্র সুখেন্দু দস্তিদারকে তাঁর ভাল লেগেছে। কৌতুহলোদ্দীপকভাবে এর সাথে যুক্ত করেছেন যে, সুখেন্দুর সাথে তাঁর প্রথম ও শেষ দেখা কমিউনিষ্ট বিরোধী পূর্ববাংলার এক সময়ের আওয়ামী মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বাসায় (*প্রথম আলো*, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫)। অথচ, ইতিহাস হলো, ১৯৬৬ সালে মতভিন্নতার কারণে

কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে মাত্র দু'জন -- সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহা-কেন্দ্রীয় কমিটির নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত না মেনে, পার্টি শৃংখলা ভঙ্গ করে, এবং তৎকালীন পার্টি সম্পাদক কমরেড মণি সিংহের ব্যক্তিগত অনুরোধ উপেক্ষা করে বেরিয়ে আসেন, যা এদেশের বাম আন্দোলনকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ করে। পার্টির এই ভাঙ্গনের কারনেই তাঁর অতি অপছন্দের 'শেখ মুজিবে'র নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী শক্তি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে চলে আসে এবং শ্রেণিগত অবস্থানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই নানা ভুল করে। তিনি শুধু সেই ভুলের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু নিজেদের ক্ষমাহীন অপরাধ একবারের জন্যও স্বীকার করেননি। সেই ক্ষতির রেশ ধরে বামদের দৃশ্যমান দুর্বলতা, বিভক্তি, সম্মিলিত শ্রেণি সংগ্রামের অনুপস্থিতিতে দীর্ঘকালব্যাপী ডানপন্থী শাসনের জেরে আজ সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিষ্ট শক্তি দেশের রাজনীতির প্রথম সারিতে এসে গেছে। এই শক্তির উত্থানের বিষয়ে গত এক বছরে কমরেড উমর শেষ পর্যন্ত নিশ্চুপ ছিলেন। এই সামগ্রিক অবস্থার জন্য তাঁর প্রথম দল ইপিসিপিএমএল কি অন্তত আংশিকভাবে দায়ী নয়?

নিজ মতের বিশুদ্ধতাকে সঠিক মনে হলেও সাময়িকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভুল সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া সংক্রান্ত লেনিনের রাজনৈতিক জীবনের অনেক উদাহরণ থেকে উমর শিক্ষা নেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। তিনি বরং লেনিন-পরবর্তী সোভিয়েত রাশিয়ার সংকটের অন্যতম উৎস স্তালিনীয় জবরদস্তির পার্টি লাইনকেই সঠিক মনে করেছেন এবং চর্চা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের মত তিনিও আমাদের দেশের রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে কিছু আছে বলে মনে করেন না। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও শাসনামলের সদর্থক কিছুই তিনি খুঁজে পাননি। বিপরীতে তিনি ১৯৭৫-পরবর্তী সামরিক শাসন আর জবরদস্তির কথা কম বলেছেন; বরং এতে তিনি খুব দোষের কিছু দেখেননি।

বদরুদ্দীন উমরের মত পন্ডিতের পুরো রাজনৈতিক জীবনটাই আমার কাছে এক ধরনের ভ্রান্তিবিলাস বলে মনে হয়েছে। দুর্নিবার সেই ভ্রান্তিবিলাসে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছেন। যে সিপিবিকে তিনি কোনদিন কমিউনিষ্ট পার্টিই মনে করেন নি সেই পার্টির কিছু প্রবীণ নেতাও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে সম্প্রতি তাঁর ভ্রান্তিবিলাসে আকৃষ্ট হয়ে মুক্তিযুদ্ধের বামপন্থী বয়ান তৈরি করতে চাইছেন, যেন গত পঞ্চাশ বছর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সিপিবির কোন বক্তব্য ছিল না। এদের অনেকের সাম্প্রতিক

রোল-মডেল হলেন উমর। এদের অনেকে একসময় সংকীর্তন করলেও এখন বঙ্গবন্ধুর শাসনামলকে উমরের মতই ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ বলে মনে করেন। দেশের প্রবীণ মেধাবী অর্থনীতিবিদ, প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য রেহমান সোবহানের আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খন্ড, আন-ট্রানকুইল রিকালেকশনস নেশন বিল্ডিং ইন পোস্ট লিবারেশন বাংলাদেশ গ্রন্থের *ডন টু ডার্কনেস* পড়লেই তাঁরা বুঝতে পারবেন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কি কঠিন আর্থিক সংকটে ছিল। তিনি লিখেছেন দেশে তখন কোন রিজার্ভ ছিল না; পুরো অবকাঠামো তখন বিধ্বস্ত; চট্টগ্রাম বন্দর সম্পূর্ণ অচল; রাশিয়া নৌ-বাহিনী পাঠিয়ে বন্দর চালু করে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী আচরণের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আওয়ামী লীগের ছিঁচড়ে চোরেরা সেসময়ও অপকর্ম করেছে বটে, কিন্তু হাসিনার আমলের মত রাষ্ট্রীয় অর্থের বেপরোয়া লুটপাট তখন হয়নি। ব্যক্তি মুজিবের দুর্নীতি নিয়ে সেদিন কেউ প্রশ্ন তুলেনি। এমনকি ১৯৭৫ সালের তাঁকে হত্যার পর তাঁর ৩২ নম্বরের বাড়ীকে আজকের দিনের উচ্চ-মধ্যবিত্তের বাসভবনের চাইতেও হতশ্রী ও দীন মনে হয়েছে। তাঁর নামে কোন ব্যাংক একাউন্ট পাওয়া যায়নি।

কিন্তু এসব কিছুই বদরুদ্দীন উমরের নজরে আসেনি; এসেছে কেবল রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার ও জাসদের উপর নির্যাতন ও দুঃশাসনের কথা। তিনি বঙ্গবন্ধুর যে মৌলিক ভুলটি কোনদিন উল্লেখ করেন নিয়ে তা হলো তিনি মোশতাকের মতো পরিচিত মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী মার্কিন এজেন্টকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং স্বজন-বেষ্টিত ছিলেন, অথচ তাজউদ্দিনের মত নিলোর্ভ, প্রাজ্ঞ, সৎ ও নিবেদিত রাজনীতিবিদকে দল ও সরকার থেকে বের করে জীবনের চরম ভুল করেছেন, যা নৈতিক অপরাধও বটে। উমর বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিনের দৃষ্টিভঙ্গী, আচরণ, জ্ঞান, ও বুদ্ধিমত্তার পার্থক্য দেখেন নি, শুধু দেখেছেন যে, দু'জনেই আওয়ামী লীগের লোক।

পরিশেষে, চলনে-বলনে, আচার-আচরণে একজন সেকুলার বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ, দেশের বৌদ্ধিক পরিমন্ডলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, গবেষক, মানব মুক্তি সংগ্রামের একজন লড়াকু চিন্তাবিদ ও সৈনিক, প্রতিষ্ঠান-বিরোধী বদরুদ্দীন উমরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর মৃত্যুতে অবশ্যই বাম চিন্তাজগতে এক অপূরনীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। মাঝেমধ্যে আমার মনে হয় শিক্ষকতার পেশায় থাকলে তিনি বোধ হয়

সমাজ ও দেশের জন্য আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারতেন। অসহায় মানুষের করুণ আর্তনাদ, ক্ষুধার্ত শিশুর অসহ কান্না দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে সেই বিখ্যাত প্রশ্নের উদয় হয়েছে: 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু/ নিভাইছে তব আলো/ তুমি কি তাদের করিয়াছ ক্ষমা/ তুমি কি বেসেছ ভালো?'। এ প্রশ্ন করেও রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর প্রীতি অটুট ছিল। কিন্তু, উমর বলেছেন, ঠিক এই কারণে তিনি নিরীশ্বরবাদী হন। দেশ টিভির 'বেলা-অবেলা' অনুষ্ঠানের সাক্ষাৎকারে জীবনের প্রায় ৯০ বছর বয়সে তাঁর স্পষ্টবাদী চরিত্রের প্রমাণ রেখে তিনি অবলীলায় তা প্রকাশ করেছেন। নিজের বিশ্বাসে আজীবন থিতু থেকেছেন, কিন্তু সেই বিশ্বাসকে বস্তুবাদী হিসাবে দ্বান্দ্বিক নিয়মে পরিবর্তনশীল ও চলিষ্ণু ভাবেননি বলে মনে হয়। তবুও আমাদের দেশের বস্তুবাদী বৌদ্ধিক ভাবনার পরিমন্ডলের মহত্তম এই পন্ডিতের প্রয়াণ এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করল।

তথ্যসূত্র

১. 'বদরুদ্দীন যেভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন', *প্রথম আলো*, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (পৃষ্ঠা ৫)। এ বদরুদ্দীন উমরের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন।

২. আহমেদ, মহিউদ্দিন (২০২৫), *বামপন্থার সুরতহাল*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

টীকা

বদরুদ্দিন উমর ১৯৭১ সালে তাঁর নিজের দল পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (ইপিসিপি)'র তিন নেতা সুখেন্দু দস্তিদার, আব্দুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহা রচিত মুক্তিযুদ্ধের উপর তিনটি আলাদা দলিলের একটিও পছন্দ না হওয়ায় নিজে প্রথমে ২২-২৩ পৃষ্ঠার একটি নতুন দলিল লিখেন এবং পরে এটাকে বিস্তৃত করে, তাঁর ভাষায়, '৬০-৬৫ পৃষ্ঠার একটা দীর্ঘ আলোচনা' লিখেন (*বামপন্থার সুরতহাল*, মহিউদ্দিন আহমেদ, ২০২৫, পৃ. ৩৬)। জনাব উমরের লিখিত দলিলটি দলের অনুমোদন পায় না এবং সেজন্য ঐ দলিলের কোন শিরোনাম জনাব উমরের লেখায় বা মহিউদ্দিন আহমেদের বইয়ের পরিশিষ্টে উল্লেখিত হয় নাই। তবে সুখেন্দু দস্তিদার এবং আব্দুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহার রচিত দলিলগুলোর শিরোনাম অন্তভূক্ত হয়। বদরুদ্দীন উমর *সংস্কৃতি* পত্রিকার ২০১৬ সালের জুন সংখ্যায় দলিলগুলো প্রকাশ করেন। মহিউদ্দিন আহমদও তাঁর বইয়ের (*বামপন্থার সুরতহাল*) পরিশিষ্টে দলিলগুলো প্রকাশ করেন। সামগ্রিক আলোচনা ও দলিলগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পার্টির অন্য নেতাদের তুলনায় জনাব উমর ১৯৭১ সালে চীনের ভূমিকার যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করেন এবং চীন নিজের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা পালন করেছে বলে দৃঢ় মত প্রকাশ করেন (*বামপন্থার সুরতহাল*, পৃষ্ঠা ১৫২- ৫৩, ১৫৯-৬০)।

বদরুদ্দীন উমর গবেষণায় অবদান এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে কিছু কথা

তানভীর আকরাম*

বদরুদ্দীন উমর (১৯৩১-২০২৫), বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রধান গবেষক, ৭ই সেপ্টেম্বর প্রয়াত হয়েছেন। ভাষা আন্দোলন নিয়ে তাঁর কাজ বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর, নিরপেক্ষ, এবং ভারসাম্যপূর্ণ এ কথা প্রায় সবাই মানেন। রাজনৈতিকভাবে তাঁর বিরোধীরাও স্বীকার করেন যে, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বোঝার জন্য তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য।

উমর একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ এবং যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক এবং তাঁর গবেষণার কাজ যথার্থ মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সাথে করতেন। উমরের জন্ম হয়েছিল এক সম্ভ্রান্ত বাঙালি মুসলিম পরিবারে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে। তার বাবা আবুল হাশিম অবিভক্ত বাংলায় একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে যখন তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন উমর ঢাকায় চলে আসেন। যদিও উমর তার কৈশোরেই বাংলার পূর্বাংশে চলে এসেছিলেন, তবুও তার বাংলা কথা বলার ধরণ ও আচরণে পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব রয়ে গিয়েছিল।

উমর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। পরে তিনি যুক্তরাজ্যে অবস্থিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতিতে (PPE) স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি শিক্ষাজীবনকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। (বলা হয়ে থাকে, তিনিই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন)। ষাটের দশকের শেষ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিকূল পরিবেশের কারণে তিনি তার শিক্ষকতার পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর তিনি বিভিন্ন একটি অতি-বামপন্থী মার্ক্সবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। তবে, এই রাজনৈতিক দলের তেমন জনসমর্থন

---

*অর্থনীতিবিদ। প্রকৌশলী তাজমিলা হোসেন কর্তৃক ইংরেজি থেকে অনূদিত।

ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মধ্যে বিভেদের প্রেক্ষিতে তিনি চীনের তথা মাওবাদীদের পক্ষ নেন। মাওবাদের প্রতি তার বিশ্বাস, সোভিয়েত-বিরোধী মনোভাব এবং ভারতীয় আঞ্চলিক আধিপত্য নিয়ে তার ভয় থাকার কারণে তিনি মস্কোপন্থী বাংলাদেশের (সিপিবি) এবং অন্যান্য মস্কোপন্থী দলের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করতেন।

যদিও উমর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তিনি মূলত তার পাণ্ডিত্য এবং গবেষণা গ্রন্থসমূহের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিশেষত ভাষা আন্দোলন নিয়ে তার বইগুলো এই আন্দোলনের ঘটনাক্রম ও এতে জড়িত ব্যক্তিদের কর্মকান্ড নিখুঁতভাবে নথিভুক্ত করার এবং এই আন্দোলনের পেছনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলো ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী পারঙ্গমতার পরিচয় দেন।

যদিও তাঁর বিশ্লেষণ এবং আদর্শগত কাঠামো একটি কট্টর মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এসেছে, তবুও তিনি ঘটনা ও তার ধারাবাহিকতা বস্তুনিষ্ঠভাবে নথিভুক্ত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ঘটনাবলীর খুঁটিনাটি এবং তথ্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরার প্রতি তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। একটি নির্দিষ্ট মতবাদের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যুক্তি এবং প্রমাণের উপর জোর দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর বিশ্লেষণকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। তিনি বাঙালি সমাজের সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রেণি কাঠামো, এবং স্তরবিন্যাসের একজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক ছিলেন। একই সাথে তিনি বাঙালি শাসকগোষ্ঠীর সুবিধাবাদী নীতির একজন কঠোর সমালোচকও ছিলেন।

১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে সাম্প্রদায়িকতা, সংস্কৃতি, এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদসহ আরও কয়েকটি বিষয়ে প্রকাশিত তাঁর অসাধারণ প্রবন্ধ সংকলনগুলো তাঁকে বিশেষ পরিচিতি এনে দেয়। ১৯৭০, ১৯৭২, এবং ১৯৮৫ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ, 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' তাঁকে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রধান প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই গ্রন্থে তিনি যুক্তি দেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলন কেবল ছাত্র ও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এর ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমর্থন ছিল। এ বিষয়ে তাঁর পরবর্তী

গবেষণা এবং প্রকাশনাসমূহ একজন ঐতিহাসিক হিসেবে তার খ্যাতিকে আরও সুদৃঢ় করে।

উমর প্রধানত বাংলায় লিখতেন, তবে তিনি ইংরেজিতেও লিখতেন। তার বাংলা গদ্য ছিল স্বচ্ছ এবং জোরালো, যা বাংলার সাহিত্য এবং ঐতিহ্যের উপর তার দখল প্রমাণ করে। যদিও উমর নিজেকে বামপন্থার মানুষ মনে করতেন, তবুও তার রুচি, কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ, এবং সংস্কৃতি ও সঙ্গীত বিষয়ক পছন্দ-অপছন্দ দক্ষিণ এশীয় ও পশ্চিমা উভয় ধরনের উচ্চ সংস্কৃতি এবং সাহিত্যকীর্তির মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তিনি বাংলা, ইংরেজি, এবং উর্দু কবিতা মুখস্থ বলতে পারতেন।

ভাষা আন্দোলন নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি উমর ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিয়ে লিখেছেন। তিনি বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর্মরত বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)-গুলোর ঘোর সমালোচক ছিলেন। তিনি এনজিও-গুলোকে পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠী ও স্থানীয় বুর্জোয়াদের (ধনিক শ্রেণির) একটি চক্রান্ত হিসেবে নিন্দা করতেন। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকের উন্নতিতে এবং গরিব মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে এনজিওগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করতে তিনি নারাজ ছিলেন। এটা বেশ উল্লেখযোগ্য এবং চিন্তার উদ্রেককারী যে, উমরের একটি বইয়ের শিরোনাম ছিল 'দারিদ্র্যের বাণিজ্য: ড. ইউনূসের দারিদ্র্য ব্যবসা'[১]। উমর কেবল একজন বিতর্ক উদ্রেককারীই ছিলেন না, তিনি তাঁর বইয়ের শিরোনাম এবং বিপণনের কৌশল জানতেন, যে কারণে তার বইগুলো দারুণ বিক্রি হতো। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের এনজিওগুলো শ্রমিক শ্রেণির আত্মসচেতনতা এবং শ্রেণি সংহতি গঠনে প্রধানত ক্ষতিকর। তিনি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং একে সমন্বিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

উমর কেবল কট্টর মার্ক্সবাদীই ছিলেন না, তিনি একজন অনুতাপহীন স্তালিনবাদী-মাওবাদী হিসেবেও অটল ছিলেন । উমর ছিলেন প্রচুর পড়াশোনা করা, সু-অবহিত, অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বৈশ্বিক রাজনীতি ও খবরের একজন গভীর অনুসরণকারী। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের পরিস্থিতি খুব ঘনিষ্টভাবে অনুসরণ

করতেন। বাঙালি কমিউনিস্ট যেমন অবনী মুখার্জি, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং গোলাম আম্বিয়া খান লোহানী যে স্তালিনের শুদ্ধি অভিযানের সময় নির্মমভাবে খুন হয়েছিলেন - তা উমরের অজানা থাকার কথা নয়। মাও জেদংয়ের 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড'-এর ফলশ্রুতি হিসেবে সংঘটিত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও অনাহার এবং পরবর্তীতে মাওয়ের শুরু করা 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এর নিষ্ঠুরতা ও বাড়াবাড়িও উমরের অজানা ছিল না। তবুও, তিনি তার বিশাল লেখালিখির কোথাও স্তালিনবাদ-মাওবাদের অপরাধসমূহকে গুরুত্ব সহকারে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে এবং বিবেকসম্মত উপায়ে তুলে ধরেননি। যদিও তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়ক গবেষণায় বিভিন্ন সংরক্ষণাগারে রক্ষিত আকরসমূহ বিশ্লেষণ করায় যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতি প্রত্যাশিত নজর না দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যত্যয় ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। মাওবাদের প্রতি তাঁর এই জটিল মোহের কারণেই উমরের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক লেখায় এমন কিছু পাওয়া যায় না যা মাও-পরবর্তী চীনের গুরুত্বপূর্ণ ও অসাধারণ রূপান্তর বুঝতে সহায়ক হতে পারে। একইভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর অতি-নেতিবাচক মতামত ও মূল্যায়নও অনেকের কাছে বস্তুনিষ্ঠ এবং যথাযথ বলে মনে হয়নি। নিজের ধারণা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তিনি প্রায়শ পর্যাপ্ত আত্ম-সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে ব্যর্থ হতেন বলে অনেকে মনে করেন।

অন্যদিকে তাঁর একটি প্রশংসনীয় দিক হলো, উমর প্রচারবিমুখ ছিলেন এবং ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পাওয়া সম্মাননা, সাহিত্য পুরস্কার, ভান, অপ্রয়োজনীয় সামাজিক অনুষ্ঠান এবং অপব্যয়কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি সদ্ভাবপূর্ণ কথোপকথন পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন একজন স্বাধীন বুদ্ধিজীবী যিনি তার বিশ্বাসে অটল ছিলেন এবং প্রকাশ্যে নিজের মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না, এমনকি যখন তিনি সংখ্যালঘুদের দলেও ছিলেন। তাঁর মেধা, স্বাধীনচেতা মনোভাব, এবং মানবিক গুণাবলীর কারণে তাঁর প্রজন্মের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। পরিশ্রমী এবং নির্মোহ গবেষক হিসেবে বদরুদ্দীন উমর যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বুদ্ধিজীবীদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

(এই প্রবন্ধটির একটি ইংরেজি সংস্করণ *'কাউন্টারপয়েন্ট'* নামের একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছিল, যার লিংক: https://counterpointbd.com/Reflections-on-Badruddin-Umar%E2%80%99s-Scholarly-Contributions-and-His-Limitations। এটি ইংরাজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রকৌশলী তাজমিলা হুসেইন।)

অন্ত্যটীকা

[১] উমরের বিতর্কিত রচনার ধরন এবং অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে তাঁর কিছুটা অপ্রীতিকর মতামতের একটি উদাহরণের জন্য দেখুন, উমর, বদরুদ্দীন (২০১১)। "The Story of Dr. Yunus and *Grameen Bank,*" *Countercurrents,* https://www.countercurrents.org/umar270411.htm। ইউনূসের বিরুদ্ধে উমরের এই নিন্দাবার্তা বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা ওয়াজেদের বক্তব্যের সাথে অদ্ভুতভাবে মিলে গিয়েছিল। তবে, অধ্যাপক ইউনূস, যিনি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, উমরের মৃত্যুর পর তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি শোকবার্তা প্রেরণ করেন। চলতি বছরের প্রথম দিকে অন্তর্বর্তী সরকার একটি পুরস্কার দিয়ে উমরকে সম্মানিত করতে চেয়েছিল বলে জানাযায়। ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ-পল সার্ত্রের মতো উমরও পুরস্কারে আগ্রহী ছিলেন না। তাই তিনি বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সার্ত্রে কেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই পটভূমি জানতে দেখুন *The Guardian,* (n.d.), "Jean-Paul Sartre rejected *Nobel prize* in a letter to jury that arrived too late" https://www.theguardian.com/books/2015/jan/05/sartre-nobel-prize-letter-swedish-academy.